ভাগবতের এই শ্লোকে বৃহদারণ্যকোপনিষদের প্রথম শ্রুতির প্রতি-ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক-উপনিষদ—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

অর্থাৎ—তাহা (বিশ্বের অব্যক্ত বীজ) পূর্ণবস্তু। ইহা (এই প্রত্যক্ষ জগৎ) পূর্ণ। পূর্ণ হইতে পূর্ণ উৎপন্ন হয়। এই পূর্ণ যখন ঐ পূর্ণেতে প্রত্যাগত হয়, তখন পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে।—এই শ্রুতিতে যে-তত্ত্ববস্তুর উল্লেখ করিয়াছেন, ভাগবত উপরি-উদ্ধৃত শ্লোকে তাহারই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ভাগবত যে ভগবদ্-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা পূর্ণ-তত্ত্ব, তাহা অদ্বৈততত্ত্ব, তাহাই জগতের একমাত্র কারণ, এই ভগবদ্-বস্তুই বিশ্বের নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ দুই। অতএব এই বিশ্ব ভগবানের অখণ্ড ও পূর্ণ সত্তারই প্রকাশ। বিশ্বের সমষ্টি ও ব্যষ্টির মধ্যে ভগবান পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান। তবে সত্তার দিক্ দিয়া তিনি সর্ব্বত্রই পূর্ণ থাকিলেও, প্রকাশের দিক্ দিয়া তারতম্য আছে। ভাগবত কখনও এই কথাটি বিস্মৃত হন নাই।

ভাগবতের সৃষ্টি-প্রকরণ তার প্রমাণ। বারান্তরে ইহার সবিস্তার আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

জাতীয় জীবনে ধ্বংসের কারণ

[২]

পরাধীনতা—প্রবলের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ফলে দুর্ব্বল যে সকল সময়ে যুদ্ধ করিয়া নির্ম্মূল হইয়া যায়, তাহা নহে। দুর্ব্বলকে পরাস্ত করিয়া প্রবল তাহাকে আপনার দাসত্বেও নিযুক্ত করিতে পারে। আর এই যে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলকে নিজের দাসত্বে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা, ইহা জীবজগতের নিম্নস্তরেও দেখিতে পাওয়া যায়। পিপীলিকাদের মধ্যে কোন কোন বলবান্ জাতীয় পিপীলিকারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল জাতীয় পিপীলিকাদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগকে দাসত্বে নিযুক্ত করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রথমতঃ পরাধীনতা স্বীকার করিতে বিস্তর বাধা দিলেও, পরে এই দাস পিপীলিকারা প্রভুদের তৃপ্তির জন্য সমুদায় পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য করিয়া থাকে ও প্রভুরা তাহাদের সেবায় দিব্য আরামে থাকেন (৮)।

মানুষের মধ্যে এই প্রবৃত্তি অতি আদিমকাল হইতেই দেখা যায়। বোধ হয় মনুষ্যসৃষ্টির প্রথমাবস্থা হইতেই প্রবলেরা দুর্ব্বলকে দাসরূপে খাটাইয়া আসিতেছে। যুদ্ধের বন্দীরাই প্রধানতঃ এইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হইত। প্রায় সমস্ত অসভ্য ও বর্ব্বর জাতির মধ্যেই এই দাসত্ব-প্রথা বিদ্যমান ছিল। ভারতীয় আর্য্য, গ্রীক, রোমক প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যজাতিদিগের মধ্যেও দাসত্ব-প্রথার বহুল প্রচলন ছিল। এমন কি ঐ সকল জাতির প্রবীণ, বুদ্ধিমান দার্শনিক ও শাস্ত্রকারেরা ঐ ব্যবস্থা ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট বলিয়াই স্থির করিয়াছিলেন। আরিষ্টটোল ইহাকে অতি স্বাভাবিক ব্যবস্থা বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছেন (৯)। আমাদিগের মনুসংহিতা দাস শূদ্রজাতিকে সৃষ্টিকর্ত্তার

---

(৮) Darwin—Origin of Species.

(৯) Arristotle—The State

চরণ হইতে উদ্ভূত ও স্বভাবতঃই পরিচর্য্যাধর্ম্মী বলিয়া বিধান দিয়াছেন (১০)। প্রাচীন ও মধ্যযুগের আরব ইহুদী প্রভৃতি সেমিটিক জাতির মধ্যে এই দাসত্ব-প্রথা অতি নিষ্ঠুর ও ঘৃণ্য আকার ধারণ করিয়াছিল। পালিত পশু ও অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় দাস ক্রয়-বিক্রয়ের প্রথা এই সময়েই বিশেষরূপে বদ্ধমূল হয়। অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় দাসদাসীর দ্বারাও লোকের ধন নির্ণয় করা হইত। দাস-বিপণিসমূহে বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকেরাই বেশী বিক্রিতা হইত। এই সকল বাঁদীদের যৌবন, সৌন্দর্য্য, কলাকুশলতা প্রভৃতি দ্বারা উহাদের মূল্য নির্ণীত হইত। জীবন হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ইহাদের নিজের বলিতে কিছুই থাকিত না। তিল তিল করিয়া প্রবলের সেবায় জীবন-উৎসর্গ করিয়া ইহারা মানবজন্ম শেষ করিয়া দিত। তারপর মধ্যযুগে যখন ইউরোপীয়েরা আফ্রিকা ও আমেরিকার দুর্ব্বল অসভ্য জাতিদের সন্ধান পাইল, তখন তাহারাও প্রবলভাবে এই দাস ব্যবসায় চালাইতে আরম্ভ করিল। এই সমস্ত নিরীহ নিগ্রো জাতিদের উপর উহারা কিরূপ অমানুষিক অত্যাচার করিত—কিরূপে তাহাদিগকে যথেচ্ছরূপে ক্রয়-বিক্রয় করিত, বোধ হয়, কাহারও তাহা অবিদিত নাই। Uncle Tom's Cabinএর করুণ-কাহিনী তাহা বিশ্ববাসীর মনে চিরদিন জাগ্রত করিয়া রাখিবে। মানবজাতির ইতিহাসে ইহা অপেক্ষা গভীরতম কলঙ্ককালিমা বোধ হয় আর কোথাও দেখা যায় না। এই অকথ্য অত্যাচার শেষে সহিষ্ণুতার শেষ সীমায় উঠিয়া বোধ হয় ভগবানের সিংহাসন পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল; আর তাহারই ফলে বোধ হয় ইংরাজজাতির স্বার্থত্যাগ ও

---

(১০) মনুসংহিতা।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের দাসব্যবসায়ীরা ও তাঁহাদের সঙ্গী খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকেরাও দাসত্ব-প্রথাকে ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট স্বাভাবিক প্রথা বলিয়া প্রচার করিতেন।—লেখক।

অধ্যবসায়ে পৃথিবী হইতে এই দাসত্ব-প্রথা লুপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু বলিতে গেলে ইহা এখনও লোপ পায় নাই। এখনও Indentured labour system (চুক্তিবদ্ধ-কুলি-প্রথা) প্রভৃতির ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া এই দাসত্ব-প্রথা বিভিন্ন দেশে আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। ফিজি, নিউগিয়ানা, ট্রিনিডাড্, সুরিনাম, জ্যামেকা প্রভৃতি স্থানে দুর্ভাগ্য ভারতবাসীর অবস্থা (১১), এবং আফ্রিকার ও দক্ষিণ আমেরিকার রবারক্ষেত্র প্রভৃতিতে নিগ্রোদের অবস্থা দেখিলে বলিতে হয় যে, দাসত্ব-প্রথা নাম বদলাইয়া এখনও মানবসভ্যতাকে বিদ্রূপ করিতেছে।

এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহাকে প্রধানতঃ ব্যক্তিগত দাসত্ব ও পরাধীনতা বলা যায়। কিন্তু দাসত্ব ও অধীনতার আর এক মূর্ত্তি আছে, যাহার নাম দেওয়া যাইতে পারে জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় দাসত্ব বা অধীনতা। মানব-ইতিহাসে সাম্রাজ্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই ইহার আবির্ভাব দেখা যায়। প্রবলতর রাষ্ট্র বা জাতি, দুর্ব্বলতর রাষ্ট্র বা জাতিকে চিরকালই অধীন করিতে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে ও সফলকাম হইলে তাহাকে নিজের কাজে লাগাইয়াছে। পৃথিবীতে বর্ত্তমানে যে সকল প্রাচীন রাষ্ট্র বা জাতির অস্তিত্ব আছে, তাহাদের অধিকাংশই কোন না কোন সময়ে অন্যের অধীনতা সহ্য করিয়াছে—ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ব্যক্তিগত দাসত্ব-প্রথা পৃথিবী হইতে এক প্রকার লোপ পাইয়াছে। কিন্তু জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় দাসত্ব এখনও প্রবলভাবে কার্য্য করিতেছে ও সভ্যতার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির সঙ্গে, তাহা যে কোন দিন লুপ্ত হইবে, এরূপ আশার কারণ আজও দেখা যাইতেছে না।

স্বাধীনতা স্বাভাবিক, পরাধীনতা অস্বাভাবিক। জীবদেহ আভ্য-

---

(১১) লর্ড হার্ডিঞ্জের যত্নে এই প্রথা শীঘ্রই রহিত হইবে এরূপ আশা পাওয়া গিয়াছে।—লেখক।

স্তরীণ শক্তি হইতে নিজেই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া উঠে। তাহার চরম পরিণতি, তাহার নিজের মধ্যেই নিহিত থাকে,—আর জৈব-বিকাশের গতি স্বাভাবিক ক্রিয়াবলে সেই চরম পরিণতির দিকেই অগ্রসর হইতে থাকে, পারিপার্শ্বিক বাহ্যশক্তি তাহাকে সাহায্য করে বটে,—পারিপার্শ্বিক বাহ্যশক্তিসমূহকে আশ্রয় করিয়া, তাহাদিগকে নিজের কাজে লাগাইয়া, জীবদেহ আপনার বিকাশ সাধন করে বটে; কিন্তু বাহ্যশক্তি ঐ বিকাশের নিয়ামক নহে। বরং যেখানেই বাহ্যশক্তি সহায়ক না হইয়া নিয়ামক হইয়া উঠে, সেখানেই জৈব বিকাশের স্বাভাবিক গতির পথে বাধা উপস্থিত করে; সেখানেই বিকাশ 'স্বাধীন' না হইয়া 'পরাধীন' হইয়া পড়ে। সর্ব্বত্রই দেখা যায়, বাহ্যশক্তির এই বাধা জৈব বিকাশের পক্ষে হিতকর হয় না; জীবদেহের আভ্যন্তরীণ শক্তিকে সে পঙ্গু ও খর্ব্ব করিয়া ফেলে। উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগতে ইহার দৃষ্টান্ত নিত্যই দেখা যায়। অতি সামান্য বাহিরের বাধা জৈব বিকাশের গতিকে বিকৃত ও রুদ্ধ করিয়া দেয়, তাহার প্রমাণের অভাব নাই (১২)।

জীবদেহের পক্ষে যেমন, জাতির পক্ষেও তেমনই একথা সম্পূর্ণরূপে খাটে। প্রত্যেক জাতিই নিজের শক্তিবলে ও পারিপার্শ্বিক শক্তিসমূহকে আশ্রয় করিয়া উন্নতির দিকে—বিকাশের দিকে অগ্রসর হয়। বাহিরের কোন শক্তি যদি এই জাতির ঘাড়ে চাপিয়া বসে, তবে তাহার জাতীয় বিকাশ আর স্বাভাবিকরূপে ঘটে না, সে জাতি পঙ্গু ও দুর্ব্বল হইয়া যায় ও মৃত্যুমুখে অগ্রসর হয়।

এক জাতি আর এক জাতির অধীন হইলে, তাহার জাতীয় জীবনের সর্ব্বদিকেই যে বিকাশের বাধা হয়, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

প্রথমতঃ—ধনোৎপাদন ও বণ্টন বিষয়ে জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক ধারায় অনেক বাধা উপস্থিত হয়। যে জাতি প্রভু হইয়া বসে,

(১২) Darwin—Origin of Species.

সে অধীন জাতির উৎপন্ন ধনাদিতে নিজের ভাগ যথাসাধ্য জোর করিয়া বা কলে-কৌশলে আদায় করিয়া লয়। নিজেদের সুবিধার জন্য এমন সমস্ত নিয়ম ও বিধি নিষেধাদি প্রচলন করিতে থাকে যে, অধীন জাতির পক্ষে সেগুলি হিতকর হইতেই পারে না। অধীন জাতি যদি প্রভুজাতির তুলনায় নিতান্ত অসভ্য ও বর্ব্বর হয়, তবে তাহাকে স্বদেশে দাসরূপে কেবল প্রভুজাতির কার্য্যের জন্যই জীবন ধারণ করিতে হয়। আর যদি অধীন জাতিও কতকটা সভ্য ও উন্নত হয়, তাহা হইলেও প্রভুজাতির শক্তি এবং কৌশলবলে, তাহাকে পরিশ্রমলব্ধ ধনের অনেক অংশ হইতেই বঞ্চিত হইতে হয়। দেশমধ্যে ধনোৎপাদনের যে সকল লাভজনক পন্থা থাকে, প্রভু-জাতিই তাহা হস্তগত করিয়া লয়, এবং অধীন জাতির উন্নতির পথে যত প্রকার বাধা দেওয়া যাইতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে সে ছাড়ে না। কারণ দাসজাতি চিরদিনই তাহার পদানত ও সেবাপরায়ণ হইয়া থাকিবে ইহাই স্বাভাবিক ইচ্ছা; আর যাহাতে ইহার বিপরীত ঘটিতে পারে সেরূপ ব্যবস্থায় সে সহজে প্রশ্রয় দেয় না। ফলে প্রভুজাতি ক্রমে ধনী ও ক্ষমতাশালী, এবং দাসজাতি দরিদ্র ও নিস্তেজ হইয়া পড়িতে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ—দুর্ব্বল ও স্বল্পসভ্য জাতি, প্রবলতর ও সভ্যতর জাতির সংস্পর্শে আসিলে, তাহার সামাজিক জীবনেও মহা অনিষ্ট সংঘটিত হয়। এই সংঘর্ষের ফলে অধীন দুর্ব্বল জাতির জীবনে যে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, তাহার সমাজ-ব্যবস্থায় অনেক সময়ে যে বিপ্লব ঘটে, তাহার ফল জাতীয় জীবনের পক্ষে হিতকর হয় না (১৩)। যে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে অধীন জাতি পূর্ব্বে জীবন-নির্ব্বাহ করিতেছিল, তাহাতে ধাক্কা লাগাতে তাহার সমগ্র জীবনপ্রণালীর উপর তীব্র আঘাত লাগে ও সে আঘাত অনেক সময়ে সে সামলাইতে পারে না।

(১৩) Darwin—The Descent of Man.

নূতন নূতন অভ্যাস ও প্রথা তাহার সমাজমধ্যে ঢুকিয়া তাহার বহুদিনের নির্দ্দিষ্ট জাতীয় জীবনের গতি অনেক সময়ে রুদ্ধ ও বিকৃত করিয়া তোলে ও জীবনীশক্তির মূল শিথিল করিয়া দেয়। নূতন সভ্যতা ও প্রবলতর জাতির সংস্পর্শে অনেক নূতন ও সাংঘাতিক ব্যাধিও সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে (১৪) ও জাতীয় স্বাস্থ্য শোচনীয় হইয়া উঠে। অন্যদিকে প্রবল ও দুর্ব্বল দুই জাতির সংমিশ্রণে সঙ্করবর্ণের সৃষ্টি হইতে থাকে। এই সঙ্কর বা মিশ্রজাতি প্রায়ই দুর্ব্বল, জীবনীশক্তিহীন ও রুগ্ন হইতে দেখা যায়। অনেক স্থলে স্ত্রীলোকদের উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হইয়া যায় ও শিশুমৃত্যু বাড়িতে থাকে। মিশ্রণের ফলে প্রায়ই সমাজে নানারূপ ব্যভিচার ও দুর্নীতিও প্রবেশ করিতে থাকে এবং তাহাতেও জাতির জীবনীশক্তিকে হীন করিয়া ফেলে (১৫)। অষ্ট্রেলিয়ার মেওয়ারী জাতিদের মধ্যে ঠিক এইরূপই দেখা গিয়াছিল, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি (১৬)।

তৃতীয়তঃ—জীবনের সর্ব্ববিভাগে পরাধীন জাতির কার্য্যকরী শক্তির স্ফুর্ত্তি পাইবার সুযোগ প্রায়ই ঘটে না। রাষ্ট্র ও দেশশাসন প্রভৃতি ক্ষমতার কার্য্য কচিৎ তাহাদের হাতে পড়ে। স্বভাবতঃ প্রভুজাতিরাই সকল প্রকার ক্ষমতার কার্য্য, বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন প্রভৃতি নিজেদের হাতে রাখিয়া দেয় ও আপনাদের উদ্দেশ্য অনুসারে অধীন জাতিদিগকে পরিচালিত করে। জাতীয় গৃহস্থালির বন্দোবস্ত অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় আয়ব্যয় প্রভৃতির বন্দোবস্তের ভারও তাহারা নিজের হাতে রাখে। শত্রু হইতে আত্মরক্ষা প্রভৃতি অত্যাবশ্যক বলের কার্য্যও অধীন জাতিরা অভ্যাস করিবার সুযোগ

(১৪) Ibid.
(১৫) Ibid.
(১৬) Ibid.

সকল সময়ে পায় না। এইরূপে, শারীরিক, মানসিক—সকল প্রকার বিকাশের পথেই তাহারা পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হইতে থাকে। তাহার ফলে তাহাদের মনুষ্যোচিত শক্তি ও বৃত্তিসমূহ ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়ে; এবং যতই পরাধীনতার কাল দীর্ঘতর হইতে থাকে, ততই তাহারা অধিকতর অকর্ম্মণ্য, অপটু, পরিশ্রমকাতর, উৎসাহহীন ও সর্ব্ব বিষয়ে পঙ্গু হইতে থাকে। যে কোন জাতিই দীর্ঘকাল পরাধীনতা ভোগ করিয়াছে, তাহাদেরই জাতীয় জীবনে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

চতুর্থতঃ—পরাধীন জাতির জীবনে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অনিষ্ট হয়, তাহা হচ্চে আত্মশক্তির উপর বিশ্বাসহীনতা। ক্রমাগত অধীনতার চাপে পিষ্ট হইয়া, দাসজাতি নিজের উপরে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে। অতীত ও বর্ত্তমানে নিজেদের মধ্যে যাহা কিছু ভাল থাকে, তাহা ভুলিয়া তাহারা আপনাদিগকে নিতান্তই অধম ও হেয় মনে করিতে থাকে ও প্রভুজাতির যাহা কিছু দেখিতে পায়, তাহাই উৎকৃষ্ট বলিয়া গ্রহণ করে। তাহাদের নিজের কোন উচ্চ আদর্শ থাকে না; ক্রমাগত বাধা পাইয়া, জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে তাহাদের যে কোন স্থান আছে, ইহা তাহারা ভুলিয়া যায়, ও গতানুগতিক ভাবে, নিতান্তই যন্ত্রচালিতবৎ তাহারা জীবন কাটাইতে থাকে। জ্ঞান বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাহাদের বুদ্ধি মলিন হইয়া যায়। প্রতিভার মৌলিকতা ও নব নব উন্মেষ তাহাদের মধ্যে বিরল হইয়া উঠে। খাঁচার পাখী যেমন শিখানো বুলিই আবৃত্তি করে, তেমনই পরপদাশ্রিত জাতিরা নিজেদের বিশেষত্ব হারাইয়া, কেবল প্রভু-জাতিরই শিখানো কথা আবৃত্তি করিতে থাকে; তাহারই প্রদর্শিত পন্থা উহাদের একমাত্র গতি হইয়া উঠে। আর এই যে অবস্থা,—জাতীয় জীবনের পক্ষে এর চেয়েও সাংঘাতিক অবস্থা আর কিছু হইতে পারে না। ইহা একপ্রকার মৃত্যুই বলা যাইতে পারে। জীব-ন্মৃতবৎ, জরাগ্রস্ত জাতি নিজের প্রাণশক্তি এইরূপে হারাইয়া, আপ-

নার অজ্ঞাতসারেই শোচনীয় ধ্বংসের পথে নিশ্চিতরূপে অগ্রসর হইতে থাকে।

শিল্পবাণিজ্যের হ্রাস ও দারিদ্র্য—জাতিতে জাতিতে প্রতিযোগিতার একটি বিশেষ মূর্ত্তি শিল্পবাণিজ্যে প্রতিযোগিতা। ধনোৎপাদন ও বণ্টনের উপরে জাতীয় স্থিতি ও উন্নতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সমাজের কতকাংশ কৃষি ও শিল্পের দ্বারা ধনোৎপাদন করে, নানা উপায়ে সেই ধনের বণ্টন হয়, ও বাণিজ্য দ্বারা তাহার বিনিময় ঘটে; এবং এইরূপে সমাজ-শরীরের বিভিন্নাঙ্গ বিভিন্ন প্রয়োজন সাধন করিয়া সমাজকে সুস্থ ও সবল রাখে। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যেক সমাজ নিজের প্রয়োজন নিজেই সাধন করে; কচিৎ বা অন্য সমাজের সঙ্গে আদানপ্রদানের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া অভাব পূরণ করিয়া লয়। কিন্তু যখন কোন দুর্ব্বল ও স্বল্পসভ্যজাতি প্রবলতর বুদ্ধিমান্ জাতির সংস্পর্শে আসে, তখন অনেক সময় এই সকল ব্যবস্থা একেবারে উল্টাইয়া যায়। প্রবলতর বুদ্ধিমান্ জাতি, নিজের উন্নততর বৈজ্ঞানিক প্রণালীর বলে, দুর্ব্বলতর স্বল্পবুদ্ধি জাতির শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে হস্তগত করিয়া লয়; ধনোৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়ের সমস্ত স্বাভাবিক ব্যবস্থা সমাজের নিজের অধিকারচ্যুত হইয়া বৈদেশিক শক্তির করায়ত্ত হইয়া পড়ে। তাহার ফলে দুর্ব্বল জাতি ক্রমে ক্রমে দরিদ্র হইয়া পড়ে, তাহাদের মধ্যে শিল্পবাণিজ্যের হ্রাস হইয়া দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দেখা দেয়; এবং এইরূপে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইয়া দুর্ব্বল দরিদ্র জাতি ধ্বংসের মুখে যাইতে থাকে। আধুনিক কালে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রবলতর জাতিরা নানারূপে অভিনব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিয়া, শিল্পবাণিজ্যের নূতন নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছে ও পৃথিবীময় দুর্ব্বলতর স্বল্পসভ্য জাতিদের শিল্পবাণিজ্য হস্তগত করিয়া লইতেছে। দুর্ব্বলতর স্বল্পবুদ্ধি জাতিরা তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় না পারিয়া ক্রমে ক্রমে দরিদ্র ও হতশ্রী হইয়া পড়িতেছে।

সামাজিক প্রথা ও কুসংস্কার—বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির সামঞ্জস্যের চেষ্টাতেই জীবনের লক্ষণ। আর জীবদেহ যতক্ষণ বাহিরের সঙ্গে এই সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে, ততক্ষণই সে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। সমাজের পক্ষেও ঠিক এই কথা বলা যাইতে পারে। যতক্ষণ সমাজ তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত নিজের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলিতে পারে, ততক্ষণই সে জীবন্ত থাকে; আর পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত তাহার সামঞ্জস্যের অভাব ঘটিলেই তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। জীবদেহ যখন বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তখন সে তাহার বাহিরের নানা শক্তিসমূহকে আশ্রয় করিয়া অগ্রসর হয়;—বাহ্য ও আভ্যন্তর নানা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে নানা বিচিত্র সম্বন্ধ স্থাপন করিতে থাকে। এই সম্বন্ধের সফলতার উপরেই জৈব-বিকাশের গতি নির্ভর করে। সমাজও তাহার বিকাশের পথে বাহ্যশক্তিসকলকে আশ্রয় করিয়া অগ্রসর হয়; ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহের বিবিধ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে প্রতিনিয়ত আপনার সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে থাকে। প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তনশীল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের শক্তিই জীবন্ত সমাজের লক্ষণ। সমাজের শৈশবাবস্থায় খাদ্যসংগ্রহ, আত্মরক্ষা, প্রভৃতি কয়েকটি অল্পসংখ্যক সরল সমস্যাকেই সমাজ সম্মুখে করিয়া অগ্রসর হয়। ঐ সকল সমস্যার সমাধানের জন্য তদুপযোগী বিধিব্যবস্থা প্রভৃতিও অবলম্বিত হয়। ক্রমে যতই সমাজ উন্নতি ও বিকাশের দিকে যাইতে থাকে, ততই তাহার সমস্যাগুলি সংখ্যায় বেশী ও জটিলতর হইতে থাকে;—সামাজিক প্রথা ও বিধিব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে তদুপযোগী বিচিত্ররূপে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। কালপ্রবাহ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। এই নিত্য পরিবর্ত্তনশীল কালপ্রবাহের উপর যে সমাজ বিচিত্র গতিতে অগ্রসর হইতে পারে,—তাহার ছন্দের সঙ্গে তাল মিলাইয়া চলিতে পারে,—সেই সমাজই জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকিতে পারে। জীববিজ্ঞানেও আমরা ইহার দৃষ্টান্ত পাই। Variation বা পরিবর্ত্তন

জৈব বিকাশের একটা প্রধান লক্ষণ। এই variation বা পরিবর্তনের দ্বারা যে সকল জীব বাহ্যশক্তির সঙ্গে আপনাদের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে, তাহারাই জগতে টিকিয়া যায়; যাহারা তাহা পারে না, তাহারা লুপ্ত হইয়া যায় (১৭)। অবশ্য, এই চলা বা গতিও নিরবচ্ছিন্ন নহে; ইহার সঙ্গে স্থিতিও আছে। আর প্রকৃতপক্ষে গতি ও স্থিতি এই উভয়ে মিলিয়াই বিকাশকে গড়িয়া তোলে। স্থিতি দ্বারাই জীবের নিজস্ব বিশিষ্টতা রক্ষিত হয়, আর তাহাকে বজায় রাখিয়াই জীব ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইয়া বাহ্যপ্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া লয়। সামাজিক বিকাশেও স্থিতির কার্য্য আছে। এই স্থিতি দ্বারাই সমাজের বৈশিষ্ট্য বা তাহার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যটুকু রক্ষিত হয়;—প্রাচীন কালের সঙ্গে তাহার যোগাযোগ—তাহার পারম্পর্য্য ইহাতেই বজায় থাকে। আর ইহাকে ভিত্তি করিয়াই সমাজ ধীরে ধীরে পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বাহ্যশক্তির সঙ্গে আপনাকে সুসঙ্গত করিয়া লয়। সুতরাং স্থিতি ও গতি এই উভয়ই সমাজের যথার্থ বিকাশ ও উন্নতির পক্ষে প্রয়োজনীয়; এ দুইয়ের কোনটিকে ছাড়িয়া সমাজ পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে না। যে সমাজ কেবল স্থিতিকেই আঁকড়াইয়া থাকে, বাহ্যশক্তির সঙ্গে মিলাইয়া আপনার বিধিব্যবস্থা, রীতিনীতি, আচার-প্রথা প্রভৃতির পরিবর্তন করিয়া লইতে পারে না, সে সমাজ পঙ্গু ও জড়। জীবন্মৃতবৎ সেই সমাজ শীঘ্রই ধ্বংসের মুখে যায়। অপর পক্ষে যে সমাজ কেবলই গতিকে বা চলাকে আদর্শ করিয়া লইয়াছে, সে সমাজ নিজের স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা হারাইয়া ফেলে; চারি পার্শ্বের নানা পরিবর্তনের সঙ্গে কেবলই চলিতে গিয়া সে নিজের লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বিশ্ব-মানবের সভাতে কোন স্থানই অধিকার করিতে পারে না। যে সমাজ স্থিতি ও গতি এই দুইকেই

(১৭) Darwin—Origin of Species.

যথাযোগ্য মিলাইয়া, কালপ্রবাহের সঙ্গে আপনার সামঞ্জস্ত রক্ষা করিয়া চলিতে পারে, সেই সমাজই আপনার স্বাতন্ত্র্য ও লক্ষ্য স্থির রাখিয়া যথার্থ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে। আধুনিক ইউ-রোপ ও আমেরিকার উন্নতিশীল জাতিসমূহের মধ্যে এই লক্ষণ অনেক পরিমাণে দেখা যায়। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, রাশিয়া, মার্কিণ প্রভৃতি সকলেই নিজের বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া, পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার সঙ্গে আপনাদিগকে মিলাইয়া স্থির গতিতে বিকাশের পথে চলিয়াছে। গতিকে এই সকল জাতি কোন দিনই উপেক্ষা করে নাই।/ বরং গতির দিকে একটু বেশী ঝোঁক দিতে গিয়াই উহারা জাতীয় জীবনে নানা কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করিয়া তুলি-য়াছে। প্রাচ্য জাতির মধ্যে আধুনিক জাপান বিকাশ ও উন্নতির পথে আশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে। বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপ ও আমেরিকার জাতিসকলের সংস্পর্শে আসিয়া, সে বর্ত্ত-মান জগতের নবীন আদর্শ ধরিয়া ফেলিয়াছে ও সমস্ত প্রাচীন জড়তা ও দৈন্য পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বমানবসমাজে একটি প্রধান স্থান অধি-কার করিয়া বসিয়াছে। পক্ষান্তরে জাপানের প্রতিবাসী চীন ঠিক ইহার উল্টাপথে চলিয়াছে। এই স্থবিরজাতি স্থিতিকেই প্রবলরূপে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। বহুশত বৎসরের আবর্জ্জনার জাল 'সনা-তনীর' মোহে স্তূপাকার করিয়া তাহাতেই পরমানন্দ বোধ করি-তেছে। বিশ্বমানবের গতিপথে যে সকল নব নব সমস্যার উদয় হই-তেছে, তাহার সঙ্গে সে সামঞ্জস্ত রক্ষা করিতে পারিতেছে না, ও আপনাদের অতি প্রাচীন বিধিব্যবস্থা, আচার-প্রথা, রীতিনীতি প্রভৃ-তিকে প্রবল আসক্তির বশে নির্ব্বিচারে রক্ষা করিয়া, পঙ্গুতা ও জড়তার ভারে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। এরূপ ভাবে চলিলে তাহার মৃত্যু যে অদূরবর্ত্তী হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষ জীবন্ত ছিল। তাই প্রাচীন ভারতবর্ষ কোন দিনই 'সনাতনীর' মোহে জড়তাকে প্রশ্রয় দেয় নাই। নব নব অবস্থার

সঙ্গে সে আপনাদের বিধিব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া, নব নব সমস্তার সমাধান করিয়া বিকাশের পথে অগ্রসর হইয়াছে। প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের 'যুগধর্ম্ম' ও 'আপদ্ধর্ম্ম'ই সে বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ। কিন্তু আধুনিক ভারতবর্ষ স্থবির ও বৃদ্ধ চীনের ন্থায় নিজেকে পঙ্গু করিয়া ফেলিতেছে। নূতন পৃথিবীর নূতন আদর্শের সঙ্গে সে আপনাকে মিলাইয়া লইতে পারিতেছে না। পূর্ব্বপুরুষের গৌরবের মোহে অন্ধ হইয়া সে জীবনহীনতাকেই প্রশ্রয় দিতেছে ও অনাদিকালের জঞ্জালজাল সযত্নে রক্ষা করিয়া মৃত্যুব্যাধির বীজকেই পুষ্ট করিয়া তুলিতেছে। কিরূপে প্রাচীনের সঙ্গে নবীনকে মিলাইয়া লইতে হয়, কি করিয়া আপনার স্বাতন্ত্র্য ও আদর্শ বজায় রাখিয়া বিকাশের পথে অগ্রসর হইতে হয়, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, ও বিকৃত-বুদ্ধি চিররুগ্ন ব্যক্তির ন্থায়, শ্রেয়কে গ্রহণ করিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকেই অগ্রসর হইতেছি। সম্প্রতি একটা দৃষ্টান্ত দিলেই আমাদের এই শোচনীয় জড়তার কথা হৃদয়ঙ্গম হইবে। যে সময়ে পৃথিবীর সমস্ত মানবজাতি পরস্পরের সঙ্গে ভাব ও আদর্শের আদানপ্রদান করিতেছে, বিভিন্নজাতি পরস্পরের সাহায্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি করিতেছে,—সমুদ্র, আকাশ, জলবায়ু বা প্রাকৃতিক কোন শক্তিই যখন মানুষের উৎসাহকে বাধা দিতে পারিতেছে না, ঠিক সেই সময়েই আমরা 'সমুদ্রযাত্রানিষেধ' বিধি দৃঢ়রূপে রক্ষা করিয়া আপনাদের সূর্য্যালোকহীন অন্ধগুহার মধ্যে আরামে বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছি। এই বিংশ শতাব্দীর নব জাগ-রণের দিনেও যে জাতি এইরূপে জড়তাকে প্রশ্রয় দিয়া দিব্য আরামে ঘুমাইতে পারে, তাহাদের যদি ধ্বংস না হয়, তবে আর কাহার হইবে? নবীন পৃথিবীর নব নব আদর্শ, নব নব ভাবকে আমাদের 'অচলায়তনের' দৃঢ় প্রাচীর দিয়া ঠেকাইয়া রাখিতেই আমরা বিপুল চেষ্টা করিতেছি ও তাহার ফলে সেই অচলায়তনের মধ্যেই যে আমাদের জীবন্ত সমাধি ঘটিতে পারে তাহা ভুলিয়া যাইতেছি।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

কুন্দনন্দিনী

[আত্মকাহিনী]

১।

আমি আবার আসিয়াছি। তোমরা আমায় চিনিতে পারিবে কি? কেমন করিয়াই বা চিনিবে। আমি এখন যে "বয়সে স্ত্রীলোক সুন্দরী" সেই ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কিশোরী নহি। অথবা বর্ষার পূর্ণ-সলিলা নদীর মত আমার মরণ সময়ের সপ্তদশ বর্ষীয়া যুবতী নহি। কাল আমার রূপ, যৌবন, প্রাণ সকলই অপহরণ করিয়াছে—লইতে পারে নাই আমার এই বুকভরা অনন্ত দুঃখ। যে দুঃখ আজিও আমার অন্তরাত্মাকে তুষানলের মত ধিকি ধিকি দগ্ধ করিতেছে, যে আগুন বুকে করিয়া আমি এই সীমাশূন্য মহাশূন্যের কোথাও ক্ষণেকের জন্য শান্তি পাই না, সে দুঃখ কাল অপহরণ করিতে পারে নাই। যদি মেঘারাবের মত আমার গম্ভীর স্বর থাকিত, তাহা হইলে এই অনন্ত মহাশূন্য আজ আমার হাহাকার ধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া যাইত।

কিন্তু আর পারিব না। এ দারুণ দুঃখ বুকে চাপিয়া রাখিয়া একাকিনী আর অনন্ত যন্ত্রণা সহিতে পারি না। যদি দেখাইবার হইত তবে দেখাইতাম যে, এ দারুণ আগুনে আমার হৃদয় ছার-খার হইয়া গিয়াছে। হৃদয় ভস্ম হইয়া গিয়াছে—কিন্তু আগুন ত নিবিল না। ইন্ধন না পাইলেও কি দুঃখের আগুন আপনি জ্বলিতে থাকে?

আর পারি না বলিয়া তোমাদের নিকট আমার দুঃখ-কাহিনী প্রকাশ করিতে আসিয়াছি। দেখি যদি তাহাতে যাতনার কিছু

উপশম হয়। শুনিয়াছি প্রকাশ করিতে পারিলে শোক দুঃখের লাঘব হয়। অনন্ত মহাশূন্যে আমার এ দুঃখ-কাহিনী শুনিবার কেহ নাই, তাই যে মর্ত্ত্যে আমার এই অনন্ত দুঃখের সৃষ্টি—সেইখানে দুঃখের কথা প্রকাশ করিতে আসিয়াছি। দুঃখের কথা শুনিতে কে চায়? সুখের পিপাসী তোমরা—আমার দুঃখের কথা শুনিতে চাহিবে না তাহা জানি। কিন্তু সুখ চাহিলেও জগতে তোমরা কেবল ত সুখ পাও না। সুখের সঙ্গে দুঃখও পাইয়া থাক। আমার ন্যায় অনন্ত দুঃখভাগিনী কেহ না থাকিলেও তোমাদের সকলেরই হৃদয়ে দুঃখের আগুন লুক্কায়িত আছে। হয় ত সেই দুঃখের কথা মনে পড়িয়া সময়ে তোমরা কাতর হইয়া থাক। যেমন উজ্জ্বল আলোকের পার্শ্বে ক্ষুদ্র দীপালোকের দীপ্তি একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে, তেমনি আমার অনন্ত দুঃখকাহিনী শুনিলে তোমাদের দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হইবে না। তাই বলিতেছি, আমার দুঃখ-কাহিনী শুনিয়া তোমাদের লাভ ব্যতীত ক্ষতি নাই।

তোমরা বোধ হয় এতদিন আমায় ভুলিয়া গিয়াছ। না ভুলি-বেই বা কেন? এ দুঃখিনীর স্মৃতি বুকে করিয়া রাখিবার, এ অভাগিনীর জন্য একবিন্দু অশ্রুপাত করিবার আবশ্যক বা অধিকার কাহারও নাই। আবশ্যক নাই কেন তাহা তোমরা বুঝিতে পার। জগতে ত আমার—আমার বলিবার কিছু—আমার বলিবার কেহ ছিল না। জগতে ত আমাকে একবিন্দু ভালবাসিবার কেহ ছিল না! ভালবাসিয়াছিল এক নগেন্দ্র। কিন্তু সে কি ভালবাসা, না রূপের মোহ? আমার উজ্জ্বল রূপবহ্নিতে মুগ্ধ নগেন্দ্র পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতে আসিয়াছিল। কিন্তু আমার কপালে বিধির বিধি বিপরীত হইল। আগুনে পড়িয়া পতঙ্গ পুড়িয়া মরে তাহা তোমরা চির-দিনই দেখিয়া আসিতেছ। কিন্তু পতঙ্গ পতনে আগুন নিবিয়া যায়, তাহা কখনও দেখিয়াছ কি? বলিতে পার ক্ষুদ্র দীপালোকে পতঙ্গ পড়িলে কখন কখন অগ্নি নির্ব্বাপিত হইতেও পারে। কিন্তু আমার

রূপ ত ক্ষুদ্র দীপালোকের মত ছিল না—আশাময়ী অত্যুজ্জ্বল বহ্নির মত ছিল। নগেন্দ্র, দেবেন্দ্র—আরও কত ইন্দ্র চন্দ্র আমার রূপে পাগল হইয়াছিল। রূপ ত আমার সামান্য ছিল না। কিন্তু বলিয়াছি ত আমার কপালে বিধির বিধি বিপরীত হয়। নগেন্দ্র পুড়িল না—মরিলাম আমি। তোমরা বলিতে পার যে কেন নগেন্দ্র ত পুড়িয়াছিল। তোমার রূপবহ্নি নগেন্দ্রের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। তোমার রূপে নগেন্দ্র পাগল হইল, সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিল, নগেন্দ্রের সোণার সংসার ছারখার হইতে বসিয়াছিল। কিন্তু তার পর? তার পর সূর্য্যমুখী ফিরিয়া আসিল, নগেন্দ্র আবার সেই নগেন্দ্র হইল, নগেন্দ্রের সোণার সংসার আবার সেই সোণার সংসার হইল। সর্ব্বনাশ হইল কেবল এই অভাগিনীর। আমার ইহকাল, আমার পরকাল, আমার রূপ, আমার যৌবন—সকলই আমি হারাইলাম। কেবল রহিল রাবণের চিতার মত আমার এই চিরপ্রজ্বলিত দুঃখের আগুন। হায়! এ আগুন কি যুগযুগান্তরেও নিবিবে না?

বিধাতা কেন আমায় এত দুঃখভাগিনী করিয়াছিলেন—তাহা জানি না। তোমরা কেহ বলিতে পার কি? জন্মান্তর বাদী! তুমি বলিবে—পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে তোমার এত দুঃখ। আমি জাতিস্মরা হইয়া জন্মাই নাই। সুতরাং বলিতে পারি না যে পূর্ব্বজন্মে কত পাপ করিয়াছিলাম। কিন্তু দারুণ পাপই যদি করিয়াছিলাম, তবে এ বিসদৃশ সম্মিলন কেন? আঢ্য বংশে জন্মিয়া আমি দরিদ্র কেন? আমার এ অসামান্য রূপলাবণ্য কেন? আমার হৃদয়ে এত কোমলতা কেন? বিধাতা যদি আমায় দরিদ্র বংশে জন্ম দিতেন, যদি আমায় কুরূপা—অঙ্গহীনা করিতেন, যদি আমার হৃদয়ে সুখদুঃখ অনুভবের এরূপ তীক্ষ্ণশক্তি না দিতেন, তবে এত দুঃখ সহিয়াও—আমার এত দুঃখ থাকিত না। তুমি আবার বলিবে, সকলি তোমার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল। ভাল, মানিলাম কর্ম্মফল—কিন্তু একটা কথা আমার বলিবার আছে। কোথা হইতে এ কর্ম্মফল

উদ্ভূত ? এ বিশ্বের স্রষ্টা কে ? কে এই অনন্ত বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া —অসংখ্য জীব সৃষ্টি করিয়া—তাহাদের হৃদয়ে সুখদুঃখ দিয়া—এই বিরাট বিশ্বসংসাররূপ খেলা খেলিতেছে ? আস্তিক ! তুমি অবশ্যই বলিবে যে বিধাতাই এ বিশ্বের স্রষ্টা। কিন্তু কেন এ বিশ্ব সৃষ্টি ? কেন এ জীবের সৃষ্টি ? কেন এ কর্ম্মফলের সৃষ্টি ? শুধু কি জীবদিগকে দুঃখ দিবার জন্য ? আমার অনন্ত দুঃখের কথা ছাড়িয়া দাও—ইহার তুলনা আর কোথাও নাই—কিন্তু বলিতে পার সংসারে সুখী কে ? জগতের প্রত্যেক নরনারীকে জিজ্ঞাসা কর—কেহই বলিবে না আমি সুখী। কোন না কোন প্রকার দুঃখ নরের আছেই। তাহার তুলনায় সুখ অতি অল্প। তাই কবিগণ ঘনান্ধকারে দীপশিখার সহিত দুঃখের ও সুখের তুলনা দিয়াছেন। জীবের দুঃখের জন্যই যদি এ জগতের সৃষ্টি, তবে এ সৃষ্টির আবশ্যকতা কি ? যিনি মঙ্গলময়—করুণাময় জীবদিগকে এত দুঃখ দিবার জন্য তাঁহার এ সৃষ্টি করা কেন ?

আরও একটা কথা আমার বলিবার আছে। স্বীকার করি—আমি পাপ করিয়াছি, স্বীকার করি—আমার কর্ম্মফলেই আমি এত দুঃখ পাইতেছি। কিন্তু পাপের কি ক্ষমা নাই ? পিতা পুত্রের শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন, কিন্তু বিশ্বপিতার নিকট কি আমাদের সামান্য অপরাধেরও ক্ষমা নাই। দেখ, যত নীচ বা যত পাপীই হউক, কাহারও দারুণ দুঃখ দেখিলে তোমার আমার হৃদয়েও দয়া হয়। আর যিনি দয়ার আধার, বিশ্বের নিয়ন্তা তাঁহার এই অভাগিনীকে ধনজনশূন্য করিয়া, নিরাশ্রয় করিয়া, বিধবা করিয়া, দারুণ দুঃখের বোঝা মাথায় দিয়া, তথাপি তৃপ্তিলাভ হয় নাই—যে আবার নগেন্দ্ররূপ বিষাক্ত শল্যকে আমার নিষ্পাপ কৈশোর হৃদয়ে বিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন ? ইহাতে সেই মহান্ হইতেও মহান্ বিশ্বস্রষ্টার হৃদয়ে কি একটুও করুণার উদ্রেক হয় নাই ? বিধাতঃ ! এতই যদি তুমি হৃদয়হীন, এতই যদি তুমি কঠিন, এতই যদি তুমি নির্ম্মম—

তবে সংসারের লোকে বৃথা তোমায় পূজা করে কেন? কি ফলের প্রত্যাশায় বিশ্ববাসী তোমার অর্চ্চনা করিয়া থাকে বিভো! নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়, নির্ম্মম, কঠিনহৃদয় তুমি—যে তোমার পূজা করে সে ভ্রান্ত! যাহার নিকট করুণাকণার প্রত্যাশা নাই—তাহার পূজা কিসের জন্য?

শুনিয়াছি কোন জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে বিধাতা দুই জন। একজন শুভ, আর একজন অশুভের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। আমার মনে হয় তাহাই সত্য। নচেৎ যিনি করুণাময়, মঙ্গলময়, সর্ব্বশক্তিমান তাঁহার রাজ্যে এত দুঃখ কেন, এত হাহাকার কেন, এত অশ্রুপাত কেন—আমার এত বিড়ম্বনা কেন?

সংসারের শত কার্য্যে ব্যস্ত তোমরা—জগতের দুঃখ দেখিবার বা ভাবিবার অবকাশ তোমাদের নাই। কিন্তু আমি এই অনন্ত মহাশূন্য হইতে দেখিতেছি জগৎ কেবল হাহাকারে পূর্ণ। রোগে, শোকে, তাপে জগতের জীব জর্জ্জরিত। কোথাও অন্নহীনের হাহাকার, কোথাও ব্যাধিগ্রস্তের আর্ত্তনাদ, কোথাও প্রিয়জনবিরহিতের করুণ ক্রন্দন। দুঃখ—কেবল দুঃখ—অনন্ত দুঃখে এ পৃথিবী পরিপূর্ণ। হে নিত্য, হে শাশ্বত, হে অব্যয়, হে মহান্, হে সর্ব্বগত, হে সর্ব্বশক্তিমান্ বিশ্বপাতা! তোমার কর্ণে কি বিশ্ববাসীর এ হাহাকার ধ্বনি প্রবেশ করে না? না তোমার হৃদয় এমনই পাষাণ—যে এই বিশ্বব্যাপী করুণ আর্ত্তনাদে তোমার হৃদয় গলে না। জানিনা কি ঘোর প্রহেলিকাময় তুমি—আর তোমার এই সৃষ্টি!

যাক্! বৃথা বিধাতার নিন্দা করিতেছি! ক্ষুদ্র আমি—সে অনন্তের রহস্য আমি কি বুঝিব। এখন যাহা বলিতে আসিয়াছি তাহাই বলিব। জগতে দুঃখ সকলেই পায়, কিন্তু আমার মত চিরজীবন বুঝি কেহ এত দুঃখ পায় নাই। আমার সেই প্রাণভরা অনন্ত দুঃখকাহিনী তোমরা শ্রবণ কর।

২।

শৈশবের স্মৃতি আমার নাই। কাহারই বা থাকে? কিন্তু যদি থাকিত তবে সে স্মৃতি আমার পক্ষে সুখের না হইয়া দুঃখেরই হইত। আমার জীবনের আরম্ভ দুঃখে, শেষ দুঃখে। একবার এক ভিখারীর মুখে গান শুনিয়াছিলাম, তাহার সবটা আমার মনে নাই, কতকটুকু মনে আছে ঃ—

এবার আমি ভবে এসে,
একদিন মা বেড়াইনি হেসে,
শুধু কেঁদে কেঁদে দিন গেল মা—

যদি এ সঙ্গীতের সার্থকতা কোথাও ঘটিয়া থাকে তবে সে আমার জীবনে। যে কবি ঐ সঙ্গাত রচনা করিয়াছিলেন তিনি কখনও ভাবেন নাই যে তাঁহার এই উক্তি সত্য—তিনি কবি-জনোচিত অতিশয়োক্তিই করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই অতি-শয়োক্তি আমার জীবনে সত্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে। শৈশব হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আমার জীবনে সুখের দীপালোক কখন দেখা যায় নাই—চিরদিনই দুঃখের ঘনান্ধকার। জীবনে কখন আমার অধরে হাসি ফুটিয়া উঠে নাই।

হাসি ফুটিবে কি করিয়া? যেখানে সুখ, সেইখানে হাসি। সুখ ব্যতীত ত হাসি ফুটিতে পারে না। অগ্নি ব্যতীত কি আলোক সম্ভবে? পিতামাতা বা আত্মীয় স্বজনের হর্ষোৎফুল্ল লোচন দেখিয়া শিশুর অধরে হাসি ফুটিয়া উঠে। কিন্তু আমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গৃহ হইতে হর্ষ অন্তর্হিত হইয়াছিল। ছিল কেবল দুঃখ, দারিদ্র্য, নিরাশা আর মৃত্যুর বিকট মূর্ত্তি। পিতামাতার স্নেহ ছিল বটে, তাঁহাদের স্নেহমাখা দৃষ্টি আমার উপর বিন্যস্ত হইত বটে, কিন্তু সে স্নেহমাখা দৃষ্টিতে সুখ বা হর্ষ ছিল না। ছিল বিষাদ, নিরাশা, কাতরতা, দারিদ্র্য ও দুঃখ। সে দৃষ্টি দেখিয়া আমার শৈশবাধরে কেমন করিয়া হাসি ফুটিয়া উঠিবে?

যখন যে দিকে—যাহার দিকে চাহিতাম কেমন একটা আতঙ্ক—বিভীষিকা, দুঃখ, দারিদ্র্য, নিরাশা আমার শিশু-হৃদয়ে প্রতিফলিত হইত। স্বচ্ছ দর্পণে যেমন চতুর্দ্দিকস্থ পদার্থের মূর্ত্তি প্রতিফলিত হয়, আমার শিশু হৃদয়েও সেইরূপ দুঃখ, দারিদ্র্য ও নিরাশার ভাব প্রতিফলিত হইত। তাই হাসোজ্জ্বল না হইয়া আমার অধর বিষাদান্ধকারে সঙ্কুচিত হইত। আমি জীবনে কখন হাসি নাই। হে বিশ্ববাসী! তোমাদের মধ্যে এমন কেহ আছে কি যে জীবনে—শৈশবে, বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে, কখন হাস্য করে নাই?

কবিগণ শৈশবকে "মধুময়" "সুখময়" প্রভৃতি বিভূষণে বিভূষিত করিয়াছেন। বোধ হয় তাঁহারা আমার জীবনের ঘটনা জানিতেন না। কেননা তাহা হইলে বিশেষণগুলি অমন স্বাধীন ভাবে প্রয়োগ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন। শিশু ভালমন্দ বোঝে না, সময়ে অসময়ে—সুখে দুঃখে—তাহার রক্তিম অধরে মধুর হাসির ছটা ফুটিয়া উঠে। কিন্তু আমার শৈশবাধর কখন হাসির আলোকে উজ্জ্বল হয় নাই। জানিনা বিধাতা জন্ম হইতেই আমাকে দুঃখ অনুভব করিবার শক্তি দিয়াছিলেন কিনা, কিন্তু সুখ কখন অনুভব করিতে পারি নাই। দারিদ্র্যলাঞ্ছিত পিতামাতার করুণ দৃষ্টির প্রভাব যেন আমার হাসিকে মুকুলেই বিনষ্ট করিয়াছিল। সেই ভগ্ন আবাসের, আবাসের সাজসজ্জার, আবাসের অধিবাসিগণের প্রতি যখনই দৃষ্টিপাত করিতাম, তখনই কেমন একটা দুঃখাবেগ আমার শিশুহৃদয়কে ব্যথিত করিয়া তুলিত। সে বাধা অতিক্রম করিয়া আমার অধরে হাসি কখন ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। কাঁদিবার জন্য যাহার জন্ম, হাসিতে তাহার অধিকার কি?

অভাগিনী আমি কি কুক্ষণেই জন্মিয়াছিলাম? আমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই আমার বংশের অধঃপতন আরম্ভ হইল। অগ্নি সংযোগে তুলারাশি যেমন শীর্ণ হইয়া দগ্ধ হইয়া যায়, আমার কঠোর ভাগ্যের স্পর্শে আমার পিতৃকুলেরও সেই দশা ঘটিল। জন্মিয়াছিলাম আঢ্য

বংশে—আমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্য আসিল। যাহাদের অর্থে বহু নিরন্ন প্রতিপালিত হইত—আজ তাহারা অন্নহীন, শত শত দাস দাসী যাহাদের আজ্ঞাপালন করিত—আজ তাহাদের গৃহ জনমানব-শূন্য। জনকল্লোলমুখরিত, শত অর্থিপ্রত্যর্থি-সমাগমজনিত কলরব-পূর্ণ, প্রতিবেশী ও আত্মীয়জনসেবিত সেই বিপুল প্রাসাদ—দাসদাসী রহিত, অর্থিপ্রত্যর্থি বিরহিত এবং আত্মীয়-স্বজন শূন্য হইয়া পড়িল। কেন এমন হইল? দীপ্ত রবিকরোজ্জ্বল প্রদেশ সহসা এমন দারুণ অন্ধকারে আবৃত হইল কেন? এই অভাগিনী চিরদুঃখভাগিনীর জন্মই তাহার একমাত্র কারণ।

শাস্ত্রে কথিত আছে যে বিরুদ্ধ গুণের সংযোগে প্রবল গুণ দুর্ব্বল গুণকে জয় করিয়া থাকে। আমার দৌর্ভাগ্যের প্রাবল্য সেই জন্য আমার আত্মীয়স্বজনের ক্ষীণবল সৌভাগ্যকে জয় করিয়াছিল। নহিলে এমন ঘটিবে কেন? যদি আমার আত্মীয়স্বজন জীবিত থাকিবে তবে আমি দুঃখ পাইব কি করিয়া? বিষম বন্যার প্লাবনে লোকালয় যেমন শ্মশানে পরিণত হয়, আমার দুর্ভাগ্য-বন্যার প্লাবনে আমার পিতৃকুলেরও সেই দশা ঘটিল। একদিকে দারিদ্র্য তাহার বিকট মূর্ত্তি প্রকট করিল, অপর দিকে নিষ্ঠুর কাল আত্মীয়-স্বজনদিগকে একে একে কবলিত করিতে লাগিল। অন্নাভাবক্লিষ্ট পুত্রকন্যার মুখের দিকে করুণ নেত্রে চাহিতে চাহিতে জননী আমার শ্মশান শয্যায় শয়ন করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইলেন। অনিন্দ্যসুন্দর-কান্তি মধুরস্বভাব বংশের একমাত্র আশা—ভ্রাতা আমার অন্নাভাবে—বস্ত্রাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। রহিলাম কেবল আমি আর আমার রোগশোকক্লিষ্ট চিন্তাজ্বরজীর্ণ বৃদ্ধ পিতা। যে বিশাল ভবনে একদিন কত ফুল্লকুসুম তুল্য কুমার কুমারী পিতামাতা আত্মীয়-স্বজনগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইত—আজ সে প্রাসাদ তাহাদের কলহাস্যে মুখরিত না হইয়া পেচককুলের বিকট রবে কম্পিত। কত যুবক-যুবতী শত আশা-উৎসাহ-আনন্দ বুকে

করিয়া স্নিগ্ধহাস্তে ও কলগুঞ্জনে একদিন যে ভবন আমোদিত করিত, আজ দারিদ্র্য ও শমনের বিকট মূর্ত্তি সে ভবন একেবারে নিরানন্দ ও অন্ধকারময় করিয়া তুলিল। বৃদ্ধজনমুখোচ্চারিত ভগবৎস্তোত্র-ধ্বনি একদিন যে ভবন শান্তিময় করিয়া রাখিয়াছিল, আজ সেই ভবন আমাদের দুই পিতাপুত্রীর হতাশের দীর্ঘশ্বাস এবং নিরন্নের কাতরতায় নিতান্ত অশান্তিময় হইয়া পড়িল। সহসা যেন কোন যাদুবিদ্যাবলে নন্দনকানন শ্মশানে পরিণত হইল।

৩।

যে যতই দুঃখ পাউক সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। দিন আসে, দিন যায়, দিনে দিনে মাস, মাসে মাসে বৎসর অতিবাহিত হয়। আমাদেরও দিন কাটিতে লাগিল। সেই দারিদ্র্য-পীড়িত জন-মানব-শূন্য ভগ্ন প্রাসাদে দুই পিতাপুত্রী আমরা দুঃখের পসরা মাথায় করিয়া দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। অনন্ত শোক-দুঃখ-ভার-বহন-ক্লিষ্ট জীবন্মৃত পিতা আমার করুণ-দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিতেন, আর অনন্ত দুঃখপূর্ণ হৃদয় লইয়া আমি কাতর-নেত্রে পিতার দিকে চাহিতাম। দুঃখের বিনিময়ে দুঃখ আমরা উভয়ে উভয়কে দিতাম। আর কিছু দিবার, লইবার, বা ভাবিবার ছিল না। দুঃখ—কেবল দুঃখ। অনন্ত সমুদ্রমধ্যে যেমন অপার—অগাধ—অনন্ত নীল জল-রাশি ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না, তেমনি অনন্ত দুঃখ-সমুদ্রে ভাসমান আমরা দুই পিতাপুত্রী অপার দুঃখ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইতাম না। দুঃখ! তুমি কি এতই অসীম?

সুখসৌন্দর্য্যপূর্ণ বিশাল পৃথিবী আর তাহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য আমাদের চক্ষে একেবারে নীরস ও অপ্রীতিকর হইয়া পড়িয়াছিল। প্রকৃতির অযাচিত দান দরিদ্র বলিয়া আত্মীয়স্বজনগণের ন্যায় আমাদের পরিত্যাগ করে নাই। শরতের শুভ্র জ্যোৎস্না অনাহূতভাবে গৃহে প্রবেশ করিত, বসন্তের মৃদুমলয়ানিল গৃহমধ্যে সঞ্চালিত হইত,

প্রভাতে ও সন্ধ্যায় বিহঙ্গমকুলের মধুর সঙ্গীতধ্বনি বায়ু-বাহিত হইয়া কর্ণে প্রবেশ করিত। কিন্তু কে চায়? সে সকলে ত দুঃখের অস্তিত্ব ছিল না। দুঃখভোগের জন্য আমাদের জন্ম—যাহাতে দুঃখের সংস্পর্শ নাই তাহা আমাদের ভাল লাগিবে কি করিয়া? অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সেই ভগ্ন-প্রাসাদের কয়েকটি জীর্ণ মলিন এবং শ্রীহীন প্রকোষ্ঠে প্রাণভরা দুঃখ লইয়া আমরা দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলাম।

অন্ন সংস্থানের চেষ্টায় পিতা কখন কখন গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন। কিন্তু সে কেমন চেষ্টা? হয়ত কোন প্রজার নিকট প্রচুর রাজস্ব বাকী আছে, সে যদি দয়া করিয়া কিছু দেয়। হয়ত কেহ ঋণ লইয়াছিল, সে যদি কৃপা করিয়া কিছু অর্থ প্রদান করে। হয়ত কেহ উপকৃত হইয়াছিল, সে যদি কিছু প্রত্যুপকার করে। কিন্তু প্রায়ই পিতাকে বিমুখ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইত। হইবে নাই বা কেন? যাহার বলপূর্ব্বক লইবার শক্তি নাই—প্রজা তাহাকে রাজস্ব দিবে কেন? যাহার রাজদ্বারে অভিযোগ করিবার ক্ষমতা নাই, ঋণী তাহার ঋণ পরিশোধ করিবে কেন? যে নিঃস্ব নিঃসহায় নির্ধন উপকৃত তাহার প্রত্যুপকার করিবে কেন? পিতার শুষ্ক ও বিবর্ণ মুখ দেখিয়া আমার বালিকা হৃদয় বুঝিতে পারিত যে পিতা আমার আজ হয়ত কোন ঋণীর নিকট কিঞ্চিৎ অর্থ প্রার্থনা করিতে যাইয়া অপমানিত হইয়াছেন, হয়ত কোন প্রজার নিকট রাজস্ব চাহিতে গিয়া লাঞ্ছিত হইয়াছেন। আমি প্রাণপণে তাঁহার দুঃখাপনোদন করিতে চেষ্টা পাইতাম—কিন্তু পারিতাম না। শত পরিচর্য্যাতেও পিতা আমার সে দুঃখ ভুলিতে পারিতেন না। অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে—করুণ বচনে আমাদের বংশের পূর্ব্ব সমৃদ্ধি ও প্রজা, ঋণী এবং উপকৃতের বশ্যতার কথা, আর বর্ত্তমানে আমাদের চরম দুরবস্থায় প্রজা, ঋণী ও উপকৃতের ঔদ্ধত্যের কথা জীবন্ত-চিত্রের মত আমার চক্ষুর সম্মুখে অঙ্কিত করিতেন। আমি তন্ময় হইয়া

শুনিতাম আর ভাবিতাম, এই কি সংসার ? এই জগৎ কি মনুষ্যের আবাসভূমি ? ইহাই যদি মনুষ্যের আবাসভূমি হয়, তবে পিশাচের আবাস কোথায় ? তখন আমার বালিকা-হৃদয়ে বোধ করিতাম যে ইহা মনুষ্যের দেশ নহে—পিশাচের দেশ। কর্ম্মবিপাকে আমরা এই পিশাচের দেশে নীত হইয়াছি।

পিতা যখন বহির্গত হইয়া যাইতেন, তখন প্রায়ই আমি একাকিনী থাকিতাম। কিন্তু তাহাতে আমার ভয় হইত না। সেই জনশূন্য ভগ্ন-প্রাসাদ, সেই বিভীষিকাময় দৃশ্য, সেই গভীর নিস্তব্ধতা আমার প্রাণে ভয় উৎপাদন করিতে পারিত না। পারিবে কেমন করিয়া ? দুঃখে যাহার জন্ম, দারিদ্র্য যাহার নিত্য সহচর, জগতে এমন কোন বিভীষিকা আছে কি—যাহা তাহাকে ভীত করিতে পারে। সে সময়ে আমি বরং সচ্ছন্দ বোধ করিতাম। কেননা, পিতার সেই বিষণ্ণ বদন, করুণ দৃষ্টি, নিরাশার দীর্ঘশ্বাস আর আমার দেখিতে বা শুনিতে হইত না। পিতার অনুরোধে কখন কখন দুই একটি বালিকা আমার নিকট আসিত। কিন্তু সে ক্ষণেকের জন্য। সুখপালিতা তাহাদের সহিত আমার হৃদয় মিলিবে কেন ? আলোক ও অন্ধকারের মধ্যে যে পার্থক্য—তাহাদের হৃদয়ের সহিত আমার হৃদয়েরও সেই পার্থক্য। অন্ধকার আলোক হইতে যেমন দূরে থাকে, আমার হৃদয়ও তাহাদের সমাগম হইতে সেইরূপ দূরে থাকিতে চাহিত। তাহারা এই জগতের কথা, জগতের সুখ দুঃখের কথা, আশা ও নিরাশার কথা আমার নিকট বলিতে আসিত। কিন্তু আমি ত সে সকল জানিতাম না। আমি এ জগৎ বা জগদ্বাসীকে চিনি না। চিনি কেবল আমাদের সেই ভগ্ন আবাস আর আমার সেই বৃদ্ধ পিতা। আমি জগতের সুখের কথা কিছুই জানি না, জানি কেবল দুঃখের কথা। আশার আলোক কখন আমার হৃদয় আলোকিত করে নাই, নিরাশার ঘোর অন্ধকারে চিরদিন তাহা পরিপূর্ণ। তাই তাহাদের সহিত আমার মনের মিলন হইত না।

অসুখকর বোধে ক্ষণেকের জন্য আসিয়া তাহারা চলিয়া যাইত, আর আমি সেই নির্জ্জন-প্রাসাদে দুঃখ ও দারিদ্র্যকে অন্তরঙ্গ করিয়া একাকিনী থাকিতাম। দুঃখ-দারিদ্র্য! তোমরা যাহার চিরসঙ্গী—তাহার আর অন্য সঙ্গীর আবশ্যকতা কি।

দারিদ্র্য! এ জগতে তুমিই শ্রেষ্ঠ! মৃত্যু তোমার নিকট অতি তুচ্ছ। যে সংসারজ্বালায় জ্বালাতন, বিষদিগ্ধ বাণের মত সংসারের শত যন্ত্রণা যাহার হৃদয় কাতর করিয়া তুলিয়াছে মৃত্যু তাহার সকল যাতনার অবসান করিয়া দেয়। আর হে দারিদ্র্য! তুমি? তুমি মৃত্যু অপেক্ষা ভীষণ, মৃত্যু অপেক্ষা কঠোর, মৃত্যু অপেক্ষা নির্ম্মম। মৃত্যু ত এ জগতের সকল যন্ত্রণার অবসান করিয়া দেয়, কিন্তু তুমি পলে পলে তিলে তিলে মনুষ্যের অন্তরাত্মাকে দগ্ধ করিতে থাক। শুনিয়াছি ধর্ম্মশাস্ত্রে সুরাপানের প্রায়শ্চিত্ত কঠোর তুষানল। কিন্তু তুষানল তোমার নিকট অতীব অকিঞ্চিৎকর। তুষানলে দগ্ধ হইয়া মনুষ্য এক, দুই, তিন দিনে বা সপ্তাহে প্রাণত্যাগ করে। আর তুমি তুষানলের মত ধিকি ধিকি দগ্ধ কর, কিন্তু প্রাণসংহার করনা ত? তোমাকে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছি, কিন্তু তথাপি তোমায় চিনিতে পারিলাম না। কবিগণ মায়াকে অঘটনঘটনপটীয়সী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হয় যে সর্ব্বাপেক্ষা অঘটনঘটনপটীয়ান্ যদি কেহ থাকে তবে সে তুমি। মহাকবি কালিদাস হিমাচল-বর্ণন-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, যাহার বহু গুণ আছে এক দোষে তাহার গুণের খর্ব্বতা করিতে পারে না। কিন্তু হে দারিদ্র্য! তোমার নিকট মহাকবির এবাক্য সম্পূর্ণ বিফল। তাই কোন কবি কালিদাসের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন যে বহুগুণের সন্নিপাতে একটি দোষ নিমজ্জিত হয়—কবির এই উক্তি সত্য বটে, কিন্তু কবি ইহা লক্ষ্য করেন নাই যে দারিদ্র্যদোষ সকল গুণ নষ্ট করিয়া থাকে। দারিদ্র্য! তুমি যাহাকে আশ্রয় করিয়াছ তাহার রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি সকলি বিফল! তোমার প্রভাবে যাহার জিহ্বাগ্রে সরস্বতী

বিদ্যমানা ছিলেন, সেই কবি কালিদাসের বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় নাই, তোমার প্রভাবে রাজচক্রবর্ত্তী হরিশ্চন্দ্র চণ্ডালের দাস, তোমার প্রভাবে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বিরাট রাজের ভৃত্য। তোমা অপেক্ষা জগতে আর বলবান্ কেহ আছে কি? দারিদ্র্য! তোমার কি হৃদয় আছে? সে হৃদয়ে কি ভালবাসা আছে? সে ভালবাসা কি আমার উপর ন্যস্ত করিয়াছ? ভালবাসা নহিলে তুমি ক্ষণেকের জন্য আমায় ভুলিতে পারিতেছ না কেন? কালিদাসের মূকতা সেত দিনেকের জন্য, হরিশ্চন্দ্রের চণ্ডালের দাসত্ব সেত অল্প সময়ের জন্য, যুধিষ্ঠিরের ভৃত্যভাব সেত বৎসরেকের জন্য! কিন্তু তুমি কি আমায় এতই ভালবাস যে জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আমায় ত্যাগ করিতে পারিলে না? দারিদ্র্য! তোমার কঠোর নির্ম্মম প্রেমে আমি জর্জ্জরিত, আমার হৃদয় দীর্ণ বিদীর্ণ, আমার অন্তরাত্মা নিতান্ত কাতর। তোমার ভালবাসা হইতে আমায় অব্যাহতি দিতে পার কি? এ অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কি ভালবাসিবার আর কাহাকেও পাও নাই যে আমার এই বাল্যহৃদয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ? যদি এতই ভাল বাসিয়া থাক—তবে হে দারিদ্র্য! তোমার চরণে শত প্রণিপাত করিতেছি, তোমার ঐ কঠোর ভালবাসা হইতে আমায় নিষ্কৃতি দাও। অনেক সহিয়াছি, আর পারি না। আর তোমার ভালবাসা—তোমার প্রগাঢ় আলিঙ্গনের বেগ আমার সহ্য হয় না।

৪।

এমনি করিয়া দিন কাটিতে লাগিল। আমি শৈশব হইতে বাল্যে, বাল্য হইতে কৈশোরে পদার্পণ করিলাম। আমার দেহ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইল, কিন্তু অবস্থার অবস্থান্তর হইল না। সেই একই অবস্থা! দুঃখ—দারিদ্র্য—আর নিরাশা। শৈশবে, বাল্যে, কৈশোরে তাহারা কেহই আমায় পরিত্যাগ করে নাই।

যেখানে দুঃখ, দারিদ্র্য, অভাব ও অনটন, সেই খানেই আধিব্যাধির প্রাবল্য। বৃদ্ধ পিতা আমার এ দুঃখ দারিদ্র্য সহিয়া অব্যাহত থাকিতে পারিলেন না। মনঃ যাহার দুঃখে শোকে জর্জ্জরিত তাহার দেহ কি সুস্থ থাকিতে পারে? অচিরে কঠিন ব্যাধি পিতার শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। একাকিনী সেই ভগ্ন প্রাসাদে ব্যাধিগ্রস্ত পিতাকে লইয়া আমি দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলাম।

আমার বিবাহের বয়স হইয়াছিল। অভাগিনীর রূপের খ্যাতিও বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল। তাই অনেক পাত্রের পিতা রূপবতী বধূ লাভের জন্য পিতার নিকট আসিত। কিন্তু বঙ্গের ব্রাহ্মণ কায়স্থের পাত্র ত কেবল পাত্রী বিবাহ করে না, পাত্রী এবং অর্থ উভয়ই বিবাহ করিয়া থাকে। পাত্রী পাত্রের জন্য—আর অর্থ পাত্রের পিতার জন্য। আমার পিতার অর্থ ছিল না। সেইজন্য অনেক পাত্রের পিতা ফিরিয়া যাইত। কয়েকজন পাত্রের পিতা বিনা অর্থে আমাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিয়া অনুগৃহীত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সকল পাত্রের রূপগুণের বর্ণনা করিয়া পিতা আমার একদিন বলিয়াছিলেন—"মা কুন্দ! তোমার গলায় পাথর বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দিতে পারি, কিন্তু ওরূপ পাত্রে তোমায় সমর্পণ করিতে পারি না।" হা পিতঃ! তুমি কখন স্বপ্নেও কল্পনা কর নাই যে ভবিষ্যতে এরূপ পাত্রই আমার অদৃষ্টে ঘটিবে।

পিতা যে আমার বিবাহ দেন নাই তাহার আরও একটি কারণ ছিল। আমাকে পরের হাতে সমর্পণ করিয়া পিতা কাহাকে লইয়া থাকিবেন? এ সংসারে এ দুঃখিনী কন্যা ব্যতীত আর ত তাঁহার কেহ ছিল না। পিতা বলিতেন, "মা! তোমাকে পরের হাতে সমর্পণ করিয়া কাহাকে লইয়া এ জগতে থাকিব।" আমিও তাহাই ভাবিতাম। আত্মীয়স্বজনহীন, অর্থহীন, সামর্থ্যহীন, রোগগ্রস্ত বৃদ্ধ পিতাকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া আমি পরগৃহে বাস করিব? এ বিশ্বে এমন কোনও স্থান আছে কি—সে স্থানে এমন কোন

সুখ আছে কি—সে সুখের এমন কোন আকর্ষণী শক্তি আছে কি—যাহা আমার বৃদ্ধ পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া তথায় যাইবার জন্য আমাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে? আমি সুখ চাহি না, ঐশ্বর্য্য চাহি না, স্বর্গ চাহি না, চাই কেবল আমার অভাগ্য পিতার সান্নিধ্য।

সংসার পরিবর্ত্তনশীল। কবি বলিয়াছেন, সংসারে সুখ এবং দুঃখ চক্রবৎ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। কিন্তু আমার জীবনচক্রে বিধাতা বুঝি সুখের অংশ সংযুক্ত করিতে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তাই আমার জীবনচক্রের পরিবর্ত্তন কেবল দুঃখই বহন করিয়া আনিতেছিল—তিল মাত্র সুখ তাহাতে ছিল না। দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল—আমার দুঃখময় জীবনের দুঃখরাশি ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল। ব্যাধিগ্রস্ত পিতা আর অর্থাহরণের চেষ্টায় বহির্গত হইতে পারিতেন না। কোন দিন অর্দ্ধাশনে—কোন দিন অনশনে আমাদের দিন কাটিতে লাগিল। আমার অনশনক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া পিতা কাতর হইতেন। আমি বৃদ্ধ রুগ্ন পিতার অনশনক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া মর্ম্মাহত হইতাম।

ভারবাহী ব্যক্তির উভয় দিকের ভার যেমন পরস্পরের মুখাপেক্ষী—একের অভাবে অপরের অস্তিত্ব যেমন অসম্ভব, আমাদের দুই পিতাপুত্রীরও সেইরূপ হইয়াছিল। আমার অভাবে পিতার এবং পিতার অভাবে আমার অস্তিত্ব যেন অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু আমার অদৃষ্টে অসম্ভবও সম্ভব হইল। পিতা আমায় ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু আমার মৃত্যু হইল না। আমার মৃত্যু হইলে এ অসহ্য দুঃখভার কে বহন করিবে? তাই বুঝিয়াই বুঝি মৃত্যু আমায় অব্যাহতি দিয়াছিল।

কোন দিন অর্দ্ধাহারে, কোন দিন অনাহারে আমি দিন-রাত্রি পিতার পরিচর্য্যা করিতাম। জগতে আর ত আমার বলিতে আমার কেহ নাই। সংসারে একমাত্র সহায়—একমাত্র অব

লন্ধন পিতার মৃত্যু হইলে আমার কি হইবে,—আমি কোথায় দাঁড়াইব—কে আমায় আশ্রয় দিবে—এই চিন্তা অহর্নিশি আমায় ব্যাকুল করিয়া তুলিত। পিতাকে কালের করাল কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিতাম। উদরে অন্ন নাই, রাত্রে নিদ্রা নাই, দিবানিশি বিশ্রাম নাই—আমি অনন্যমনে পিতার শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম।

পিতা বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার জীবনের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে! কোন্ সময়ে শমন তাঁহাকে লইতে আসিবে সেই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, আর ভাবিতেছিলেন তাঁহার এই দুঃখিনী কন্যার ভবিষ্যৎ। মৃত্যুশয্যাশায়িত পিতার আমার যন্ত্রণা যেন শতগুণ বাড়িয়া উঠিয়াছিল। আমাকে একাকিনী—নিরাশ্রয়া ফেলিয়া যাইবেন, সেই চিন্তা তাঁহার মরণযন্ত্রণাক্লিষ্ট অন্তরাত্মাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছিল। পিতা আমার ক্ষণে ক্ষণে ভাবিতেন, কত কথা বলিতেন, কত বুঝাইতেন, কত আদর করিতেন—কিন্তু প্রাণে তাঁহার শান্তি ছিল না। কথায়, ভঙ্গিতে, আকারে, দৃষ্টিতে বুঝিতেছিলাম যে, এই অভাগিনী কন্যার ভবিষ্যৎ ভাবনাজনিত দুশ্চিন্তা তাঁহার অন্তরাত্মাকে দীর্ণ বিদীর্ণ করিতেছিল।

এমনি করিয়া সেই ভগ্ন-আবাসে মরণোন্মুখ পিতাকে লইয়া অনশনে অর্দ্ধাশনে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। তারপর আসিল—সেই দিন।

৫।

সে দিনের কথা মনে করিলে—কি করিয়া বলিব—ওগো কি ভাষায় বুঝাইব—সে আমার কেমন দিন। ভাষায় এমন কথা নাই—কথায় এমন শক্তি নাই—শক্তির এমন বিকাশ নাই—যে সে দিনের কথা প্রকাশ করিতে পারি। এমন দিন এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কখন কাহারও ভাগ্যে আসিয়াছিল কি না সন্দেহ। যদি চেতনা থাকিত তবে আমার সে দিনের দুঃখ দেখিয়া পৃথিবী বজ্রকঠোরনাদে

বিদীর্ণ হইয়া যাইত, আকাশ স্বস্থানচ্যুত ও ভীমবেগে পৃথিবীর বক্ষে আপতিত হইয়া আপনাকে ও পৃথিবীকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিত, সপ্ত সমুদ্রের জল উথলিয়া উঠিয়া বিশ্বসংসার প্লাবিত করিয়া দিত। যে দিনের কথা মনে করিলে আজিও আমার চক্ষুঃ সপ্ত সমুদ্রের সৃষ্টি করে, আজিও আমার হৃদয় কোটি শূলভেদের যন্ত্রণা অনুভব করে, আজিও আমার কণ্ঠ হাহাকার রবে দিগ্‌দিগন্ত পূর্ণ করিতে চায়—আসিল সেই দিন। সে দিনের কথা বলিবার নহে, বুঝাইবার নহে, শুধু—বুঝিবার।

সে দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে হইতেই প্রলয়ের কাল মেঘে আকাশ ঢাকিয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ভীষণ বেগে বায়ু প্রবাহিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিয়া বজ্র গম্ভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল। ক্ষণপ্রভার দীপ্তি ক্ষণেকের জন্য জগৎকে পরিদৃশ্যমান করিয়া পরক্ষণেই অন্ধকারের গাঢ়তা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতে লাগিল। যেন লক্ষ দৈত্য গভীর গর্জ্জন ও অট্টহাস্য করিয়া সৃষ্টি ধ্বংস করিতে উদ্যত।

সেই বাত্যাবর্ষণবিক্ষুব্ধা ঘোরান্ধকারাবৃতা রজনীতে পিতার রোগ-যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পিতা অস্থির হইলেন, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল, ইন্দ্রিয়সকল শিথিল হইয়া আসিল। পিতা আমাকে কাছে ডাকিয়া আমার মস্তকে হস্তার্পণ করিলেন। তার পর কত কথা বলিলেন, কত উপদেশ দিলেন, কত বুঝাইলেন। আমি কতক শুনিলাম, কতক শুনিতে পাইলাম না। পিতার প্রতি নিশ্বাসে, প্রতি কথায়, প্রতি ভঙ্গীতে, অসহ্য যন্ত্রণার ভাব পরিব্যক্ত হইতেছিল, আর তাহা দেখিয়া আমার হৃদয় শত বৃশ্চিক দংশনের যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিল।

কোন কোন দিন দুই একজন প্রতিবাসী দয়া করিয়া সন্ধ্যার পরে সংবাদ লইতে আসিত; কিন্তু সেই দুর্য্যোগের দিনে কে আর

এ দরিদ্রদিগের সংবাদ লইতে আসিবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমি একাকিনী থাকিতেই ভাল বাসিতাম, কিন্তু সে দিন অন্য কাহারও উপস্থিতি আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলাম। সে যদি কিছু জানে, যাহাতে পিতার এই যন্ত্রণার উপশম হয়। ভাল চিকিৎসা হইলে বোধ হয় পিতার প্রাণ রক্ষা হইতে পারে, এইরূপ ভাবিয়া অন্যের সান্নিধ্য প্রার্থনা করিতেছিলাম। হায়! কোথায় চিকিৎসক, কোথায় ঔষধ, কোথায় পথ্য! সেই ভীমা রজনীতে, সেই জনমানবশূন্য ভগ্নপ্রাসাদে একাকিনী মরণোন্মুখ পিতার শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু ক্রমেই রোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে স্বর অস্পষ্ট হইল, অঙ্গ অবশ হইয়া আসিল।

মৃত্যুযাতনাক্লিষ্ট পিতার ক্ষীণ শরীরে নির্ম্মম মৃত্যু তাহার তুষারশীতল হস্ত বিস্তৃত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু সেই অন্তিমকালে মরণযাতনা সহিয়াও পিতা আমার এই অভাগিনী নিরাশ্রয়া কন্যার মমতা ভুলিতে পারেন নাই। আমার প্রাণের ভাব—তাহা আমি কি বলিয়া বুঝাইব? অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমার একমাত্র আত্মীয়, একমাত্র হিতৈষী, একমাত্র আপনার, একমাত্র ভরণপোষণকর্ত্তা, একমাত্র আশ্রয়স্থল—জীবনের সর্ব্বস্ব পিতা আমার মৃত্যুশয্যায় শায়িত। মৃত্যুশীতল নিস্পন্দ—নিশ্চেষ্ট দেহ বক্ষে লইয়া আমি বার বার ডাকিতেছি—"বাবা! বাবা"! সেই কাতরধ্বনি পিতার কর্ণে এক একবার প্রবেশ করিতেছে, পিতা তখন মৃত্যুজড়ালস-নয়নে এক একবার আমার দিকে চাহিতেছেন। সে কি দৃষ্টি! কি করুণ সে দৃষ্টি! কি মর্ম্মস্পর্শী সে দৃষ্টি! সে দৃষ্টি যেন বলিতেছিল—মা—মা কুন্দ! আমার জীবনের সর্ব্বস্ব! আমার যাইবার ইচ্ছা ছিল না মা—তোমাকে এমন অনাথিনী অসহায়া রাখিয়া আমার যাইবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কি করিব মা! মৃত্যু আমায় বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছে। কখন বা পিতা চক্ষুঃ উন্মীলন করিবার চেষ্টা করিয়াও উন্মীলিত করিতে পারিতেছিলেন না। কখন বা সামান্য চক্ষুঃ উন্মীলন করিতে পারিলেও সে দৃষ্টিতে কোন ভাব ছিল না, মৃত্যু সকলই অপহরণ করিয়া

লইয়াছিল। শেষ একবার আমার প্রতি করুণদৃষ্টিতে চাহিয়া পিতা চক্ষুঃ মুদ্রিত করিলেন, দেহ নিস্পন্দ হইল।

সভয়ে ডাকিলাম—"বাবা! বাবা"! উত্তর নাই। আবার চীৎ-কার করিয়া ডাকিলাম—"বাবা! বাবা!" হায়! কে উত্তর দিবে! সেই নির্জ্জন প্রাসাদে প্রতিধ্বনি উপহাস করিয়া বলিল—"কোথায় তোর বাবা"! বায়ু শন্ শন শব্দ করিয়া বলিল—"কোথায় তোর বাবা"! মেঘ গর্জ্জন করিয়া উঠিল—"কোথায় তোর বাবা"! বারি-ধারা ঝম্ ঝম্ করিয়া বলিল—"কোথায় তোর বাবা"! পিশাচীর ন্যায় অট্টহাস্য করিয়া বিদ্যুৎ উপহাস করিল—"কোথায় তোর বাবা"! তবে কি পিতা আমার জীবিত নাই? যে কথা ভাবিতেও আতঙ্ক হয় আমার অদৃষ্টে কি তাহাই ঘটিয়াছে? ওগো কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব—কে বলিয়া দিবে? এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কে দয়াবান্ আছ বলিয়া দাও আমার পিতা মৃত কি জীবিত?

না—না—অসম্ভব। আমায় একাকিনী, অসহায়া, নিরাশ্রয়া রাখিয়া পিতা কখনই মরিতে পারেন না। তিনি মরিলে তাঁহার আদরের কুন্দ কোথায় দাঁড়াইবে। পিতা আমার নিদ্রিত। আহা! যাও বাবা! নিদ্রা যাও। রোগ যন্ত্রণায় না জানি কি কষ্টই তোমার হইতেছে। নিদ্রার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া ক্ষণেকের জন্য শান্তিলাভ কর। হায়! তখনও বুঝি নাই যে এ মহানিদ্রা। এ নিদ্রায় নিদ্রিত হইলে মনুষ্য আর জাগরিত হয় না।

এইরূপ কত ভাবিলাম। ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রা আসিল। হস্তে মস্তক ন্যস্ত করিয়া হর্ম্ম্যতলে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন দেখিলাম অনেক প্রতিবেশী গৃহমধ্যে সমবেত হইয়াছে। বিস্মিত ও শঙ্কিত-চিত্তে উঠিয়া বসিলাম, দেখিলাম পিতার সৎকারের আয়োজন হইতেছে। তখন বুঝিলাম কাল আমার পিতাকে অপহরণ করিয়াছে। পিতার মৃতদেহ বক্ষে ধারণ করিয়া দরবিগলিত-নেত্রে কাঁদিতে লাগিলাম।

হে শমন! তুমি সাবিত্রীর প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া তাহার স্বামীর জীবন দান করিয়াছিলে, আমার বৃদ্ধ পিতাকে আমায় ফিরাইয়া দিতে পার কি? দেখ আমি নিঃসহায়, নিরাশ্রয়—ক্ষুদ্র বালিকা—ঐ বৃদ্ধ পিতা ব্যতীত আর আমার কেহ নাই। হে ত্রিভুবনজনান্তক! তোমার রাজ্যে ত প্রাণীর অভাব নাই। এই অক্ষম বৃদ্ধের প্রাণ লইয়া তোমার রাজ্যের কি উন্নতি সাধিত হইবে? তুমি দেবতা—মানবের না হউক—আমার এ দুঃখ দেখিয়া দেবতার দয়া হয় না কি? আর যদি একান্তই লইতে হয় তবে পিতার সহিত আমাকেও গ্রহণ কর। হে মৃত্যু! তোমার চরণে ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি তোমার করাল পাশে আমাকেও বদ্ধ করিয়া লও। পিতাকে ছাড়িয়া আমি এ জগতে থাকিতে চাহি না।

না—না—কাজ নাই! আমাকে যদি লইতে পার তবে লও—কিন্তু পিতার জীবন দানে আর প্রয়োজন নাই। কিসের জন্য জীবন দান? রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য সহিবার জন্য ত? তাই বলিতেছি কাজ নাই। আমি ত ডুবিয়াছি—ডুবিব। কিন্তু পিতা আমার সকল দুঃখ, সকল শোক, সকল যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন—সেই ভাল। যাও পিতঃ! যেখানে রোগ নাই, শোক নাই, দুঃখ নাই, দারিদ্র্য নাই, সেই পরম লোকে যাও। আমার অদৃষ্টে যাহা ঘটে ঘটিবে।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে

[২]

শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছিলেন, "১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় সম্মানসূচক এল, এল, ডি-উপাধি প্রাপ্ত হন। কলিকাতা য়ুনিভার্সিটী তাঁহাকে এই উপাধি দান করেন। ইহার পূর্ব্বে কোনও বাঙ্গালী এই সম্মান পান নাই। উপাধি প্রাপ্তির খবর পাইয়াই রাজেন্দ্রলাল ভাবিলেন, শুভসংবাদটা গৃহিণীকে একবার দিয়া আসি; শুনিয়া নিশ্চয়ই তাঁহার খুব আহ্লাদ হইবে।—সটান গৃহিণীর সকাশে গমন। ভুবনমোহিনী তখন সাংসারিক কাজকর্ম্মে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি পূর্ব্বেই স্বামীর উপাধি প্রাপ্তির সংবাদ শুনিয়াছিলেন। স্বামীকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

তুমি নাকি কি একটা 'পায়া' পাইয়াছ?

রাজেন্দ্রলাল বলিলেন—হাঁ, য়ুনিভার্সিটী আমাকে এল, এল, ডি পদবী দিয়াছেন। ইহা একটা খুব বড় সম্মান। কোনও বাঙ্গালীর ভাগ্যে পূর্ব্বে এ পদবী ঘটে নাই। ভুবনমোহিনী এল, এল, ডি'র অর্থ ঠিক বুঝিলেন না। খানিক স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া বলিলেন,—পদবী-টদবী বুঝি না, উহাতে কত টাকা পাওয়া যাইবে তাই শুনি। রাজেন্দ্রলাল বলিলেন—টাকা ত পাওয়া যাইবেই না, উপরি এখন ৩০০৲ টাকা দিয়া গাউন তৈয়ারী করাইতে হইবে।

রাজেন্দ্রলালের পত্নী সেকালের ইংরাজীভাববর্জ্জিতা সরলা নারী। সম্মান অর্জ্জন করিতে হইলে যে কিঞ্চিৎ রজতখণ্ডেরও বিসর্জ্জন দিতে হয় তাহা তাঁহার সরল বুদ্ধিতে আসিল না। বিস্মিত হইয়া স্বামীকে বলিলেন—"টাকা পাওয়া যাবে না? তবে অমনধারা 'পায়ায়' কাজ নেই, ছেড়ে দাও।"

রাজেন্দ্রলাল পত্নীর কথায় ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া অন্তঃপুর হইতে ধীরপদে প্রস্থান করিলেন।—এ গল্প আমরা পরে, সম্ভবতঃ ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলালের নিজের মুখে শুনিয়াছিলাম।

কৃষ্ণদাস পাল ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র এক সঙ্গে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের কাজ করিতেন। কিন্তু কোনও কোনও বিষয়ে উভয়ের মতের মিল হইত না। পাল মহাশয় হিন্দু পেট্রিয়ট চালাইতেন। যখন পেট্রিয়টে রাজেন্দ্রলালের দ্বারা ঐ সকল বিষয়ে কোনও প্রস্তাব লেখার দরকার হইত, কৃষ্ণদাস তাঁহার বাসায় গিয়া ধরিয়া বসিতেন। অগত্যা মিত্র মহাশয়ের কথামত তিনি লিখিয়া লইয়া যাইতেন। এই সকল লেখায় অবশ্য রাজেন্দ্রলালের নিজের মতই ব্যক্ত থাকিত। কিন্তু ছাপিতে দেওয়ার সময় কৃষ্ণদাস ঐ সকল প্রবন্ধের স্থানে স্থানে, ঠিক নিজের মতের সমর্থক হয় এমনি ভাবে ঈষৎ বদলাইয়া পেট্রিয়টে বাহির করিতেন। এই রকম মজা প্রায়ই হইত। বলা বাহুল্য, রাজেন্দ্রলাল ভারি চটিয়া যাইতেন এবং কৃষ্ণদাসকে ডাকিয়া আচ্ছা করিয়া ধমকাইয়া দিতেন! অবশ্য তাঁহার রাগ কিছু স্থায়ী হইত না। কৃষ্ণদাসকে না হইলে তাঁহার চলিত না, রাজেন্দ্রলাল ভিন্ন কৃষ্ণদাসেরও অন্য গতি ছিল না!

কৃষ্ণদাসকে লইয়া রাজেন্দ্রলাল কৌতুক করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার চাপকানের সমালোচনাই কতদিন যে হইয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। যাঁহারা রাজেন্দ্রলালকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন, বেশের পারিপাট্য তাঁহার খুব ছিল। তিনি অধিক দাম দিয়া চাপকান, পিরাণ প্রভৃতি বেশ পছন্দসহি করিয়া প্রস্তুত করাইতেন। তিনি যে ঠিক বিলাসী ছিলেন তাহা নহে, তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন এবং নিজে পরিষ্কৃত থাকিতে ও পরকে পরিষ্কৃত দেখিতে ভালবাসিতেন। বাবু কৃষ্ণদাস পালের বেশের পারিপাট্যের প্রতি একেবারেই লক্ষ্য ছিল না। বোধ হয় তাহা লক্ষ্য করিবার অবসরও তাঁহার অল্পই ছিল। সর্ব্বদা কাজ লইয়াই

তিনি ব্যস্ত থাকিতেন। রাজেন্দ্রলাল প্রায়ই আঙুল দিয়া কৃষ্ণদাসকে দেখাইয়া বলিতেন—এঁর এই যে চাপকানটি দেখ্‌ছেন, এটি মান্ধাতার আমলের। লাট সাহেবের কৌন্সিল হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বত্রই ইহার অবাধ গতি। কাপড়-চোপড়ের উপর বাজে ব্যয় করা ইঁহার মোটেই অভ্যাস নেই।—এরূপ পরিহাস কৌতুক রাজেন্দ্রলালের বৈঠকখানায় প্রায়ই চলিত।”

শাস্ত্রী মহাশয় একটু থামিয়া পরে বলিতে লাগিলেন, “একবার রাজেন্দ্রলাল আমার উপর ভয়ানক চটিয়া গিয়াছিলেন। সেই ঘটনার কথা বলিতেছি। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ঋগ্বেদের Translation বাহির করিবার উদ্যোগ করেন। আমি তাহার কিয়দংশ লিখিয়া দিব, রমেশবাবু বাঙ্গলা দেখিয়া দিবেন এবং ছাপাইবার সমস্ত খরচখরচা দিবেন এইরূপ বন্দোবস্তে কাজ আরম্ভ হয়। পুস্তক বাহির হইবার পূর্ব্বেই শশধর তর্কচূড়ামণি ‘বঙ্গবাসী’তে লিখিলেন—রমেশবাবু ইংরাজী হইতে বেদ ব্যাখ্যা করিতেছেন। যে ব্যাখ্যা একেবারেই অগ্রাহ্য। বেদের প্রত্যেক ঋকে গূঢ়ভাবে তিন প্রকার অর্থ আছে, নির্গুণ ব্রহ্মপক্ষে, সগুণ ব্রহ্মপক্ষে এবং সূর্য্যদেবপক্ষে।—এইরূপ মত প্রকাশ করায় আমিও বঙ্গবাসীতে লিখিতে সুরু করি। উভয়পক্ষে যুক্তি-তর্ক এবং শাস্ত্রালোচনার সঙ্গে সঙ্গে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কটূক্তিও বেশ চলিতেছিল। শেষ বঙ্গবাসী আমার লেখা আর লইলেন না। আমি ‘ভারতবাসী’তে গেলাম। পূজার ভারতবাসীতে ‘চূড়ামণিব্যাকরণ’ নামে আমার লম্বা এক প্রবন্ধ বাহির হইল। [ছাপার দোষে, চূড়ামণিব্যাকরণ চড়ামণিব্যাকরণ হইয়া গিয়াছিল] তাহাতে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আমার অদৃষ্টে তাহার জন্য বড়ই দুর্গতি হইয়াছিল।

পূজার পর আমি রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া উঠিলেন, এবং ডান হাত লম্বা করিয়া একটু উচ্চৈঃস্বরে আমাকে বাহিরে যাইতে বলিলেন।

আমি একটু থমকাইয়া গেলাম। ব্যাপারখানা কি জানিবার জন্য আমি ঘুরিয়া তাঁহার বামকর্ণের কাছে উপস্থিত হইলাম। দক্ষিণ অপেক্ষা বাম কর্ণে তিনি একটু বেশী শুনিতে পাইতেন। কাণের গোড়ায় মুখ লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—আজ একি? এ মূর্ত্তি কেন?

রাজেন্দ্রলাল বলিলেন—মূর্ত্তি হবে না? তুমি—তুমি লেখাপড়া শিখেছ, ভদ্রসমাজে বেড়াও, তুমি...... ...কিনা মেছোনীদের মতন মেছোবাজারের চৌমাথায় দাঁড়িয়ে লোকের সঙ্গে গালিগালাজ করছ! ভদ্রলোকের সমাজে তোমার বসা উচিত নয়।

আমি বলিলাম—চূড়ামণি যে বড় অন্যায় করছে। কতকগুলি ভুল প্রচার করছে।

তিনি আরও রাগিয়া বলিলেন—ভুল প্রচার করছে, তা'তে তোমার কি? তোমার একছত্র লেখায় উহার একশ পাতা পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে তা' জান? তুমি কি না তা'র সঙ্গে সমান উত্তর করতে যাচ্ছ! আমার বাড়ীতে তোমার জায়গা হবে না।

আমি সভয়ে বলিলাম—এই ত, আর ত কিছু না। আচ্ছা এমন কর্ম্ম আমি আর করব না।

তখন তিনি ঠাণ্ডা হইয়া আমাকে বসিতে বলিলেন। রাজেন্দ্র-লাল আমাকে এই ঘটনায় যে শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা আমি জীবনে ভুলিব না। সেই অবধি খবরের কাগজে আমাকে যতই গালি দিক না আমি তাহার কখনই জবাব দিই না। তত্ত্বনির্ণয় করিয়া যাইতেছি, উদ্দেশ্য আমার ঠিক আছে। ভুল ভ্রান্তি মানুষের হইয়াই থাকে। যিনি উহা ভদ্রভাবে দেখাইয়া দেন আমি তাঁহার গোলাম হইয়া যাই। গালাগালি দিলে জবাব দিই না। আমি যে নিজেই এই কার্য্য করি তাহা নহে, আমার ছাত্রবর্গকেও একথাটি আমি বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিই।

একবার গরমির ছুটিতে ওয়ার্ডের ছেলেগুলিকে বাড়ী পাঠাইয়া রাজেন্দ্রলাল কলিকাতার নিকটে কাশীপুরের গঙ্গার ধারে, মতি-

ঝিলের পশ্চিমে, মতিশীলেদের যে অনেকগুলি বড় বড় কুঠি ছিল তাহার একটিতে বাস করিতে লাগিলেন। আমায় বলিলেন—তোমার ত অনেক দূর হইবে, তুমি যাইবে কিরূপে? আমি বলিলাম—দূর হইবে না। কাশীপুরে আমার এক মামী থাকেন, আমি তাঁহার কাছে কাশীপুরেই থাকিব। এইবার রাজেন্দ্রলালের নিকট সমস্ত দিন থাকিবার সুযোগ হইল। প্রায় সমস্তদিনই তাঁহার কাছে থাকিতাম। তিনি সেসময় বোধগয়ার উপর তাঁহার বহি লিখিতে-ছিলেন। তাঁহার কাছে খুব চটাল চটাল প্রুফ্ আসিত। তিনি সেই-গুলি নিজে দেখিতেন এবং আমাকেও দেখিতে বলিতেন। আমি তাঁহার কথামত দেখিয়া দিতাম। বৌদ্ধদের গ্রন্থে গল্প আছে, এক স্ত্রীলোক শ্রাবস্তীতে আসিয়া বুদ্ধদেবের চরিত্রে কলঙ্ক অর্পণ করিয়াছিল। একদিন সেই লেখার প্রুফ্ রাজেন্দ্রলাল দেখিতে-ছিলেন। আমি তাঁহার নিকটে বসিয়াছিলাম। হাসিয়া বলিলেন—তা' হ'লে শাক্যসিংহেরও ও সব দোষ ছিল। কেননা, যা' রটে তা' বটে।

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম—শুধু যে কলঙ্ক ছিল তা' নয়, বোধ হয় একটু দোষও ছিল।

তিনি কৌতূহলের সহিত বলিলেন—সে কি রকম?

আমি বলিলাম—অবদানকল্পলতার প্রথম গল্পে একথা আছে। [আমি যাহাকে তখন প্রথম গল্প বলিয়াছিলাম, সেটা বাস্তবিক অবদানকল্পলতার ৫১ গল্প। এসিয়াটিক সোসাইটিতে যে পুঁথি আছে, তাহাতে ঐ ৫১ গল্পেই বহি আরম্ভ হইয়াছে। রায়বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস তিব্বত হইতে পুরা অবদানকল্পলতার পুঁথি আনিলে উক্ত গল্প যে বহির ৫১ গল্প তাহা প্রকাশ হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই দ্বিতীয় অংশেরই Notice করিয়াছেন] বুদ্ধদেবের একবার একটা মূত্রকৃচ্ছ্র হইয়াছিল। তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে বুঝাইয়াছিলেন, যে পূর্ব্বজন্মে তিনি একজন কবিরাজ ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল ভিক্ষুমুখ। শ্রীমান্ নামে এক ধনবানের পুত্রকে তিনি

অনেকবার কঠিন পীড়া হইতে আরাম করেন। কিন্তু সে লোকটা বড় দুষ্ট ছিল। পুত্রের পীড়া সারিয়া গেলে (ঠিক এখনকার লোকেরই মত) সে তাঁহাকে দর্শনী বা ঔষধের দাম বলিয়া কিছুই দেয় নাই। তাই ফের যখন তার পুত্রের অসুখ হইল, বুদ্ধদেব ঔষধেব পরিবর্ত্তে বিষ দিয়া তাহার প্রাণ-সংহার করিলেন। সেই পাপেই তাঁহার একটা খারাপ ব্যারাম হয়।

রাজেন্দ্রলাল বলিলেন—বুদ্ধদেবের রোগটা যত ঠিক, রোগের explanationটা তত ঠিক নয়।

আমি বলিলাম—শ্রাবস্তীতে সুন্দরী তাঁহার চরিত্রে যে কলঙ্ক অর্পণ করিয়াছিল, শিষ্যদিগের নিকট বুদ্ধদেব তাহারও কারণ দেখাইলেন—পূর্ব্বজন্মে কি কি অপরাধ করিয়াছিলেন যে কারণে সুন্দরী তাঁহার বিরুদ্ধে কলঙ্ক আনিয়াছে।

বুদ্ধদেব বলিলেন—পূর্ব্বজন্মে আমি একজন বৈশ্য ছিলাম, আমার নাম ছিল মৃণাল। আমি ভদ্রা নামে এক বারবিলাসিনীকে রাখি। সর্ত্ত ছিল, সে আর কাহাকেও তাহার কাছে আসিতে দিবে না। কিন্তু একদিন অন্য এক পুরুষকে তাহার নিকটে দেখিয়া রাগিয়া সেই রমণীকে হত্যা করি। তাই এজন্মে সুন্দরী আমার নামে কলঙ্ক রটাইতেছে।

এই সকল কথা শুনিয়া রাজেন্দ্রলাল খুব হাসিলেন। তখন তাঁহার কাছে কলিকাতার দুই তিন জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও বসিয়াছিলেন। তাঁহারাও বুদ্ধদেবের এই অদ্ভুত গল্প শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। দিনটা নানারকম গল্পগুজবে ও হাসিখুসিতে বেশ কাটিয়া গেল।”

শ্রীননীগোপাল মজুমদার।

তীর্থ-ভ্রমণ*

৮ই বৈশাখ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বদরীনারায়ণ যাত্রা করিলেন। হরিদ্বার হইতে বদরীনারায়ণের পথ পূর্ব্বেও যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে। তবে পাহাড় কাটিয়া রাস্তাগুলি একটু চওড়া করা হইয়াছে, আর লছমনঝোলা নামে নদীর উপর যেসকল দড়ীর পুল ছিল, তাহার বদলে লোহার ক্যান্টিলিভার ব্রিজ হইয়াছে, এই মাত্র প্রভেদ। যদুবাবু বলেন, তাঁহাদের সঙ্গে দুই ঝাঁপান ও তিন কাণ্ডি ছিল। কাণ্ডি একটা পিঠওয়ালা মোড়া। পাহাড়ী-দের পিঠে মোড়াটি বাঁধা থাকে, মোড়ার উপর একজন চড়নদার থাকে। পাহাড়ী যে পথে যায়, চড়নদারের মুখ তার ঠিক উল্টা-দিকে থাকে। পাহাড়ীর হাতে একটা 'টি' আকারের কাঠ থাকে। সে সেইটার উপর ভর করিয়া উঠিতে থাকে, আর যখন কোমরে বড় বেদনা হয়, তখন সেই 'টি'টি মোড়ার নীচে লাগাইয়া একবার কোমরটা সোজা করিয়া লয়। এখনও কাণ্ডি আছে, বড় কম। ঝাঁপানও আছে, বড় কম। ইহার বদলে হইয়াছে 'দাঁড়ী' বা ডাণ্ডী'। হিন্দুস্থানী ডাণ্ডী একটা বাঁশে সতরঞ্চ বাঁধা। দুই হাতে বাঁশের উপর ভর করিয়া চড়নদার সেই সতরঞ্চেতে ঝুলিতে

---

* সাহিত্যপরিষদ গ্রন্থাবলী নং ৫৩। তীর্থ-ভ্রমণ ৺যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী রচিত টীকা ও টিপ্পনী ও সবিস্তার মুখবন্ধ সহ প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি সম্পাদিত। কলিকাতা ২৪৩।১ নং অপার সারকুলার রোড বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ মন্দির হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ১৩২২। মূল্য সাধারণপক্ষে ১৷৷০

শাখাসভার সদস্যপক্ষে ১।০

পরিষদের সদস্যপক্ষে ১৲

থাকে। ডাণ্ডীওয়ালারা চলে, পূব্‌মুখ হইয়া,—চড়নদার ঝুলিতে থাকেন উত্তর বা দক্ষিণমুখ হইয়া, একেবারে ৯০ ডিগ্রী তফাতে তাঁর চোখ্‌ থাকে। এখনকার ডাণ্ডী তার চেয়ে অনেক ভাল হইয়াছে। কিন্তু সেকালের ডাণ্ডী হইতে এখনকার ডাণ্ডী পর্য্যন্ত যতরকম ডাণ্ডী হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। শতরঞ্চি ঝুলান বাঁশ প্রথম ডাণ্ডী। তারপর দুইয়ের নম্বর ডাণ্ডী—দু'খানা পাতলা সরু তক্তা নৌকার মত করিয়া আঁটা, ঠিক মাঝখানে একটু শতরঞ্চি ঝুলান। আর যেখানটায় পা রাখিবে, সেখানটাও একটু শতরঞ্চি ঝুলান। আগের শতরঞ্চিতে পা রাখ, পিছনের শতরঞ্চিতে বস, আর পিট রাখ নৌকার হালের দিকে। দু'জনে তোমায় তুলিয়া লইয়া যাইবে। তোমার কিন্তু নড়বার চড়বার জো নাই। যদি শতরঞ্চির ফাঁকে কোন অঙ্গ পড়িয়া গেল, তুমি একেবারে "পপাত"। তিনের নম্বর ডাণ্ডী দুইয়ের নম্বরেরই মত, কেবল সমস্তটা শতরঞ্চি দিয়ে ছাওয়া, সুতরাং ইহাতে শোয়াও যায়, নড়াচড়াও যায়। চারের নম্বরের ডাণ্ডী শতরঞ্চিমোড়া না হইয়া কার্পেটমোড়া। হাতখানেক বা হাত দেড়েকের উপর একখানা ডাণ্ডী উপুড় করা। আর মাঝখানে যে ফাঁক থাকে সেটা ঝালর দেওয়া। পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোকের যাওয়া-আসার বেশ সুবিধা। বৃষ্টির সময়ও বেশ সুবিধা, গায়ে জল লাগে না, উপরে একটা আচ্ছাদন থাকে। এখনকার ডাণ্ডী, একখানা চেয়ার ঠিক ডাণ্ডীর মাঝখানে বসান, শতরঞ্চিও নাই কার্পেটও নাই। যেখানটায় পা ঝুলিবে সেখানে একখানা তক্তা দেওয়া। রোদের সময় ছাতাটি না খুলিয়া বসিবার জো নাই।

সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ত হাঁটিয়াই গিয়াছিলেন। ডাণ্ডী কাণ্ডা ঝাঁপান কিছুই লয়েন নাই। যে পাহাড় দেখিয়াছে, আর পাহাড়ে উঠিয়াছে, সেই যদুবাবুর বর্ণনার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে। রাস্তা—পাক ডাণ্ডী, অর্থাৎ পায়ে চলা রাস্তা, কড়া চড়াইয়ে উঠিবার সময় এক-

বার খানিকটা ডানদিকে যাইতে হয়, বিশ হাত গিয়া বড়জোর চার পাঁচ হাত উঠিলে, আবার বাঁ দিকে ফির, বিশ হাত গিয়া বড়জোর চার পাঁচ হাত উঠিলে। অর্থাৎ চল্লিশ হাত ঘুরিয়া তুমি আট দশ হাত মাত্র উঠিবে। এইরূপ তিন চার শত হাত উঠিতে তোমায় ত্রিশ চল্লিশ বার ফিরিতে হইবে ও ৮: ৪০০ :: ৪০ : ক ১৫০০ হাত ঘুরিতে হইবে। সবটাই চড়াই, সুতরাং উঠিবার সময় গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হইবে ও বুকে লাগিবে। ইহার মধ্যে যদি কোথাও পদস্খলন হয়, কোথায় যে গিয়া পড়িবে, তার ঠিক নাই। জীবনের তো আশাই নাই, হাড় পর্য্যন্ত চূর্ণ হইয়া যাইবে। যদুবাবু অনেক জায়গায় লিখিয়াছেন, "ক্রমেই চড়াই ইহাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত।" "ভীমগড়া হইতে চারি ক্রোশ পাহাড়ে উঠিতে হয়। তাহার এক ক্রোশ পর কোথাও পর্ব্বতের পাথর, কোথাও বরফগলা জল, কোথাও ঘাস পাতা, এইমতে এক ক্রোশ। তাহার পর তিন ক্রোশ ক্রমেই বরফের উপর দিয়া পথ। পর্ব্বতের উচ্চের কথা কি লিখিব। গঙ্গসাগর হইতে কেদারনাথ পাহাড় ৪৫০ শত ক্রোশ উচ্চ। ওই পর্ব্বতের শিরোভাগে উঠিয়া গমন করিতে হয়। বরফের পর্ব্বত—কত যুগের বরফ জমিয়া আছে, তাহা নিরাকরণ করিতে পারা যায় না। এই তিন ক্রোশ পর্য্যন্ত তৃণাদি জন্মে না, কেবল ধবলাকার। চলিতে পায়ের সাড় থাকে না। যেমন ঝিঞ্ঝিনা হইয়া পা অসাড় হয়, সেইমত বরফে পদক্ষেপে পদের অচৈতন্য হয়। পথের ভীষণত্ব কি কহিব। বরফে আচ্ছাদিত পর্ব্বত, তাহার বরফসকল কাটিয়া পথ হইয়াছে, এক এক পদক্ষেপ হইতে পারে, এই পরিসর পথ। যে যে স্থানে পদের কোন চিহ্ন আছে, তাহার উপর পদক্ষেপ করিতে হয়। যদি সম্মুখে কেহ আসিতেছে দেখিয়া কিঞ্চিৎ আশে পাশে পদক্ষেপ কর, তবে মহাবিপদ হয়। পশ্চিম দিকে পদক্ষেপ হইলে কোমর পর্য্যন্ত, কোথায় অস্থায়ী, হইয়া ডুবে। পূর্ব্বদিকে পদক্ষেপ হইয়া কোথায় যায় তাহার নিরাকরণ হয় না।

তাহার কারণ পাহাড়ের গড়েন * * ঐ দিকে পতিত হইলে একেবারে বরফে মগ্ন হইয়া গঙ্গায় পড়িতে হয়। এক-ব্যক্তির পা বেহিসাব পড়িয়াছিল, সে ব্যক্তি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া অনেক নিম্নে বরফের উপরে পতিত আছে। প্রায় এক-মাস হইল প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, বরফের গুণে পচে গলে নাই, তাজা আছে।”

পাহাড়ের—বরফের এইরূপ সুন্দর বর্ণনা বাঙ্গালায় আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। যদুবাবুর বর্ণনারও বেশ বাহাদুরি আছে। তিনি এক জায়গায় আকাশের বর্ণনা করিতেছেন। “বৈশাখ মাহার আড়াই প্রহর বেলা, কিন্তু শীতে কম্পমান, কাহারও পদক্ষেপ করিবার ক্ষমতা হয় না, পর্ব্বতে এমন বেষ্টিত, যে, সূর্য্যের উদয়াস্ত কিছুই জানা যায় নাই—একখানি থালার ন্যায় আকাশ, যাহাকে কহে শূন্য ভাগ, দেখা যাইতেছে। সূর্য্যদেব বরফে আচ্ছাদিত আছেন।” ঠাকুর দেবতার মন্দির পূজা অর্চ্চার নিয়ম, দর্শন, স্পর্শন, ইত্যাদি বিষয়ে যদুবাবু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ খবর দিয়াছেন। উত্তরাখণ্ডের অনেক বড় বড় মন্দির ছয় মাস বরফে আচ্ছন্ন থাকে। অক্ষয়তৃতীয়ার পর বরফ কাটাইয়া মন্দির বাহির করিতে হয়। যদুবাবু বলেন এক-বার কেদারের মন্দির ১২১ ফুট বরফে ঢাকা ছিল। মন্দিরের চূড়ার ত্রিশূলটি মাত্র দেখা যাইতেছিল। সেখানকার বাড়ী ঘর একেবারে বন্ধ, ঘরের একটি মাত্র দোর আছে, কোথাও জানালা গবাক্ষ এউজি কিছুই নাই। ঘর ঘোর অন্ধকার, প্রদীপ না জ্বালিলে দিনেই ঢোকা যায় না। খাবার জিনিসও খুব কম পাওয়া যায়, আটা, ডাল, চিঁড়ে, গুড় আর ঘি এইমাত্র।

সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বদরিকাশ্রম হইতে আবার বৃন্দাবন ফিরিয়া আসেন, কিন্তু যে পথে গিয়াছিলেন সে পথে আর ফিরেন নাই। কেহই সে পথে ফিরে না। গিয়াছিলেন হরিদ্বারের পথে, আসি-লেন আলমোরার পথে।

বৃন্দাবনে আসিয়া তথায় কিছুদিন অবস্থান করেন এবং বৃন্দাবনের দ্বাদশ বন ভ্রমণ করিয়া বেড়ান।—যথা, মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বেহুলাবন, লাঠাবন, কাম্যবন, কোকিলবন, ভাণ্ডীর বন, বেলবন, মহাবন, ভদ্রবন ইত্যাদি। সন ১২৬২ সালের ১৯শে মাঘ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় জলন্ধর যাত্রা করেন। চৌমুরা, কুশী হড়েল, পরওল বল্লভগড় ফরিদাবাদ হইয়া দিল্লীতে পঁহুছিলেন। দিল্লী, পড়াউ, উজানী, জইগ্রাম, রসনেগ্রাম, শ্যামহাসাকী পড়াবু হইয়া পানিপথ সহর। পানি পথ হইতে কর্ণাল ও থানেশ্বর হইয়া কুরুক্ষেত্র। তথায় নানা দেবদেবী দর্শন স্পর্শন পূজা অর্চ্চনা স্নান দান ইত্যাদি করিয়া দশদিন তথায় বাস করিয়া যদুবাবু পুনরায় উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। প্রথম পিপ্‌লী, তারপর তেওড়া, সাহাবাদ, আম্বালা, রামপুরা, সর্‌হিন্দ, লস্কর ও পরে লুধিয়ানা। লুধিয়ানা হইতে চারিক্রোশ দূরে শট্‌লেজ নদী, পার হইয়া ফাগুওয়াড়া। যদুবাবু সেখানে এক সাধু দেখিয়াছিলেন, তিনি বার বৎসর দাঁড়াইয়া আছেন। ফাগুয়াড়ার পর তোরেলা, হুসিয়ারপুর, বোটা, আমবাগ, রাজপুরী, চম্পা, পরে জ্বালামুখীর মন্দির।

"মন্দির মধ্যে মহাদেবীর জ্যোতি জ্বলিত আছে। মন্দিরের মধ্যস্থলে এক কুণ্ড আছে, ওই কুণ্ডের উত্তরদিকে চারি জ্যোতি আছে, মধ্যস্থলে দুই জ্যোতি, তাহার মধ্যে এক জ্যোতি প্রবল, আর জ্যোতি কখন প্রকট কখনও অপ্রকট থাকে। যে প্রবল জ্যোতি আছে, তাহার নাম হিঙ্গলাজ। এই জ্যোতির মধ্যে পেঁড়া দুগ্ধ যাহা ধরিবে তাহাই ভক্ষিত হয়।...সকল জ্যোতিতে পেঁড়া ঘৃত বিল্বদল দিলে ভস্ম হয়। পেঁড়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দিলে জ্যোতি শিখার কিছু মৃদু হয়, কিঞ্চিৎ পরে পূর্ব্বমত উজ্জ্বলিত হয়। দুগ্ধ ভক্ষণ যে দুই প্রবল জ্যোতি আছে, তাহাতে হয়। একটি পাত্রে করিয়া দুগ্ধ এই জ্যোতির সম্মুখে সংলগ্ন করিয়া ধরিলে, ক্ষণকাল মধ্যে ওই পাত্র মধ্যে জ্যোতি প্রবিষ্ট হইয়া ভক্ষিত হয়। দুগ্ধ কম হয়। পেঁড়ার

বাতাসা আর একটু মিষ্টান্ন কিম্বা মেওয়া যে কিছু নৈবেদ্য দ্রব্য লইয়া জাগ্রত জ্যোতি মহাদেবীর সম্মুখে ধারণ করিলে ওই সকল দ্রব্যের উপর জ্যোতি আসিয়া অগ্নি-দগ্ধের ন্যায় প্রসাদী দ্রব্য থাকে।”

জ্বালামুখীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করিয়া যদুবাবু ২৬শে ফাল্গুন নাদওন, ফতেপুর, সিমুলিয়া, লম্বুডুর, গোপালপুর হইয়া রেওয়াশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রেওয়াশ্বরে এক প্রকাণ্ড কুণ্ড আছে, কুণ্ডের জল অতলস্পর্শ—দুই ক্রোশের পরিক্রম—ঐ জলমধ্যে সাত বেড়া (ভাসা-বাগান) আছে। ইহার মধ্যে ছয় বেড়া বারমাস ভাসিয়া বেড়ায়। মহাদেবী দুর্গার বেড়া শ্রাবণ ভাদ্র দুই মাস ভাসে। ব্রহ্মার বেড়ার উপরে নলের ও ঘাসের বন, এক অশ্বত্থ ও এক বট দুই বৃক্ষ আছে। বৃক্ষের বেড় দেড়হাত দু'হাত হইবে, খাড়া তিন হাত, তাহার উপর শাখা-পল্লবে শোভিত। রেওয়াশ্বর হইতে মুণ্ডী, মুণ্ডী রাজার রাজধানী। সেখান হইতে পুরাণ সহর পারমণ্ডী। অতি ভয়ানক হড়হড়ানে পথ, পায়ের ঠিক রাখা দুষ্কর। তথা হইতে জজরু কুফরু, তথা হইতে কুমাদের হট্টা, ডোলচীর হট্টা, তথা হইয়া বেজওয়াড় কুলুর রাজার রাজধানী। এখানে যে নদী আছে, মশকে চড়িয়া পার হইতে হয়। পারে বিয়োড় গ্রাম, তথা হইতে বামনকোটী, জরিগ্রাম; তথা হইতে মণিকর্ণ। সেখানে গরম জলে, কুণ্ড আছে, সর্ব্বদা ধোঁয়া উঠিতেছে। “কুণ্ডের মধ্যে অন্ন খেচরান্ন রুটী মালপো পায়স ডাল তরকারী ইত্যাদি যাহা দিবে, সুপক্ক হইয়া সুখাদ্য হয়। অগ্নি-সংস্কার পাকে বহুবিধ রন্ধনের সুগন্ধি দ্রব্য দিয়া সুযত্নে পাক করিলেও এতাদৃশ সুখাদ্য হয় না।” মণিকরণ হইতে বামনকোটী, তথা হইতে বিজলীশ্বর মহাদেব ও কুলু সহর। এই সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের পাহাড়-ভ্রমণের শেষ। তিনি এইখান হইতে ফিরিলেন। কিন্তু যে পথে গিয়াছিলেন সেই পথেই প্রায়। কুলু হইতে বেজবর, বেজবর হইতে ডোলচী, ডোলচী হইতে কুমাদ, কুমাদ হইতে জজরু কুফরু। ফুটাখল—ফুটাখল পাহা-

ড়ের উপর। কুটাখল হইতে গোমা, গোমা হইতে ভাঙ্গাহাল, আঙ্গাহাল হইতে বৈদ্যনাথ। সেখানে অনেক দেবদেবী আছেন। বৈদ্যনাথ হইতে বেবামনা, তথা হইতে পরবল, পরবল হইতে ভাগশু, ভাগশু হইতে নগরোগ্রাম, তথা হইতে কাঙ্গরা দেবীর মন্দির, জালন্ধর পীঠ। এখানে পাঁচ মহাদেবী আছেন, ৩৬০ তীর্থ আছে। কাঙ্গড়া হইতে গণেশঘাটী পাহাড়, তথা হইতে রাণী তলাও, তথা হইতে জোয়ালাজীর মন্দির। জোয়ালাজী ছাড়িয়া চিন্তাপুরলী, চিন্তাপুরলী হইতে চোটা, চোটা হইতে হুসিয়ারপুর। তথা হইতে বাজেশ্বরী দেবীর মন্দির, জেজো পর্ব্বত, তথা হইতে সন্তোখগড়, তথা হইতে শতলেজ নদী, পার হইয়া বরমপুর, তথা হইতে নন্দপুর, থুপ্ গাঁ কোটগ্রাম। কোট-গ্রামে বড় জলকষ্ট, এক কলসী জলের দাম দু'পয়সা। তথা হইতে নয়নাদেবীর মন্দির,—পাহাড়ের চূড়ায়। অন্যান্য দেবদেবীও যথেষ্ট আছে। এই মন্দির হইতে ফের কোটগ্রাম সন্তোখগড় হইয়া হুসি-য়ার পুর। ক্রমে দিল্লী, তথা হইতে বৃন্দাবন আগ্রা। আগ্রা হইতে নৌকাপথে যমুনা বাহিয়া প্রয়াগ, ক্রমে কাশী, গাজীপুর, বক্সার, পাটনা, মোকামা, মুঙ্গের, ভাগলপুর, রাজমহল, মুর্শিদাবাদ, বহরম, কাটোয়া, নব-দ্বীপ, কাল্না, শান্তিপুর, চাক্‌দা, ত্রিবেণী, হুগলী হইয়া কলিকাতা প্রত্যা-গমন করিলেন। এবার জলপথে আসার কারণ স্থলপথে মিউটিনি। যদুবাবু মিউটিনির অনেক কথা বলিয়াছেন। যদুবাবু স্বাধীনভাবেই বলিয়াছেন। সম্পাদক তাহার মধ্যে কিছু কিছু তুলিয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালীর মুখে মিউটিনির কথা একটা নূতন জিনিস।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যদুবাবুর লেখার আমরা একটি পুরাণ জিনি-সের খবর পাই। লোকে রেলওয়ে হইবার পূর্ব্বে কিরূপে স্থল-পথে বা জলপথে দূরদূরান্তরে গমন করিত। যদুবাবু বরাবর হাঁটিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁর নিকট আমরা অনেক বেশী খবর পাই। পাহাড়ের মধ্যে একবার তিনি বদরিক-কেদার ও আর একবার কুলুর পাহাড়, পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। তিনি পাকা হিন্দু, তীর্থদর্শন দেবদর্শন

পূজা অর্চা, তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি সেইগুলিই বেশী করিয়া দেখিয়াছিলেন। তাঁহার পুস্তক সুপাঠ্য ও সুন্দর।

নগেনবাবু এই পুস্তক সম্পাদন করিয়াছেন। গোড়ায় ৯৫ পৃষ্ঠা ভূমিকা লিখিয়াছেন ও শেষে চৌত্রিশ পাত টিপ্পনীর পরিশিষ্ট ও একটি বর্ণানুক্রমিক নাম সূচী দিয়াছেন। যদুবাবু সম্বন্ধে তিনি অনেক খবর দিয়াছেন, তাঁহাদের বংশ-পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার নিজেরও অনেক পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার লিখিত কয়েকটি গানও তুলিয়া দিয়াছেন। নগেন্দ্রবাবুর হাতে পড়িয়া যদুবাবুর রোজনামচা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এই পুস্তক প্রচার করিয়া বাঙ্গালার বিশেষ উপকার করিয়াছেন। তাঁহারা খরচা লইয়াই অতি অল্প দামেই এ পুস্তক বিক্রয় করিতেছেন।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

বিশ্ব-সেবায় বিদ্যুৎ

২।

গত মাসের প্রবন্ধে বিদ্যুতের দৌত্যকার্য্যের কথা কিছু বলা হইয়াছে। এবারে তাহার দূতিগিরির কথা কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। ব্যাকরণবিশারদগণ বলেন যে, বিশেষরূপে দ্যুতিদান করে বলিয়া ইহার নাম বিদ্যুৎ হইয়াছে। তাঁহাদের এই ভ্রম সংশোধন করিয়া আমরা বলিব, বিশেষভাবে দূতিপনা করে বলিয়াই ইহার নাম হইয়াছে বিদ্যুৎ। নানাবিধ রাসায়নিক পদার্থের মিলন ও বিচ্ছেদ ঘটাইতে চঞ্চলার খুব কেরামতি দেখিতে পাওয়া যায়। তবে মিলন অপেক্ষা বিচ্ছেদ বাধাইতে ইনি অধিক সিদ্ধহস্ত; এবং

এই কাজের জন্য বৈজ্ঞানিকেরা ইঁহার বিশেষ খাতির করিয়া থাকেন।

অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের রাসায়নিক যোগে জল জন্মে। এই জলের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চালিত করিলে তাহা বিশ্লিষ্ট হইয়া পুনরায় অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনে পরিণত হয়। বিবিধ খনিজ পদার্থের মধ্যে নানাপ্রকার ধাতু আছে। কাশ্মারী জাঙ্গাল ও তুঁতের মধ্যে তামা আছে; হীরাকষের মধ্যে লোহা আছে; এবং ফট্‌কিরীর মধ্যে এলুমিনাম ও পটাসিয়াম নামে দুই প্রকার ধাতু আছে। বিদ্যুতের দ্বারা এইরূপ একটি খনিজ পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক বিচ্ছেদ বাধাইয়া তাহা হইতে কোন কোন মূল-পদার্থকে পৃথক করিয়া লইতে পারা যায়।

এই দূতিপনার জন্য সৌদামিনীর নিকট আজ সমস্ত সভ্যজগৎ বিশেষভাবে ঋণী। পূর্ব্বপুরুষদিগের আমল হইতে আমরা এতদিন পিতল কাঁসার বাসনই ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি। আজ বিদ্যুতের কৃপায় বিশ্ববাসী হাল্‌কা এলুমিনামের তৈজসপত্র উপঢৌকন পাইয়াছে। পূর্ব্বে এক সের এলুমিনাম উৎপাদন করিতে পঁচিশ টাকা ব্যয় হইত। এখন বিদ্যুতের সাহায্যে এই কাজ পাঁচ সিকা ব্যয়ে হইয়া থাকে। ইদানীং বৈদ্যুতিক উপায়ে জগতে প্রতি বৎসর প্রায় পাঁচ লক্ষ মণ এলুমিনাম উৎপন্ন হইতেছে। তাই সভ্যজগতে এই ধাতুর ব্যবহার দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। এলুমিনাম সুলভ না হইলে তদ্দারা এত এরোপ্লেন ও জেপেলিন নির্ম্মিত হইতে পারিত না; এবং তাহাতে আরোহণ করিয়া মেঘের আড়ালে থাকিয়া বিংশ শতাব্দীর শত শত ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ করাও সম্ভব হইত না।

পূর্ব্বে টিনের ছাঁট ও টুক্‌রাগুলিকে আবর্জ্জনা জ্ঞানে ফেলিয়া দেওয়া হইত। এখন ইউরোপের অনেক স্থানে বিদ্যুতের দ্বারা তাহা হইতে বিস্তর রাঙ্‌ সংগ্রহ করা হয়। টাঁকশালের আবর্জ্জনা হইতে বৈদ্যুতিক উপায়ে এখন প্রচুর স্বর্ণ রৌপ্যের পুনরুদ্ধার হইয়া

থাকে। এতদিন সোরা হইতে নাইট্রিক এসিড্ প্রস্তুত হইত। সম্প্রতি সুইডেনের একটি কারখানায় আকাশের বায়ু হইতে বিদ্যুতের দ্বারা নিত্য পঁয়তাল্লিশ মণ করিয়া নাইট্রিক এসিড্ তৈয়ার হইতেছে। একদিন চঞ্চলা হয় ত আমাদের জন্য আসমান হইতে স্বর্ণ রৌপ্যও আনিয়া হাজির করিবেন। আসমানে এই সকল মহার্ঘ ধাতুর পরমাণু যে অদৃশ্যভাবে উড়িয়া বেড়াইতেছে তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। কলিকাতায় প্রাচীন লোকদের নিকট শুনিয়াছিলাম যে হোসেন খাঁ নামে প্রসিদ্ধ যাদুকর আসমান হইতে অকস্মাৎ সোণা রূপা, এমন কি মতী জহরৎ পর্য্যন্ত আনিয়া বড়লোক দর্শকবৃন্দের তাক্ লাগাইয়া দিত। আমরাও দেখিয়াছি, কোন কোন ম্যাজিসিয়ান তাহার যাদুদণ্ডের দ্বারা শূন্য হইতে ক্রমাগত টাকা সংগ্রহ করিয়া টেবিলের উপর স্তূপাকার করে। চঞ্চলা যখন বিংশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুকরী, তখন মনে হয় ইনিও এককালে আকাশ হইতে স্বর্ণ রৌপ্যের বৃষ্টি করাইতে সক্ষম হইবেন। অলঙ্কারপ্রয়াসী বঙ্গললনাদিগকে আপাততঃ চঞ্চলার মুখের দিকে চাহিয়া আকাশবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে। তবে তাঁহাদের আশা জাগাইয়া রাখিবার জন্য এই যাদুকরী সম্প্রতি অসংখ্য প্রকারের গিল্টির গহনা সরবরাহ করিতেছেন। Electro-plating বা গিল্টির যত কিছু কাজ আছে তাহা বিদ্যুৎ এখন একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে। আসল যতদিন না পাই, ততদিন নকলেই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

বিদ্যুতের অদ্ভুত পদার্থ-বিশ্লেষণ শক্তির ফলে আমরা আর একটি আবশ্যকীয় বস্তু লাভ করিয়াছি। সেকালে রোসনাই করিতে হইলে সকলকেই তেল ও বাতির উপর নির্ভর করিতে হইত। এখন সুদূর পল্লীগ্রামেও বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে অনেকে কার্বাইডের শ্রাদ্ধ করিয়া এসিটেলিন্ লাইটের ছড়াছড়ি করিয়া থাকেন। অনেকেই জানেন না যে, এসিটেলিন্ গ্যাসের এই মসলা একমাত্র বৈদ্যুতিক

উপায়েই প্রস্তুত হইয়া থাকে। কার্বাইডের জন্ম দিয়া বিদ্যুৎ প্রকারান্তরে "দুনিয়ার রোসনিদার" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইলেকট্রিক্ লাইট্ কেবল বড় বড় সহরেই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু এসিটেলিন লাইট্ না আছে, জগতে এমন স্থান বিরল।

বিদ্যুতের সহিত চুম্বকের অতি নিকট সম্বন্ধ। একটি লৌহদণ্ডের উপরে রেশমাবৃত ইন্‌সুলেট্‌করা তামার তার জড়াইয়া, সেই তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চালাইয়া দিলে, লৌহদণ্ডটি তৎকালে চুম্বকের গুণ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহা নিকটবর্ত্তী অপর লৌহখণ্ডকে আকর্ষণ করে। তারের মধ্যে বিদ্যুতের গতি বন্ধ করিয়া দিলে লৌহদণ্ডের চুম্বকত্বও লোপ পায়। ঐ তারের মধ্যে যতক্ষণ ও যতবার বিদ্যুতের গতি, ততক্ষণ ও ততবার ঐ লৌহদণ্ডের চুম্বকত্ব। এইরূপ অস্থায়ী চুম্বককে Electro-magnet বা বৈদ্যুতিক চুম্বক বলে। চিরস্থায়ী প্রাকৃতিক চুম্বককে আমরা এইরূপ কল্পনা করিয়া লইতে পারি যেন তাহা একখণ্ড লৌহমাত্র, যাহার গাত্রে বৈদ্যুতিক শক্তি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রদক্ষিণ করিতেছে। Magnet বা চুম্বকের একটি আশ্চর্য্য শক্তি আছে। একটি লম্বা ইন্‌সুলেট্‌করা তারকে গোলাকার গুচ্ছে পাকাইয়া চুম্বকের সন্নিকটে আনিলে, ঐ তারের মধ্যে বিদ্যুতের ক্ষণিক আবির্ভাব হয়। আবার ঐ তার গুচ্ছকে চুম্বকের নিকট হইতে যে মুহূর্ত্তে সরাইয়া লওয়া হয়, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তাহার মধ্যে আর একবার (উল্টাগতিবিশিষ্ট) বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। ক্ষণপ্রভার ঈদৃশ ক্ষণিক আবির্ভাব ও তিরোভাবের কৌশল অবলম্বন করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বিস্তর বিদ্যা-বুদ্ধি ব্যয় করিয়া তড়িতোৎপাদক বড় বড় ডাইনামো-যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই যন্ত্রের দ্বারা অফুরন্ত ভাবে বিদ্যুৎ জন্মাইতে পারা যায়। ডাইনামো চালাইতে কিছু শক্তির আবশ্যক হয়। আমেরিকায় মার্কিণজাতি নায়াগ্রা জলপ্রপাতের প্রাকৃতিক শক্তিদ্বারা উপযুক্ত আকারের ডাইনামো চালাইয়া দশ লক্ষ horse-power বা অশ্ব-শক্তির বিদ্যুৎ সৃষ্টি

করিয়া, তদ্দ্বারা তাঁহাদের কয়েকটি সহরের রাস্তাঘাট আলোকিত করিতেছেন, এবং ট্রামগাড়ী ও কলকারখানাগুলি চালাইতেছেন। ইহাকেই বলে, ষোল আনা ঠকাইয়া সাড়ে ষোল আনার কাজ করাইয়া লওয়া। মানুষের বিদ্যা-বুদ্ধির অসাধ্য কর্ম্ম নাই।

ফলতঃ মার্কিণদেশেই এখন বিদ্যুতের যাহাকিছু আছে, তাহার চূড়ান্ত করিয়া ছাড়া হইতেছে। Steam বা বাষ্পকে লইয়া ইংরেজজাতি জগতে অনেক কেরামতি দেখাইয়াছেন। সেকারণে আমেরিকার প্রসিদ্ধ মনীষী এমার্সন সাহেব ষ্টীমের জাতি নির্দ্দেশ করিতে গিয়া তাহাকে 'আধা-ইংরেজ' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। সেই হিসাবে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে আজ আমরা বলিতে পারি, ইনি জাত্যাংশে 'চৌদ্দ-আনা মার্কিণ'।

বিদ্যুতের জন্মপত্রিকা বা কোষ্ঠী লিখিতে হইলে প্রথমে লিখিতে হইবে, ফরাসী বিপ্লবের সময় ইটালীতে গ্যাল্‌ভানি ও ভল্টা ইহার প্রথম আবিষ্কার করেন। পরে ১৮১৯ সালে আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের প্রারম্ভে বিলাতে বিদ্যুৎ ও চুম্বকের সম্বন্ধ প্রথম আবিষ্কৃত হয়। এই সনেই বাষ্পীয় অর্ণবপোতের প্রথম সৃষ্টি হয়। ১৮৩৭ সালে মর্স্ নামে একজন মার্কিণ সাহেব টেলিগ্রাফের প্রথম সৃষ্টি করেন। তৎপরে ১৮৬০ সালে জার্ম্মাণীতে টেলিফোনের উদ্ভাবনা হয়। টেলিফোন যে কেবল কথা কহিবার জন্যই আবশ্যক হয়, তাহা নহে। ইহার সাহায্যে ভূগর্ভে লুক্কায়িত লৌহখনি এবং সমুদ্রগর্ভে লুক্কায়িত টর্পিডোর সন্ধান পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। ইলেক্ট্রো-ম্যাগ্‌নেটে চুম্বকত্বের আবির্ভাব ও তিরোভাবের সময় একপ্রকার শব্দ হয়। এই তথ্য অবলম্বন করিয়াই টেলিফোনের সৃষ্টি। টেলিফোনের মধ্যে ইলেক্ট্রো-ম্যাগ্‌নেট্ হচ্চে অত্যাবশ্যকীয় অংশ। লৌহখনি বা লৌহময় টর্পিডোর সান্নিধ্যে টেলিফোনের অন্তর্গত ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটে শব্দবিশেষের অনুভূতি হয়। তাহা হইতেই জানা যায়, নিকটে লৌহখনি বা টর্পিডো আছে।

১৮৭৯ সালে বার্লিন্ এক্‌জিবিশনে ছোট ইলেক্‌ট্রিক্ রেলগাড়ীর নমুনা প্রথম প্রদর্শিত হয়। ১৮৮১ ও ১৮৮২ সালে পারিস ও লণ্ডন নগরে ইলেক্‌ট্রিক্ ল্যাম্পের প্রথম নমুনা দেখান হয়। কথিত আছে, এই ল্যাম্প দেখিয়া গ্যাস কোম্পানির অংশীদারদের হৃদ্‌কম্প হইয়াছিল। তার পর ১৮৮৭ সালে আমেরিকার রিচ্‌মণ্ড নগরে সর্ব্বপ্রথম ইলেক্‌ট্রিক্ ট্রামওয়ে খোলা হয়। ১৮৯৩ সালে আমেরিকার সিকাগো এক্‌জিবিশনে যাইবার জন্য দশ লক্ষ লোক পঞ্চাশখানি ইলেক্‌ট্রিক্ বোটে করিয়া সেখানকার হ্রদ পার হইয়াছিল। বঙ্গমাতার বরপুত্র বিবেকানন্দ স্বামীও এই সিকাগো এক্‌জিবিশনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার জগৎ-প্রসিদ্ধ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। স্বামিজীও সম্ভবতঃ ইহার একখানি নৌকায় পাড়ি জমাইয়াছিলেন।

১৮৯৫ সালে জার্ম্মাণীতে X'ray বা রঞ্জেন-রশ্মির আবিষ্কার হয়। এই অদ্ভুত আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানক্ষেত্রে যুগান্তর সূচিত হইয়াছে। এই রঞ্জেন-রশ্মি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়বিশিষ্ট মানুষকে একটি ষষ্ঠেন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছে। এতাবৎ যেসকল তত্ত্ব ইন্দ্রিয়াতীত ছিল, তাহার কতকগুলি এখন এই রশ্মির প্রভাবে মানবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতেছে। ১৮৯৬ সালে মার্কণী নামক একজন ইটালীয়ান্ পণ্ডিত তারবিহীন টেলিগ্রাফের উদ্ভাবনা করেন। ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগনেটের প্রভাব তরঙ্গাকারে শূন্যপথে বহুদূর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে পারে—এই তথ্য লইয়াই তারবিহীন টেলিগ্রাফের সৃষ্টি। ভারতগৌরব আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁহার নিজের উদ্ভাবিত পরীক্ষাদ্বারা দেখাইয়াছিলেন যে, এবম্বিধ বৈদ্যুতিক শক্তিকে তারবিহীন শূন্যপথে পরিচালিত করিয়া তাহাদ্বারা স্থানান্তরে কার্য্য করাইয়া লওয়া যাইতে পারে।

চিকিৎসার ব্যাপারে বহুদিন হইতে সকল দেশেই বিদ্যুতের নামে অনেক রকম জুয়াচুরি চলিয়া আসিতেছে। বৈদ্যুতিক মাদুলী, বৈদ্যুতিক কবজ, বৈদ্যুতিক অঙ্গুরী ও বৈদ্যুতিক বেল্ট্ বা কোমরবন্ধের বিজ্ঞাপনে সংবাদপত্রের কলেবর প্রায়ই অলঙ্কৃত দেখিতে

পাওয়া যায়। বিলাতে এক ধড়িবাজ লোক কেশের শ্রীবৃদ্ধির জন্য এক 'বৈদ্যুতিক ব্রাশ্' আবিষ্কার করিয়া বাজারে বিস্তর বিক্রয় করিয়াছিল। তাহার মতে, ইহাদ্বারা চুল আঁচড়াইলে সত্বর তাহা ঘন হইয়া গজাইয়া উঠে। ব্রাশের কাঠের মধ্যে একখানি চুম্বক লুকানো থাকিত। গ্যাল্ভানোমিটার বা দিক্‌দর্শন-কম্পাসের নিকট এই ব্রাশ লইয়া গেলে তাহার কাঁটা তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া যাইত। অজ্ঞলোকের নিকট ইহা নিশ্চয়ই বৈদ্যুতিক শক্তির পরিচায়ক।

কিছুদিন পূর্ব্বে বিজ্ঞাপনে ইলেক্ট্রিক্ মিক্শ্চার ও ইলেক্ট্রিক্ সালসার নাম দেখিয়াছিলাম। ভক্তি ও বিশ্বাসপূর্ব্বক সেবন করিলে সম্ভবতঃ এই ঔষধগুলি পেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্যাটারির কাজ করিত। একবার এক বাতের রোগী বেদনায় লাগাইবার জন্য একপ্রকার 'ইলেক্ট্রিক্ মলম' খরিদ করিয়া আনিয়াছিল। তাহার বেদনার স্থানে একটি ক্ষত থাকায় সেখানে ঐ মলম লাগাইবামাত্র রোগী 'বাপ্‌রে' বলিয়া চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিল। বোধ হয় মলমের মধ্যে অত্যন্ত অধিক ইলেক্ট্রিসিটি ছিল; তাহাতেই তাহার ঐরূপ 'শক্' (shock) লাগিয়াছিল। ইলেক্ট্রো-হোমিওপ্যাথিক ঔষধেও নাকি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ইলেক্ট্রিসিটি থাকে; সেজন্য ঐ সকল ঔষধের নাম শ্বেত ইলেক্ট্রিসিটি, পীত ইলেক্ট্রিসিটি, লোহিত ইলেক্ট্রিসিটি, ইত্যাদি। এগুলি সেবন করিলে রঙ্-বিরঙের 'শক্' লাগে কিনা জানি না।

রঙ্গরহস্য ছাড়িয়া দিয়া বলিতে পারা যায় যে, চিকিৎসা ব্যাপারে বিদ্যুৎ এক নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। যে সকল রোগ পূর্ব্বে অসাধ্য বলিয়া গণ্য হইত, এখন বৈদ্যুতিক চিকিৎসার অনুকম্পায় তাহার অনেকগুলি সাধ্যরোগের তালিকাভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। 'লুপাস' নামক অধরোষ্ঠের একপ্রকার অসাধ্য ক্ষত এখন বৈদ্যুতিক রশ্মিবিশেষের প্রয়োগে আশ্চর্য্যরূপ আরোগ্য হইতেছে। বাত, পক্ষাঘাত ও অনেক রকম স্নায়বিক রোগ ইদানীং বিদ্যুৎপ্রয়োগে সুন্দররূপে

চিকিৎসিত হইতেছে। বিদ্যুতের সাহায্যে শরীরের স্থানবিশেষকে সম্পূর্ণ অসাড় করিয়া সেখানে বিনা কষ্টে অস্ত্রপ্রয়োগ করা হয়। বিদ্যুতের দ্বারা 'ওজোন' বা ঘনীভূত অক্সিজেন তৈয়ার করিয়া তাহার সাহায্যে যক্ষ্মা ও অন্যান্য কতকগুলি রোগ আরোগ্য করিবার চেষ্টা চলিতেছে। আজকাল বিদ্যুৎকৃত ওজোনের দ্বারা কোন কোন দেশে ড্রেন ও পচা পুষ্করিণীর জল শোধিত করা হইয়া থাকে।

বৈদ্যুতিক রঞ্জেন-রশ্মির সাহায্যে দেহের মধ্যস্থ ভাঙ্গা হাড় ও ধাতুপদার্থ পরিষ্কাররূপ দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাতে ডাক্তারের বিশেষ সুবিধা হয়। বন্দুকে আহত ব্যক্তির শরীরের ঠিক কোন্ স্থানে বুলেট্ রহিয়াছে তাহা এই উপায়ে দেখিতে পাওয়া যায়। সার্জ্জেনের পক্ষে রঞ্জেন-রশ্মি হচ্চে অন্ধের চক্ষু। একটি বালিকা খেলাঘরের ছোট একটি বাইসাইকেল খেলনা খাইয়া ফেলিয়াছিল। রঞ্জেন-রশ্মির দ্বারা তাহার ফটোগ্রাফ লইয়া দেখা গেল ঐ খেলনাটি বালিকার বুকের কাছে অন্ননালীর ভিতরে আটকাইয়া আছে। লেখক একখানি পুস্তকে এই ফটোগ্রাফের হাফ্‌টোন ছবি দেখিয়াছিলেন। ডাক্তার সাহেব অস্ত্র করিয়া বাইসাইকেলখানি বাহির করিয়া দিলেন। তিনি বালিকাকে বলিয়া দিলেন যেন সে ভবিষ্যতে তাহার খেলাঘরের সকল বাইসাইকেলগুলিতে এক একটি মোটা সূতা বাঁধিয়া রাখে; কারণ, তাহা গিলিয়া ফেলিলে ঐ সূতা ধরিয়া টানিলেই সহজে বাহির হইয়া আসিবে, আর অস্ত্র করিবার আবশ্যক হইবে না।

বৈদ্যুতিক আলোকেরও অপকারিতা আছে। রৌদ্রে অধিকক্ষণ থাকিলে যেমন সর্দ্দিগর্ম্মি হয়, বিদ্যুতের তীব্র আলোকে অধিকক্ষণ থাকিলেও একপ্রকার সর্দ্দিগর্ম্মি হইতে পারে, তাহার নাম Electric sun-stroke। উদর বা দেহের অন্যান্য গহ্বরের মধ্যে জ্বলন্ত ছোট বৈদ্যুতিক ল্যাম্প প্রবেশ করাইয়া তাহার আলোকে তাহা বাহির হইতে পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয়। বিদ্যুতের দ্বারা কটারাইজ্ করিয়া নাক, মুখ ও মলদ্বারের ভিতর বিনা রক্তপাতে নানাবিধ অস্ত্র করা

হইয়া থাকে। চোখের মধ্যে ছুঁচ ফুটিয়া থাকিলে বড় বৈদ্যুতিক চুম্বকের সাহায্যে আকর্ষণ করিয়া ঐ ছুঁচ বাহির করিয়া লওয়া হয়, চোখের মধ্যে ছুরি বা চিমটা চালাইতে হয় না।

শ্রীহরিদাস হালদার।

সাধু ও শিল্পী *

শিল্পী ইন্দ্রিয়ের খেলা যে দৃষ্টিতে দেখেন, তাহা একদিকে যেমন বিষয়বদ্ধের দৃষ্টি নহে, অন্যদিকে তেমনি সাধুরও দৃষ্টি নহে, তাহা হইতেছে ঋষিদৃষ্টি—'আর্টের আধ্যাত্মিকতা' প্রবন্ধটির ইহাই মূল কথা। শিল্পী স্থূলকে শুধু স্থূলভাবেই দেখেন না, তিনি অন্বেষণ করেন স্থূলের মধ্য দিয়া সূক্ষ্মের রহস্যবিকাশ, আত্মার আপনারই বিভূতির খেলা। অতএব একান্ত ইন্দ্রিয়পর যিনি তাঁহার মধ্যে শিল্পীর বোধ নাই। রাধাকমল বাবুও এই কথাটিই মুখ্যতঃ তাঁহার প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দ্বিতীয় কথা হইতেছে শিল্পীর দৃষ্টি সাধুর দৃষ্টি নহে, কারণ শিল্পী ইন্দ্রিয়ের সব খেলাতেই ভালমন্দ পাপপুণ্য ক্ষুদ্রমহৎ সমানভাবে সকলের মধ্যে নিগূঢ় ভাগবতরসেরই বিচিত্র সঞ্চার দেখিতে পান, সাধু কিন্তু ইন্দ্রিয়খেলার বিশেষ প্রকরণের মধ্যে—পুণ্যের মধ্যে, মঙ্গলের মধ্যে, ইন্দ্রিয়ের অতীত হইবার প্রয়াসের মধ্যে শুধু ভগবানকে দেখেন। রাধাকমল বাবু এইখানে আপত্তি করিয়াছেন। তিনি বলেন সাধু ও শিল্পীর মধ্যে এইরূপ কোন প্রভেদ নাই। চৈতন্য-

* ভাদ্র সংখ্যার 'সাহিত্য ও সুনীতি' নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

দেব ও যীশুখৃষ্টের উদাহরণ দেখাইয়া তিনি বলিতেছেন, প্রকৃত সাধু যিনি, পাপের প্রতি তাঁহার কোন ঘৃণা নাই, পাপের মধ্যেও তিনি ভগবানকে দেখেন। কিন্তু প্রশ্ন এই—সাধু পাপের মধ্যে দেখেন কোন্ ভগবান, কি ভাবে? পাপের মধ্যে সাধু দেখেন 'পুণ্যাত্মক' ভগবান, 'পাপাত্মক' ভগবানকেও তিনি দেখেন কি? সাধুর পাপের প্রতি ঘৃণা, ঘৃণা বলিতে যে বিশেষ প্রকার চিত্ত-বিক্ষোভ বুঝি তাহা না থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু পাপকে তিনি একটা নিকৃষ্টতর জিনিস বলিয়াই বোধ করেন, উহা হইতে দূরেই থাকিতে চাহেন। তাঁহার লক্ষ্য, রাধাকমল বাবু যেমন বলিয়াছেন, পাপীকে 'উদ্ধার' করা। পাপীকে সাধু আলিঙ্গন করিতে পারেন কিন্তু পাপকে কখন তিনি আলিঙ্গন করিবেন না। পাপীর পাপের অন্তরালে একটা পুণ্যবান শুদ্ধিমান কিছুর সহিতই তাঁহার একাত্মতা, পাপের সহিত নহে। পাপীর মধ্যে সাধু ভগবানকে দেখেন তাহার পাপ সত্ত্বেও, কিন্তু পাপের জন্যই কি তিনি সেখানে ভগবানকে দেখেন? চৈতন্যদেব পাপীকে যখন বলিতেছেন, "তা'ই ব'লে কি প্রেম দিব না" তাঁহার মুখ হইতে অলক্ষিতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে 'তা'ই ব'লে', অর্থাৎ পাপ তাঁহার প্রেমের প্রতিবন্ধক, পাপকে ভালবাসা যায় না। যীশুখৃষ্ট পাপিনীকে বলিতেছেন, go and sin no more—যীশুখৃষ্টের সমস্ত দীক্ষাই ত এই পাপকে হেয় বলিয়া পরিবর্জ্জন করা। শিল্পীর বোধ কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য প্রকার। তিনি পাপীর মধ্যে ভাবগত-সৌন্দর্য্য দেখেন তাহার পাপের জন্যই। পাপের বিশেষত্বের মধ্যে কি অপার রস খেলিতেছে তাহাই তাঁহার লক্ষ্য। পাপীর পাপের অতীত প্রদেশে শুদ্ধাত্মা, মঙ্গলময় কিছু সদাসর্ব্বদা আছে কি না তাহা দেখান শিল্পীর কার্য্য নহে। বস্তুতঃ সাধু যে ভগবান দেখেন সে ভগবান অবিকল্প সমরসাত্মক, সর্ব্বত্র যিনি বিকারশূন্য হইয়া বাহ্যবিক্ষোভের অন্তরালে অবস্থিত। সাধুর উপলব্ধিতে এই ভগবান মঙ্গলময়, মহত্বপূর্ণ, অপাপ-

বিদ্ধ। শিল্পী কিন্তু ভগবানকে দেখেন ভগবানের বিচিত্রতা, তাঁহার অনন্তরসের দিক হইতে—বাহ্যবিক্ষোভের মধ্যে তিনি কি হইয়াছেন। পুণ্যবানের মধ্যে তাঁহার পুণ্যমূর্ত্তি, পাপীর মধ্যে কিন্তু পাপমূর্ত্তি—তবুও উভয়ক্ষেত্রে উহা ভগবৎ-মূর্ত্তিই। পিশাচের মধ্যে দেবভাবের অস্তিত্ব, বারনারীমধ্যে মাতা ভগবতীর অস্তিত্ব দেখাই সাধুর সব। শিল্পী কিন্তু পিশাচের মধ্যে দেখেন পিশাচ ভগবান, বারনারীর মধ্যে দেখেন ভোগবতী যে ভগবতী।

পাপ পাপ বলিয়াই সুন্দর, পুণ্য পুণ্য বলিয়াই সুন্দর। যাহাকে বল উৎকৃষ্ট, যাহাকে বল অপকৃষ্ট, সকলেই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য লই-য়াই পরমরসপূর্ণ। যাহা আছে, তাহা যেমন যে ভাবে আছে তাহা ঠিক সেই ভাবে আছে বলিয়াই সুন্দর। এই সৌন্দর্য্য চোখের দেখা, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সৌন্দর্য্য নহে কিন্তু ঋষির সমাধিদৃষ্ট ভগবৎ সৌন্দর্য্য। তাই শিল্পীর কাছে এ প্রশ্ন উঠে না, পাপ চাই না, চাই পুণ্য, অমঙ্গল চাই না, চাই মঙ্গল, ইন্দ্রিয়ের এইরূপ খেলা চাই না, চাই অন্যরূপ। সাধুর সাধুতা কিন্তু এইখানেই—বস্তু যেমন ভাবে আছে তাহাকে ঠিক ঠিক তিনি মনে করেন না, তাহাতে অভাব অসামঞ্জস্য নিরর্থকতা কত পরিলক্ষিত করেন। তিনি এক আদর্শ পাইয়াছেন, ভগবানকে একভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, জগৎকে সেই অনুসারে যতক্ষণ তিনি গড়িতে পারিতেছেন না, ততক্ষণ তাঁহার যেন স্বস্তি নাই। শিল্পী কিন্তু দেখেন জগৎ যেমন ভাবে আছে, তেমন ভাবেই পরম-সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত। সাধু উচ্চ নীচের একটা কল্পনা করেন, নীচকে উচ্চে লইয়া তবে তাহার সার্থকতা দেখেন। শিল্পীর নিকট উচ্চ-নীচে সমান সৌন্দর্য্য, সমান সার্থকতা।

কিন্তু অন্তরে শিল্পীর এই অখণ্ড অনন্তরসবোধ অক্ষুন্ন রাখিয়াও বাস্তব জীবনকে যে একটা বিশেষ রসাধার করিয়া গড়িয়া তোলা যায় না তাহা নহে। বাস্তব জীবনের একটি প্রেরণাই হইতেছে এইরূপ একটা বিশেষ আদর্শের প্রতি। কিন্তু আর্টের তাহা বিষয়

নহে। বাস্তব জীবনের প্রেরণা দ্বারা যখন আর্টকে নিয়ন্ত্রিত করিতে যাই, তখন আর্টের যে নিজস্ব অন্তরঙ্গ কথা—অনন্তরসবোধ তাহা হারাইয়া ফেলি। তখন হই কেবল সাধু। ইহার জলন্ত উদাহরণ টলষ্টয়। Anna Kareninaর টলষ্টয় হইতেছেন শিল্পী—তিনি যে সত্য প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিয়াছেন তাহা চিরকালের জিনিস ; কিন্তু Five Commandmentsএর টলষ্টয়, যে টলষ্টয় সেক্সপীয়রে কোন নীতিশিক্ষা না পাইয়া বলিয়াছেন, সেক্সপীয়রের কিছু মূল্য নাই, সে টলষ্টয় সাধুমাত্র। তিনি যে আদর্শের মধ্যে আপনাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা যতই মহান হউক না কেন, চিরকালের বস্তু নহে। বাস্তব জীবনকে একটা আদর্শে রচিত করিতে হইবে হউক, কিন্তু ঋষিদৃষ্টির যে সর্ব্বত্র সমত্ববোধ, যে অনন্তরস ভোগ, তাহার স্বাতন্ত্র্যকে বিলুপ্ত করিয়া নয়—বরং তাহাকেই প্রতিষ্ঠা-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া।

রাধাকমল বাবু আর্টকে রসসৃষ্টি না বলিয়া যে বলিতে চাহিতে-ছেন আত্মস্ফূর্ত্তি জীবনসৃষ্টি তাহার মূলে রহিয়াছে আর্ট ও জীবনের মধ্যে—বাস্তব জীবনের যে ঊর্দ্ধমুখী গতি ও আর্টের যে সর্ব্বত্র স্থির সমরসভোগ এই উভয়ের মধ্যে একটা অসামঞ্জস্যের বোধ। তিনি বলিতেছেন জীবনটাই সমগ্র, রসবোধ ইহার অঙ্গমাত্র। অঙ্গের উচ্ছৃঙ্খলতাকে দমনে রাখিতে হইবে, উহাকে নিয়মিত করিতে হইবে সমাজের ধর্ম্ম দিয়া। কিন্তু জিজ্ঞাস্য—আত্মা কি, জীবন কি ? উহাদের ধর্ম্মই বা কি ? আত্মাকে জীবনকে রাধাকমল বাবু যত সহজ করিয়া দেখিয়াছেন, উহা তত সহজ নহে। আত্মার জীবনের কত রকম বিকাশ, প্রত্যেক বিকাশের আপন আপন ধর্ম্ম আছে। দর্শন বিজ্ঞান রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতি ব্যবসা-বাণিজ্য—এ সকলই আত্মার স্ফূর্ত্তি জীবনের সৃষ্টি। ইহাদের প্রত্যেকেরই আপন আপন প্রকৃতি রহিয়াছে। সাধুতার ধর্ম্মশীলতার প্রকৃতিও বিভিন্ন প্রকারের। আর্টেরও প্রকৃতি আবার অন্যরূপ। আত্মাকে জীবনকে অন্যান্য যে

দিক দিয়াই দেখা যাউক না কেন, রসের দিক দিয়া সৌন্দর্য্যের দিক যে দেখা তাহা লইয়াই আর্ট।

রসবোধ জীবনের অংশমাত্র হইতে পারে কিন্তু জীবনকে রাধাকমল বাবু যে ভাবে দেখিয়াছেন, সুনীতির দিক দিয়া—পারতপক্ষে উৰ্দ্ধমুখী গতির দিক দিয়া—তাহাও কি জীবনের অংশমাত্র নহে? পাপপুণ্য নীতিবোধই জীবনের সব বা প্রধান কথা নহে, উৰ্দ্ধমুখী গতি ছাড়া জীবনস্রোতে কত তির্য্যকগতি কত অৰ্ব্বাক্ গতি রহিয়াছে। বস্তুতঃ জীবন অর্থই বিরুদ্ধগতি সমূহের সংঘর্ষ, মানুষমাত্রই একটা অসামঞ্জস্যের পিণ্ড। সামঞ্জস্য যদি চাহি তবে জীবনের কোন বিশেষ খণ্ড প্রকরণে বদ্ধ হইয়া নহে—এমন একটি জিনিস চাই যাহা কোন অংশকে খর্ব্ব করিয়া ধরিবে না, কিন্তু সকলের স্বাতন্ত্র্য, সকলের বিশেষত্ব, সকলের মধ্যে যে সত্য—আত্মা তাহাকে অবাধে পূর্ণভাবে বিকশিত হইতে দিবে।

আমি বলি, আর্টই এমন একটি জিনিসের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে। আর্টের যে রসবোধ তাহা জীবনের অংশমাত্র নহে, প্রকৃতপক্ষে উহাই জীবনের মর্ম্মকথা। জীবন যাহা লইয়া জীবন, তাহার নামই ত রস। এই রসের উৎসস্থান, আর্টের যে ঋষিদৃষ্টি, রাধাকমল বাবু যেমন নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যাহার নাম তুরীয় লোক, সেইখানে যে সামঞ্জস্য একমাত্র তাহাই প্রকৃত সামঞ্জস্য।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

সকলি আছে—কিছুই নাই

হিন্দুর সকলই আছে, আবার কিছুই নাই। কথায় যাহা আছে কাজে তাহা নাই, অনুষ্ঠানে যাহা আছে জ্ঞানেতে তাহা নাই, আদর্শে যতটা আছে বাস্তবে তার কিছুই নাই। এই জন্য হিন্দু বলিয়া আমরা যে গৌরব করি, তাহা সর্ব্বদা সত্য হয় না।

তাই বলিয়া এই গৌরবটুকুও ত ছাড়িতে পারি না। এই গৌরবটুকুই যে এখন আমাদের একমাত্র সম্বল। এই গৌরবটুকু আছে বলিয়াই ত আমরা আজও দুনিয়ার মাঝখানে যা'হউক একটু-আধটু মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছি। এই গৌরব মিথ্যা হইলেও, বিদেশীয় সভ্যতা ও সাধনার আঘাতে এইটিই এখন আমাদের একমাত্র বর্ম্ম-চর্ম্ম স্বরূপ হইয়া আছে। এই জন্যই এই মিথ্যা গৌরবে আঘাত করিতে এমন সঙ্কোচ হয়। এটি যেমন আমাদের বর্ত্তমানের আশ্রয়, তেমনি ভবিষ্যতেরও আশা। এই গৌরবটুকু গেলে আমাদের সব গেল।

কিন্তু এই শূন্যগর্ভ অভিমান লইয়া চিরদিন চলিবে না। স্বানুভূতিহীন শাস্ত্র, অর্থহীন অনুষ্ঠান, প্রাণহীন কর্ম্ম লইয়া চিরদিন চলে না। ইহাতে জাতির শক্তি থাকে না, স্থবিরতামাত্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। প্রাচীনের শবকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া কোনও জাতি নবজীবন লাভ করিতে পারে না। আবার এই শবকে "মাটি দিয়া" বা পোড়াইয়া, শূন্যতাকে ধরিয়াও কোনও জাতির বৈশিষ্ট্য ও জাতিত্ব বজায় থাকে না। জাতীয়তা কেবল কতকগুলি ভাবে নহে। এই মূল্যবান ভাবগুলি সকল সমাজেই স্বল্প বিস্তর পাওয়া যায়। জীবনের মূল সমস্যা সর্ব্বত্রই এক। ধর্ম্মের ও কর্ম্মের মূল লক্ষ্য সকলদেশেই সমান। সমুদায় সভ্যসমাজেই এগুলি আছে। তবে বস্তুতে এক হইলেও, আকারে বিভিন্ন হইয়া আছে। এই

আকারগত বৈচিত্র্যই জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্যের প্রাণ। বাল্যে ও শৈশবে শিক্ষা, যৌবনে সংসার, সকলেই করে; এবং বার্দ্ধক্যে অবসর লইয়া নির্ঝঞ্ঝাট হইয়া জীবনের সন্ধ্যাকাল সকলেই শান্তিতে ও আরামে কাটাইতে চাহে। অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ এবং বানপ্রস্থের মূল আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা, মূল প্রয়োজন ও সাধন সকল সভ্যসমাজেই পাওয়া যায়। কিন্তু বস্তুতে কতকটা ঐক্য থাকিলেও, আকারে আমাদের আশ্রমচতুষ্টয়ের মতন কোনও কিছু অপর সভ্য সমাজে নাই, ছিল বলিয়াও জানি না। আমাদের বিবাহের মূল লক্ষ্য যাহা, অপর সভ্যজাতির বিবাহের মূল লক্ষ্যও তাই। সর্ব্বত্রই প্রজোৎপাদনের জন্য, বংশধারা রক্ষার জন্য, সমাজস্থিতি-ভঙ্গ-নিবারণের জন্য বিবাহপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি আমাদের বিবাহপ্রথার এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা অন্যত্র দেখা যায় না। এই বৈশিষ্ঠ্য যে কি, ইহা বুঝিতে হইলে আমাদের বিবাহের অনুষ্ঠানটির আলোচনা করিতে হয়। অর্থাৎ এই বৈশিষ্ট্য ভাবের অপেক্ষা অনুষ্ঠানের মধ্যেই বেশী ফুটিয়াছে। আমরা যদি খৃষ্টীয়ানের মতন রেজিষ্টারি করিয়া বিবাহ করি, অথবা মুসলমানের মতন কাবিননামা সহি করিতে আরম্ভ করি, তাহাতে বিবাহের মূল লক্ষ্য—প্রজোৎপত্তি ও সংসাররক্ষার কোনও ব্যাঘাত জন্মিবে না। কিন্তু এ সত্বেও এরূপ বিবাহ আর হিন্দুবিবাহ থাকিবে না।

সুতরাং আমাদের সমাজের প্রাচীন, পুরাগত আচারানুষ্ঠান, রীতিনীতি, চালচলন,—এককথায়, আমাদের জীবনের বাহিরের কর্ম্মাকর্ম্ম, আমাদের সভ্যতা ও সাধনার বাহিরের কাঠামটাকেও একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারি না। প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া পোড়াইয়া ফেলিয়া আবার নূতন করিয়া জাতীয় জীবনের এই বহিরঙ্গগুলিকে গড়িয়া তুলিতে পারি না।

ফলতঃ যাহা একান্ত প্রাণহীন, তাহা আপনা হইতেই পচিয়া

ধসিয়া বিলোপ প্রাপ্ত হয়। যার মধ্যে প্রাণবস্তু নাই, তাহাকে ধরিয়া রাখিবে কে? এই পথেই বৈদিক কর্ম্মাদি কালক্রমে লোপ পাইয়াছে। একদিন ইন্দ্রবরুণাদি বৈদিক দেবতারা লোকের প্রত্যক্ষ, অনুভবগম্য, সত্যবস্তু ছিলেন। ভারতের আর্য্যেরা যখন বরুণের যজ্ঞ করিতেন, তখন এই প্রত্যক্ষ আকাশকে তাঁরা সত্য সত্যই প্রাণবান্ ও চেতনবান্ বলিয়া অনুভব করিতেন। বজ্রধারী ইন্দ্র তখন তাঁহাদের চক্ষে প্রত্যক্ষ রাজার মতন ছিলেন। তাঁরা অগ্নিকে যে-চক্ষে দেখিতেন তাহাতে অগ্নির পূজা তাঁদের নিকটে সত্য ও স্বাভাবিক ছিল। ক্রমে লোকে সে সরল সহজ অনুভূতি হারাইল। সূর্য্যাদির পুরাতন প্রভাব নষ্ট হইয়া গেল। প্রাণ-জ্যোতিঃর সাক্ষাৎ-কারে বাহিরের জ্যোতিঃসকল হীনপ্রভ হইয়া পড়িল। তখন উপ নিষদ গাহিয়া উঠিলেন—

> ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
> নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
> তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
> তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

অর্থাৎ—যেখানে সূর্য্য কিরণ দান করে না, চন্দ্রতারকা কিরণ দান করে না, বিদ্যুৎসকল যেখানে প্রকাশিত হয় না; এই অগ্নি কিরূপে তাহাকে প্রকাশ করিবে? সমুদয় বস্তু সেই জ্যোতির্ম্ময়েরই প্রকাশে অনুপ্রকাশিত, তাঁহার দীপ্তিতেই সকলে দীপ্তি পাইতেছে। এতাবৎকাল লোকে সূর্য্যাদি জ্যোতির্ম্ময় বস্তুসকলকেই বাহিরের ও অন্তরের সকল জ্যোতিঃর মূল বলিয়া মনে করিতেছিল। তখন যে তাহারা এই প্রত্যক্ষ জগতেই বাঁধা ছিল, অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক জগতের সন্ধান পাইলেও তখনও তার সাক্ষাৎকারলাভ হয় নাই। কিন্তু যখনই আত্ম-জ্যোতিঃর প্রত্যক্ষলাভ হইল, তখন হইতেই সূর্য্যা-দির অলৌকিকত্ব নষ্ট হইয়া গেল, ইহারা যে স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময় ও স্বপ্রকাশ নহে ইহা দেখা গেল। আর তখন হইতেই ইন্দ্রবরুণাদির

উপাসনার অন্তরতম প্রাণবস্তু চলিয়া গেল। ইহার পরেও নানা-প্রকারের আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার দ্বারা কিছুকাল পর্য্যন্ত বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড সমাজে প্রচলিত রহিল সত্য, কিন্তু ক্রমে সমাজ-জীবনের ক্রমবিকাশে নব নব ভাবের ও আদর্শের প্রকাশে এসকল ক্রিয়াকাণ্ড পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া গেল। প্রাণহীন বৈদিক কর্ম্মকে আর ধরিয়া রাখা গেল না। নূতন কর্ম্ম ও নূতন অনুষ্ঠানাদি আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া বসিল।

যথা পূর্ব্বং তথা পরং। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যাহা হইয়াছে, কাল-ক্রমে বর্ত্তমান যুগেও তাহাই হইবে। নূতন ভাব ও আদর্শের প্রকাশে সর্ব্বপ্রথমে সমাজ-চৈতন্য প্রাচীন ও প্রচলিতকেই নূতন ব্যাখ্যাদির দ্বারা সময়োপযোগী করিয়া লইতে চেষ্টা করে। এই চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী হয় না। আংশিকভাবে হয় মাত্র। যতটুকু পরিমাণে এই চেষ্টা ফলবতী হয়, ততটুকু পরিমাণে প্রাচীন ও প্রচলিত টিকিয়া যায়। নূতন অর্থলাভ করিয়া, নূতন প্রাণতা পাইয়া, নবযুগের নব-সাধনার সঙ্গে তাহা মিশিয়া যায়। যাহা এরূপ অর্থলাভ করিতে পারে না, কিম্বা যাহা নবযুগের সঙ্গে কিছুতেই আর মিশ খায় না, যাহাতে নূতন প্রাণসঞ্চার করা নিতান্ত কষ্টসাধ্য বা একান্ত অসাধ্য হয়, নবযুগের জ্ঞানবিজ্ঞানসম্মত ও প্রত্যক্ষ-অনুভূতিযুক্ত অর্থ যার করা যায় না, তাহা ক্রমে ক্রমে লোপ পাইয়া যায়। এইরূপেই আমাদের দেশে বহুতর প্রাচীন ক্রিয়াকলাপাদি ক্রমে লোপ পাই-য়াছে। তাহার পুনরুদ্ধার অসম্ভব ও অসাধ্য। এই জন্য যাঁহারা বৈদিকযুগের ক্রিয়াকর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছেন, তাঁহাদের সে চেষ্টা কদাপি সফল হইবে না, হইতে পারে না। যাঁহারা প্রাচীন যজ্ঞাদির উদ্ধারকল্পে যত্ন করিতেছেন, তাঁহারাও সফলকাম হইবেন না। সে-সকল যাগহোমাদি আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরাই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, আমাদের পক্ষে তাহাকে কোনও সত্য অর্থ ও সতেজ প্রাণতা দান করা অসম্ভব। যে অতিলৌকিক অনুভূতি

এই সকল যজ্ঞাদিকে সজীব রাখিয়াছিল, আমরা তাহা হারাইয়াছি। এই যুগে সে অনুভূতিকে আবার জাগাইয়া তোলা অসাধ্য। এখন এগুলিকে বজায় রাখিতে কিম্বা পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিতে হইলে, প্রাচীন যাজ্ঞিকদিগের অতিলৌকিকতার বা ঐন্দ্রজালিক ভাবের আশ্রয় লইলে চলিবে না; ধর্ম্ম-কল্পনা ও ধর্ম্ম-কলার—religious imagination'এর এবং religious art'এর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। ফসলের জন্য বৃষ্টি ও বৃষ্টির জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছি, গীতার এই অজুহাতও আর এখন খাটিবে না। এখন মনস্তত্ত্বের বা psycho logy'র এবং রসতত্ত্বের বা æsthetics'এর দিক্ দিয়া এসকল যজ্ঞাদির বিচার করিতে হইবে। এই বিচারে যদি ইহাদের প্রয়োজনয়ীতা ও উপযোগীতা প্রতিষ্ঠিত হয়, তবেই কেবল প্রাচীন হোমাদি বর্ত্তমান জীবনের অঙ্গীভূত হইবে; অন্যথা হইবে না, হইতেই পারে না।

এই ভাবেই, সম্ভব হইলে, প্রাচীন ও প্রচলিত প্রতিমা-পূজাদিও নূতন অর্থে, নূতন প্রাণতা লাভ করিয়া, আমাদের নূতন সমাজের ধর্ম্মকর্ম্মাদির অঙ্গীভূত হইতে পারিবে; অন্য কোনও প্রকারে হইবে না। ধর্ম্ম কল্পনা ও ধর্ম্ম-কলা—religious imagination এবং religious art'এর আশ্রয়েই এসকল প্রতিমা-পূজাকে বর্ত্তমানে রক্ষা করা সম্ভব হইতে পারে। এই দিক্ দিয়াই এখন এগুলির বিচার ও আলোচনা করা আবশ্যক। গতানুগতিকভাবে এগুলি রক্ষা করা আর সম্ভব নয়।

প্রাচীন বর্ণাশ্রমকে যদি রাখিতে হয়, তাহা হইলে তাহার মধ্যেও নূতন প্রাণতার সঞ্চার করিতে হইবে। ফলতঃ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বহু, বহুকাল হইতেই এদেশে লোপ পাইয়াছে। গীতাতে বর্ণসঙ্করের হাত হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্যই বর্ণাশ্রম সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু এখন সঙ্করবর্ণ ই ত ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বাঙ্গালার হিন্দুসমাজকে ছাইয়া বসিয়াছে। কেহ কেহ ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে বৈদ্যদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন,—কিন্তু এই বৈদ্য ত একটা সঙ্করবর্ণ। তার পর

কায়স্থগণও যে সঙ্করবর্ণ নহেন, শূদ্র-মিশ্রণ যে এখানে হয় নাই, এমন কথাই কি বলিতে পারা যায়? ফলতঃ প্রাচীন চতুর্ব্বর্ণ ত এখন এদেশে নাই। আর বর্ণ যতটুকুও বা আছে, আশ্রম ত আদৌ নাই। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম উপনয়ন-সংস্কারে পরিণত; বানপ্রস্থ পেন্‌-শন্‌গ্রস্ত; সন্ন্যাস বৌদ্ধ আদর্শের অনুসরণ করিয়া সকল বয়স ও সকল আশ্রমকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। আশ্রমধর্ম্মের পুরাতন পৌর্ব্বাপর্য্য ত কিছুই নাই। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম দুইটা ধর্ম্ম নয়, একটা; বর্ণ ও আশ্রম এই দুইএর যোগে যে-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই ত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। এযে কর্ম্মধারয় সমাস, দ্বন্দ্ব-সমাস ত নহে। কিন্তু কার্য্যতঃ বর্ত্তমানে ইহা এই দ্বন্দ্বেই পরিণত হইয়াছে। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আর নাই, আশ্রমের বিলোপে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ধর্ম্মত্ব লোপ পাইয়া, এখন বাকি পড়িয়া আছে কেবল বর্ণভেদ বা জাতিভেদ। প্রাচীন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এরূপ ভেদ কল্পনা করে নাই। গীতা গুণ আর কর্ম্মের উপরে চতুর্ব্বর্ণের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মনু পর্য্যন্ত গুণকর্ম্মকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান বর্ণভেদ কি মনুর আদর্শে, না গীতার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? অধ্যয়ন-অধ্যাপন যজন-যাজন ব্রাহ্মণের কর্ম্ম—সে ব্রাহ্মণ কোথায়? কেহ দুধ-বেচা ব্রাহ্মণ, কেহবা তামাকাঁসাবেচা ব্রাহ্মণ, কেহবা আড়তদার, কেহবা জমিদার। ওকালতি ও জজিয়তিটা ব্রাহ্মণ্যকর্ম্মের মধ্যে ধরিয়া লইলেও, দাস্যবৃত্তি—কেরাণীগিরি ত আর ব্রাহ্মণ্য কর্ম্ম নয়? মনু যে-সকল ব্রাহ্মণকে চোর বলিয়াছেন, গ্রাম ও সমাজ হইতে যাহা-দিগকে চোর বলিয়া তাড়াইয়া দিবার সুস্পষ্ট ব্যবস্থা দিয়াছেন, —সেই সকল ব্রাহ্মণই ত আজ ব্রাহ্মণ্যের দাবী করিয়া সমাজে একটা নূতন রেষারেষির ভাব জাগাইয়া তুলিতেছেন। বর্ণাশ্রমের নামে বিলাতী রক্তকৌলীন্যের একটা অদ্ভুত অনুকরণ বর্ত্তমানে আমাদের সমাজে প্রচলিত করা হয় ত বা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু প্রাচীন বর্ণাশ্রমকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব ও অসাধ্য।

তবে বর্ণাশ্রমের আদর্শটি অতি উদার এবং মহৎ একথাও অস্বীকার করা যায় না। এটি ভুলিয়া গেলেও চলিবে না। দেশকালপাত্রের উপযোগী করিয়া যাহাতে ঐ আদর্শটিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায়, তার চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য। সে চেষ্টা করিতে হইলে বর্ত্তমান বর্ণভেদ বা জাতিভেদকে একেবারে ঝাড়েমূলে উপড়াইয়া ফেলিতে হইবে। দ্বিজ-শূদ্রের প্রাচীন ভেদ রক্ষা করিবার চেষ্টা এখন নিষ্প্রয়োজন ও আত্মঘাতী হইবে। বর্ত্তমান সমাজে হয় শূদ্র নাই, না হয় দ্বিজ নাই; দু'এর একটা মানিতেই হইবে। মনুর বিধানে বেদাধ্যয়নের দ্বারা দ্বিজত্বের প্রতিষ্ঠা হইত। যেখানে লাখে একজন ব্রাহ্মণও বেদের "ব" জানে না, সেখানে তবে আর ব্রাহ্মণের দ্বিজত্ব আছে কোথায়? তারপর আধ্যাত্মিক জন্মের দ্বারা যদি দ্বিজত্ব হয়, তবে গুরুদীক্ষা যে'ই লাভ করে, সে'ই দ্বিজ হইয়া যায়। সদ্‌গুরুর নিকটে মন্ত্রদীক্ষালাভে ব্রাহ্মণ-শূদ্র সকলের সমান অধিকার। তন্ত্রে সর্ববর্ণকে এই অধিকার দিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের শাক্ত ও বৈষ্ণব সকলেরই এই অধিকার আছে। অন্ত্যজবর্ণের লোকেও গুরুকরণ ও মন্ত্রদীক্ষা-গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইঁহারা যে-কুলেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকুন না কেন, এই মন্ত্রদীক্ষাপ্রভাবে দ্বিজত্বের অধিকারী হইয়া থাকেন। এইজন্যই বলিতে হয় যে সত্যভাবে বিচার করিলে, কি গুণের হিসাবে, কি কর্ম্মের হিসাবে, কি অধ্যাত্ম-জীবনে দীক্ষালাভের হিসাবে, যেদিক দিয়াই দেখা যাউক না কেন, বর্ত্তমানে বাঙ্গালী সমাজে প্রাচীন চাতুর্ব্বর্ণ্যের কোন কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। আশ্রম ত নাই; বর্ণও নাই। এ অবস্থায় কেবল বর্ণভেদ বা জাতিভেদ বা "ছোৎমার্গকে" আশ্রয় করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আদর্শ রক্ষা বা তাহাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা আদৌ সম্ভব নয়। এদিকে যা কিছু চেষ্টা হইতেছে তার মূল প্রেরণা জাত্যাভিমান, নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য শ্রেণীবিশেষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা। এককথায় বলিতে গেলে আমরা বর্ণাশ্রমের দোহাই দিয়া প্রকৃতপক্ষে বিলাতী

শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেণী-বিরোধই class distinction এবং class-warই প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছি। এভাবে হিন্দুসভ্যতা ও সাধনাকে রক্ষা করা যাইবে না, বরং আরও বেশী করিয়া তাহার উচ্ছেদই সাধিত হইবে।

অথচ আমাদের প্রাচীন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যে আদর্শের সন্ধানে যাইয়া সমাজ-সমস্যার যে মীমাংসাটি করিতে চাহিয়াছিল তাহাকে উপেক্ষা করিলেও চলিবে না। বর্ত্তমানের শ্রেষ্ঠতম চিন্তা ও সাধনা সেই আদর্শেরই অনুসরণ করিতেছে। সে আদর্শটি বিশ্বজনীন সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা। এই আদর্শ ইউরোপেরও নূতন আবিষ্কার নহে, আমাদেরও নিতান্ত অপরিচিত নহে। যেখানে উচ্চতর ধর্ম্ম ফুটিয়াছে, সেখানেই এই আদর্শটি জাগিয়াছে। ফরাসী বিপ্লবের বহু বহু শতাব্দ পূর্ব্বে যীশুখৃষ্ট এই আদর্শটিই প্রচার করেন। তারও বহু শতাব্দ পূর্ব্বে এদেশে ভগবান বুদ্ধদেব এই আদর্শটিই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবেরও বহু বহু যুগ পূর্ব্বে ভারতের প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণ এই সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতাই সাধন করিয়াছিলেন। খৃষ্টের বহু শতাব্দ পরে, আরবে হজ্‌রত মোহম্মদও এই সাম্যই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন! জগতের সকল ধর্ম্মেরই মূল লক্ষ্য এটি। অথচ আজ পর্য্যন্ত কোনও সমাজে বা কোনও ধর্ম্মমণ্ডলীতে এই সনাতন আদর্শটির সম্যক প্রতিষ্ঠা হয় নাই। কারণ, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা যেমন একটা সার্ব্বজনীন আদর্শ, সেইরূপ বৈষম্য, বিরোধ এবং প্রভুতাও একটা সার্ব্বজনীন সামাজিক ব্যবস্থা। সাম্য আত্মার ঈপ্সিত, কিন্তু বৈষম্য সংসারের অপরিহার্য্য নিয়তি। মৈত্রী প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু বিরোধ, প্রতিযোগিতা, সংগ্রাম জীবনধারণের অপরিহার্য্য ও সার্ব্বজনীন পন্থা। স্বাধীনতা পরম পুরুষার্থ, কিন্তু অধীনতা ব্যতীত সমাজ-স্থিতি আর সমাজ-স্থিতি ব্যতীত লোকরক্ষা ও জীবনরক্ষা, আত্মরক্ষা ও আত্মোন্নতি, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম সকলই অসম্ভব ও অসাধ্য হয়। বৈষম্যের মধ্যেই সাম্যকে, বিরোধের মধ্যেই মৈত্রীকে, পরাধীনতার

মধ্যেই স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, তবে এই জটিল, দুরূহ, সার্ব্বজনীন সমাজ-সমস্যার মীমাংসা সম্ভব। এই অঘটন ঘটাইব কিরূপে?

ভারতবর্ষের প্রাচীন সাধনা এই বর্ণাশ্রমব্যবস্থার দ্বারা এই সমস্যার একটা মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সে চেষ্টা যে সম্পূর্ণরূপে ফলবতী হইয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু নিষ্ফল হইলেও, এই সমস্যার মীমাংসার অন্য পথ যে আছে, তাহাও ত মনে হয় না। অন্ততঃ এ পর্য্যন্ত ইহার আর কোনও শ্রেষ্ঠতর পন্থা আবিষ্কৃত হয় নাই। এই জন্যই নিতান্ত সরাসরিভাবে এই বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে বর্জ্জন না করিয়া ইহার সংশোধন, পরিবর্ত্তন ও সময়োপযোগী সম্প্রসারণ সম্ভব কি না, আমাদিগকে ধীরভাবে তাহাই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

আর এই বিচারের মূলে, সকলের আগে আমাদিগকে এটি বুঝিতে হইবে যে, যে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতাকে আমরা ইউরোপের আমদানী ভাবিয়া অনেক সময় অমন বিদ্রূপ ও অশ্রদ্ধা করিয়া থাকি, তাহা ইউরোপের বিশিষ্ট ও নিজস্ব সম্পত্তি নহে, কিন্তু আমাদেরও প্রাচীনতম সাধনের ধন। ফলতঃ স্বাধীনতার বা সাম্যের বা মৈত্রীর সম্পূর্ণ তথ্য আজি পর্য্যন্ত ইউরোপে ভাল করিয়া প্রকাশিত হয় নাই। প্রত্যেক বস্তুর বা তত্ত্বের বা আদর্শেরই দুইটা দিক্ আছে—একটা তার ভাবের দিক্, আর একটা তার অভাবের দিক্; একটা ইতির দিক্—হাঁ'র দিক্, একটা নেতির দিক্—না'র দিক্;—একটা positive দিক্, আর একটা negative দিক্। ইউরোপ এপর্য্যন্ত স্বাধীনতার ভাবের দিক্, ইতির দিক্, হাঁ'র দিক্ বা positive দিক্টা ভাল করিয়া ধরিতে পারে নাই; তার অভাবের দিক্, নেতির দিক্, না'র দিক্ বা negative দিক্টাই খুব শক্ত করিয়া আঁকড়াইয়া রহিয়াছে। ইউরোপ স্বাধীনতা বলিতে কেবল অধীনতার অভাবটাই বুঝে, স্বাধীনতার ভিতরেও যে একটা অধীনতা আছে, একথা এখনও

পরিষ্কাররূপে ধরিতে পারে নাই। এইজন্য ইউরোপীয় ভাষায় আমাদের স্বাধীনতার সত্য প্রতিশব্দ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমাদের ভাষাতেও তাহাদের independence, freedom, বা libertyর কোনও সত্য প্রতিশব্দ নাই। আমাদের প্রাচীন সাধনায় স্ব'এর অধীনতাকেই স্বাধীনতা বলিয়াছে। আর এই স্ব-বস্তু আত্ম বস্তু, ইহা একই সঙ্গে সবিশেষ ও নির্বিশেষ, ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিভূত, একই সঙ্গে ইহা সোপাধিক ও নিরুপাধিক, অংশ ও অংশী। আত্মবস্তু আর ব্রহ্মবস্তু একই বস্তু বা একই তত্ত্ব। এই আত্মতত্ত্বের উপরেই ভারতীয় সাধনার সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত। এই আত্মবস্তুর প্রত্যক্ষ লাভ করিয়াই উপনিষদ কহিয়াছেন—

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।

অর্থাৎ যিনি আত্মাতে সমুদায় বস্তু দেখেন এবং সমুদায় বস্তুতে আত্মাকে দেখেন, তিনি সেই কারণে কাহাকেও ঘৃণা করেন না।

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥

এই যাবতীয় ভূতগ্রাম তাঁর আত্মারই মতন—জ্ঞানী ব্যক্তি যখন এই জ্ঞানলাভ করেন, তখন সেই একত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির মোহ এবং শোক দুই' নষ্ট হইয়া যায়। এই একত্বানুভূতির উপরেই ভারতীয় সাধনার সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা। অধিকারের বা স্বত্বের বা রাইটের (right'এর) সমতার উপরে এই সাম্য প্রতিষ্ঠিত নহে; কিন্তু আত্মার একত্বের উপরেই ইহার প্রতিষ্ঠা। আমার যেমন সুখদুঃখাদির অনুভূতি হয়, সকলেরই সেইরূপ হয়; আমার মতন তাহারাও প্রিয়বস্তুলাভে উৎফুল্ল ও অপ্রিয়লাভে বিষন্ন হইয়া থাকে; এই যে সমবেদনা বা সহানুভূতি ইহাই আমাদের সাম্যসাধনার মূল মন্ত্র। ইহারই উপরে ভারতের সনাতন মৈত্রী ও অহিংসা-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হই-

রাছে। আমাদের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার আদর্শ সামাজিক নহে, কিন্তু আধ্যাত্মিক; বাহিরের নহে কিন্তু ভিতরের। এই জন্য বাহিরের বৈষম্যে, বিরোধে, অধীনতাতে ইহাকে নষ্ট করিতে পারে না। ভারতীয় সাধনা বিশেষভাবে অন্তরঙ্গজীবনে—subjective life'এতেই —এই আদর্শের অনুশীলন করিয়াছে; বহিরঙ্গে ইহার অবাধ প্রতিষ্ঠার তেমন প্রয়াস পায় নাই।

ভারতীয় সাধনা ইহা বেশ বুঝিয়াছিল যে আপামর সাধারণ সকলেই এই শ্রেষ্ঠতম আদর্শলাভের অধিকারী নহে। আত্মজ্ঞানী ও তত্ত্বজ্ঞানী ব্যতীত কেহই এই আধ্যাত্মিক সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার মর্ম্ম ও মর্য্যাদা বুঝিতে পারে না। কেবল তত্ত্বজ্ঞানীগণই সম্যকরূপ এই আদর্শ আয়ত্ত করিতে পারেন। এখনও এমন সকল মহাপুরুষ মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়, এই সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা যাঁদের সম্পূর্ণরূপে সাধন হইয়াছে। ইঁহারা অপরের শরীর আহত হইলে, নিজের অক্ষত শরীরে বেদনা অনুভব করেন; অপরকে শীতার্ত্ত দেখিলে ইঁহাদের শীতবস্ত্রাবৃত দেহ থর থর কাঁপিতে থাকে; অপরের ক্ষুন্নিবৃত্তিতে ইঁহারা নিজেরা পরিতৃপ্তি লাভ করেন; অপরের পাপযাতনা পর্য্যন্ত ইঁহারা নিজেদের মনেতে ভোগ করিয়া থাকেন। গুরুকৃপায় এমন মহাপুরুষের প্রত্যক্ষলাভ করিয়াছি। ইঁহাদের দেখিয়াই আমাদের প্রাচীন সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার আদর্শটা যে কি, ইহা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিয়াছি। ইঁহারাই এই শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্মের সত্য অধিকারী। এই অধিকারলাভে প্রথম সাধন শমদমাদি—ইন্দ্রিয়সংযম ও মনঃসংযম। দ্বিতীয় সাধন বিবেক-বৈরাগ্য। শমদমাদির দ্বারা দেহশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি হয়। বিবেক বৈরাগ্যের দ্বারা আত্মজ্ঞানের অন্তরায় দূর হয়। যখন এইরূপে সাধকের নিজের ইন্দ্রিয়-লালসা নিঃশেষে নষ্ট হইয়া যায়, তখন বিশ্বের লোকের ভোগেতে তাঁহার পরমতৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে; তখন বিশ্বজনের সুখদুঃখের মধ্যে তাঁহার আপনার ক্ষুদ্র সুখদুঃখ একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মিশিয়া যায়। তখনই সর্ব্বভূতে আত্ম-

জ্ঞান, সর্ব্বজীবে মৈত্রীলাভ হইয়া থাকে। তখন সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতাতে সাধক নিত্যসিদ্ধ অবস্থা লাভ করেন।

সকলের পক্ষে এই উচ্চতম অবস্থালাভ সম্ভব নহে। বহু, বহু জন্মের তপস্যা ও সুকৃতির বলে, কচিৎ কোনও ভাগ্যবানের পক্ষে ভগবৎ-কৃপায় এই শ্রেষ্ঠ সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। কিন্তু এই অবস্থাই জীবের সাধ্য। ইহাই সকলের চরম লক্ষ্য। এইটি প্রতিষ্ঠিত করাই সমাজধর্ম্মের উদ্দেশ্য। আর জনসাধারণকে ক্রমে ক্রমে এই লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্যই, মনে হয়, প্রাচীন ভারতীয় সাধনায় এই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। মানুষের ভেদবুদ্ধিকে স্থায়ী করিবার জন্য বর্ণবিভাগের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, তাহাকে তিলে তিলে নষ্ট করাই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অভিপ্রায়। গীতায় ভগবান—

(চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ

এই বলিয়া এই উদ্দেশ্যটিকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চতুর্ব্বর্ণাঃ শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই, চাতুর্ব্বর্ণ্যং শব্দই এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে। চতুর্ব্বর্ণাঃ বলিলে, চারিটি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ বুঝাইত। চাতুর্ব্বর্ণ্যং বলাতে এই ব্যষ্টিভাব নিরস্ত হইয়া, চারিবর্ণের মিলনে যে সমষ্টির সৃষ্টি হয়, সেই সাকুল্যকেই বুঝাইতেছে। অর্থাৎ ভগবান ব্রাহ্মণাদি ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র ও পরিচ্ছিন্ন চারিটি বর্ণের সৃষ্টি করেন নাই, কিন্তু বিরাট সমাজ-দেহের একত্বের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি চারিটি বিশেষ বিশেষ অঙ্গের প্রতিষ্ঠা মাত্র করিয়াছেন। অঙ্গের সংস্থান অঙ্গীর মধ্যে, অংশের প্রতিষ্ঠা অংশীতে। অঙ্গীর লক্ষ্যই অঙ্গের সাধ্য, অংশীর স্বার্থই অংশের অর্থ। এই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধেতে বা organic relation'এ —বিভিন্ন অঙ্গের বৈশিষ্ট্য মাত্র থাকে, কিন্তু সত্যভাবে কোনও প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব-নিকৃষ্টত্ব থাকে না। এই শ্রেষ্ঠত্ব-নিকৃষ্টত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এক্ষেত্রে সর্ব্বদাই নিতান্ত আত্মঘাতী হইয়া উঠে।) আর সমাজ-অঙ্গীর অঙ্গস্বরূপ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে যাহাতে

এরূপ স্বাতন্ত্র্যাভিমান ও শ্রেষ্ঠত্বাভিমান না জন্মিতে পারে, এই সকল বৈষম্যেতে যাহাতে মৌলিক মানবীয় সাম্যের আদর্শকে নষ্ট করিতে না পারে, তারই জন্য আমাদের প্রাচীন সমাজ-বিজ্ঞানে এই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

জীবনের প্রথম বিভাগে, শিক্ষার্থীর অবস্থায়, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে সকলেই সমান শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করিবে; সেখানে সকলেই ভিক্ষাজীবী, সকলেই গুরুসেবা-নিরত, কাহারও জন্মগত, বংশগত, বা পারিবারিক ধনসম্পত্তি প্রভৃতি-জনিত কোনও প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার বিন্দুমাত্রও অবসর থাকিবে না। তার পর, গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিয়া ইহারা আপন আপন কর্ম্ম বা profession ও calling হিসাবে সমাজ-অঙ্গীর বিভিন্ন অঙ্গের সঙ্গে যাইয়া মিলিয়া যাইবে। কেহ বা ব্রাহ্মণ্য কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া লোকশিক্ষক ও লোক-নায়ক হইবে, কেহ বা ক্ষাত্র কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া দেশরক্ষক ও সেনা-নায়কাদি হইবে, কেহ বা বৈশ্যকর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কৃষি-গোরক্ষা বাণিজ্যাদিতে নিযুক্ত হইবে। এইরূপে সংসারী হইয়া, নানাভাবে সমাজের সেবা করিয়া, বংশধারা রক্ষার নিমিত্ত পুত্রকন্যাদি উৎপাদন করিয়া, পরে পঞ্চাশূর্দ্ধং-বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া, সংসার-কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া শান্তিতে আত্মচিন্তা প্রভৃতির দ্বারা পারমার্থিক তত্ত্বের অনুশীলনে নিযুক্ত হইবে। আর সর্ব্বশেষে সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিয়া, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনের দ্বারা, সর্ব্বপ্রকারের আত্মাভিমানশূন্য হইয়া, সর্ব্বভূতে সাম্য মৈত্রী সাধন করিবে।

গুণ ও কর্ম্মের দ্বারাই প্রত্যেক ব্যক্তির সামাজিক পদ নির্দ্ধারিত হইবে। যাহার ব্রাহ্মণ্য-লক্ষণ আছে, অর্থাৎ যে বিদ্যাবিনয়াদির দ্বারা লোকশিক্ষক ও ধর্ম্মযাজকের কর্ম্মের সম্পূর্ণ উপযুক্ত সে'ই ব্রহ্মকর্ম্ম অব-লম্বন করিয়া, সমাজের সেবা করিবে। যাহার ক্ষাত্রলক্ষণ আছে, চরিত্র ও শিক্ষার দ্বারা যে দেশ-রক্ষা ও দেশ শাসনের উপযুক্ত সেই ক্ষাত্র-কর্ম্ম অবলম্বনে সমাজ-সেবা করিবে। যে পণ্য উৎপাদনে ও ব্যবসা-

বাণিজ্যাদি বিষয়ে কৃতিত্বলাভ করিবে সে'ই বৈশ্যকর্ম্ম অবলম্বন করিবে। কিন্তু শূদ্র বলিয়া ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদির দাস্যবৃত্তি করিবার জন্য কোনও নির্দ্দিষ্ট বর্ণ আর থাকিবে না। আজ যদি ভগবান আবির্ভূত হইয়া গীতাধর্ম্ম প্রচার করিতেন, তাহা হইলে চাতুর্ব্বর্ণ্যের কথা বলিতেন না। পরিচর্য্যা করিবার জন্য একটা বিশেষ বর্ণের বা শ্রেণীর কোনও প্রয়োজন ভবিষ্যতে থাকিবে না। পরিবারের কনিষ্ঠেরাই জ্যেষ্ঠদিগের সেবা ও পরিচর্য্যা করিবে; আর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ও কলা-কুশলতার কল্যাণে পূর্ব্বে শূদ্রেরা যে-সকল কর্ম্ম করিতেন তাহার সংখ্যা এবং শ্রমসাধ্যতাও ক্রমে হ্রাস হইয়া যাইবে। ইউরোপে এখনি রন্ধনাদি কর্ম্ম কিম্বা গৃহাদি মার্জ্জন ও আবাসবাটীর আবর্জ্জনা ও ময়লা পরিষ্কার করিবার জন্য বিশেষ লোক নিযুক্ত অথবা অত্য-ধিক কালক্ষেপ করা নিষ্প্রয়োজন হইয়া উঠিতেছে। (আমাদের দেশে বর্ণাশ্রমের বা জাতিভেদের ও "ছোঁৎমার্গের" প্রভাবেই বোম্বাই ও মান্দ্রাজে ব্রাহ্মণ পরিবারে পরিবারের লোকেরাই আপনাদিগের প্রয়োজনীয় সেবা-কর্ম্ম করিয়া থাকেন। শূদ্রের সেবা-গ্রহণও যে তাঁহা-দের পক্ষে নিষিদ্ধ। এই জন্য "ছোঁৎমার্গে" শূদ্র বলিয়া একটা বর্ণ থাকিলেও, গুণ কর্ম্মানুসারে মান্দ্রাজের ও বোম্বাইএর শূদ্রেরা কৃষি-গোরক্ষা কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া বৈশ্যকর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। দক্ষিণের "পারিয়া"দিগকে প্রকৃতপক্ষে আর শূদ্র বলা যায় না, বৈশ্যই বলা কর্ত্তব্য। কারণ, কৃষিগোরক্ষা প্রভৃতি কর্ম্মের দ্বারাই এখন এই পারিয়ারা আপনাদের জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকেন। সুতরাং কি ইউরোপে কি হিন্দুস্থানে সর্ব্বত্রই সমাজবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শূদ্র বলিয়া একটা বিশেষ বর্ণ আর থাকিবে না। বর্ত্তমানেই যাহারা জন খাটিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে, কেবল তাহারাই শূদ্র স্থানীয় হইয়া আছে। কিন্তু মহাজন ও জনের—capitalist ও labourer মধ্যে বর্ত্তমানে যে পার্থক্য ও বিরোধ আছে, ক্রমে তাহাও থাকিবে না। সমাজ-গতি সেই পথেই চলিয়াছে।) আর আধুনিক

সভ্যজগতের এই সমস্যার মীমাংসার সঙ্গে সঙ্গে সমাজদেহে পুরাতন দাসের বা শূদ্রের কোনও বিশেষ স্থান ও সঙ্গতি আর থাকিবে না বলিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য গুণকর্ম্ম বিভাগানুসারে সমাজে এই তিন বর্ণমাত্র থাকিবে। সর্ব্বত্রই মানব-সমাজে চিরদিন এই ত্রিবিধ কর্ম্মবিভাগ ছিল—চিরদিনই থাকিবে। লোকশিক্ষক ও লোকশাসকেরা সর্ব্বদাই সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানার্হ হইয়া থাকিবেন। বণিকাদি তাঁহাদের নিম্নে ও কৃষিগোরক্ষা-ব্যবসায়ে যাঁহারা নিযুক্ত থাকিবেন, তাঁহারা সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদাই সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প মর্য্যাদা পাইবেন। এইরূপ ভেদবৈষম্য অপরিহার্য্য। আর জন্মগত (বা hereditary) না হইয়া গুণকর্ম্মগত হইলে, এই অপরিহার্য্য ভেদ-বৈষম্যে প্রকৃতপক্ষে সাম্যমৈত্রীর কোনও বিশেষ অন্তরায়ও উৎপাদন করিবে না। আর অভ্যাসবশতঃ ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠকর্ম্মী বা ব্যবসায়ীর অন্তরে যাহা কিছু আভিজাত্য ও অভিমান জন্মিবার আশঙ্কা আছে, আশ্রমধর্ম্মের দ্বারা তাহারও নিবারণের ব্যবস্থা করা যায়। এই জন্যই আমাদের প্রাচীন বর্ণাশ্রমের মূল আদর্শ ও লক্ষ্যটি এমন উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়।

আদিতে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে জন্মজনিত ভেদবুদ্ধি নষ্ট করিবার চেষ্টা হইত। মধ্যে গার্হস্থ্যাশ্রমে সমাজের বিবিধ কর্ম্ম সাধন করিতে যাইয়া, আবার একটা কর্ম্মগত ও কর্ম্মের জন্য পদমর্য্যাদাগত ভেদ ও বৈষম্য প্রতিষ্ঠিত হইত। এই ভেদবুদ্ধি নষ্ট করিবার জন্যই পরবর্ত্তী বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাশ্রমের ব্যবস্থা ছিল। এইরূপে প্রাচীন সমাজের গুণকর্ম্মগত বর্ণবিভাগ আশ্রমচতুষ্টয়ের শিক্ষা ও সাধনের দ্বারা শোধিত ও সংস্কৃত হইয়া, উভয়ে মিলিয়া সমাজধর্ম্মের অপরিহার্য্য বৈষম্যের মধ্যেই একটা শ্রেষ্ঠতর সাম্যকে ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিল। বৈষম্য, ভেদ, বিরোধ, অধীনতা এগুলি আকস্মিক; একটা অবস্থায়, একটা আশ্রমেই এগুলির অবসর ছিল। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা এগুলি নিত্য, মৌলিক বস্তু। প্রাচীন বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ব্যবস্থার দ্বারা ভেদের মধ্যেই

অভেদ, বিরোধের মধ্যেই মৈত্রী, অধীনতার উপরেই স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। এই চেষ্টাটি এইরূপ ভাবে আর কোথাও হইয়াছিল বলিয়া জানি না। বর্ত্তমানেও আমাদিগকে সমাজের কর্ম্ম-জন্য ও ব্যক্তিগত গুণাগুণ জন্য অপরিহার্য্য ভেদ, বৈষম্য, বিরোধ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, পরাধীনতাকে স্বীকার করিয়াই, তাহারই উপরে সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই জন্য প্রাচীন অভিজ্ঞতার আশ্রয় লইয়া, এই বর্ণাশ্রমের মূল ভাব ও আদর্শটিকে বর্ত্তমানের উপযোগী করা সম্ভব কি না, ইহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। তবে কার্য্যতঃ এই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বহুদিন আপনার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বর্ণভেদমাত্রে পরিণত হইয়াছে। ইহার প্রাচীন প্রাণ আর নাই, সনাতন অর্থ আর নাই, আছে কেবল জীর্ণ কঠোর কাঠাম মাত্র।

এইরূপে জীবনের প্রায় প্রত্যেক বিভাগেই দেখিতে পাই যে হিন্দুর শাস্ত্র ইতিহাসে একটা উচ্চতম আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু এখন তার সাধন নাই। শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র আছে, তার সত্য অর্থবোধ নাই। উন্নত পন্থা আছে, কিন্তু উপযোগী অনুশীলন নাই। বহুবিধ শ্রেষ্ঠতম সংস্কার ও অনুষ্ঠান আছে, কিন্তু তাহাদের প্রাণ নাই। এইজন্যই বলি হিন্দুর সকলই আছে, অথচ কিছুই নাই। আছে কেবল একটা দেশব্যাপী অজ্ঞতা। আর আছে এই অজ্ঞতার চিরসাথী একটা শূন্যগর্ভ অতিকায় অভিমান। এই অভিমানকে নষ্ট করিতে চাই না, এ অভিমানকে নষ্ট করিলে চলিবে না। ইহাকে সত্য করিতে হইবে। এই অজ্ঞতাকে দূর করিয়া, প্রাচীন সাধনার মধ্যে বর্ত্তমানের উপযোগী ও আবশ্যকীয় সংস্কারগুলিকে অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত করিয়া, জ্ঞানগম্য ও জীবন্ত করিতে হইবে। এরই জন্য প্রাচীনকে লইয়া এতটা নাড়াচাড়া করি। এরই জন্য যথাসাধ্য প্রাচীনকে রাখিতে চাই। কারণ এই প্রাচীন দেহগুলির মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে যে বস্তুটি ফুটিয়া উঠিবে, তার মতন কোনও কিছু আধুনিক জগতের আর কোথাও আছে বা পাওয়া সম্ভব বলিয়া যে বোধ হয় না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

দুর্গাপূজা

দুর্গাপূজা বাঙ্গালীর মহামহোৎসব। এখনও খাঁটি হিন্দুর ঘরে পূজা দেখিলে মনে ভক্তির উদয় হয়। আরতির সময় পুরোহিত ঠাকুর প্রথমে পঞ্চপ্রদীপ লইয়া পরে পাণিশঙ্খ লইয়া, তা'র পর কাপড় লইয়া, নির্ম্মাল্য লইয়া, তা'র পর কর্পূরের আলো, ধুনুচি লইয়া, দেবীর আরতি করিতেছেন, তাঁহার চোখ দিয়া দর্‌দর্‌ করিয়া জল পড়িতেছে। ধূপ ও ধূনার ধোঁয়ায় প্রকাণ্ড দালান অন্ধকার। কর্ত্তা চামর ঢুলাইতেছেন। তাঁহার পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, দাস-দাসী, প্রতিবেশীতে দুরদালান ভরিয়া গিয়াছে। বাহিরে উঠানে লোকে লোকারণ্য; তাহার মাঝে ঢুলিরা মাথা চালিয়া ঢাক-ঢোল বাজাইতেছে; সকলের উপর চড়িয়া শানাই বাজিতেছে। শাঁখ, কাঁসর, ঘণ্টা ত আছেই। কর্ত্তা এক একবার উচ্চৈঃস্বরে মা—মা—বলিয়া ডাকিতেছেন; সে স্বর তাঁহার নাভিকমণ্ডলু হইতে হৃদয়ের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়া উঠিতেছে। সে স্বরে সকলেরই মন ভক্তিতে গলিয়া যাইতেছে। গৃহিণী ও তাঁহার কন্যারা, পাড়ার আর আর স্ত্রীলোকদের লইয়া, একপাশে দাঁড়াইয়া আরতি দেখিতেছেন। ক্রমে গৃহিণী পুরোহিতের নিকটে আসিলেন ও আসনপিড়ী হইয়া বসিলেন। পুরোহিত তাঁহার মাথার উপরে আগুনের সরা বসাইয়া দিলেন ও ক্রমাগত ধূনা দিতে লাগিলেন। আবার ধূনার ধোঁয়ায় ঘর ভরিয়া গেল। কন্যা বা পুত্রবধূ আসিলেন। তিনি কর্পূরের সরা মাথায় তুলিয়া লইলেন, পুরোহিত ঠাকুর সেটি জ্বালাইয়া দিলেন। যতক্ষণ সে কর্পূর না নিভিল, ততক্ষণ তিনি নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। আরতি শেষ হইল; ঢাক-ঢোলের বাদ্য থামিল; সকলেই মাটিতে

লুটাইয়া দেবীকে প্রণাম করিলেন এবং দেবীর প্রণামের মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। এক এক করিয়া সকলেই উঠিল, কর্ত্তার মন্ত্রও শেষ হয় না, প্রণামও শেষ হয় না, তিনি উঠেনও না। তাঁহার যেন ভাব লাগিয়াছে। অনেক পরে তিনি উঠিলেন। আরতির পর্ব্ব শেষ হইল। এখন দেবীর বৈকালির আয়োজন।

এই যে আরতির মুহূর্ত্ত, যে মুহূর্ত্তে যতলোক উপস্থিত, সকলেরই মনে অন্য কোন চিন্তা নাই, কেবল মহামায়ার চিন্তা, আত্মহারা হইয়া—আত্ম-পর-জ্ঞান শূন্য হইয়া—কল্পনার অতীত মহামায়াকে আত্ম-সমর্পণের মহামুহূর্ত্ত—এ বড় গম্ভীর মুহূর্ত্ত। এ মুহূর্ত্তে শোক-তাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা, ঈর্ষ্যা-দ্বেষ, অন্ততঃ এক দণ্ডের জন্যও, অন্তরিত হয়—এজন্য এ বড় মধুর মুহূর্ত্ত। বৎসরে একদিনের জন্যও যদি এ মুহূর্ত্ত ফিরিয়া আসে, লোকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও, পৃথিবীতে স্বর্গসুখ অনুভব করে।

এক বছর, অষ্টমী পূজার রাত্রি, পরদিন সাতটার পূর্ব্বেই সন্ধি-পূজা করিতে হইবে। বাড়ীর কর্ত্তা সমস্তদিন নিমন্ত্রিত ইতর ভদ্র সকলেরই আদর-অভ্যর্থনা, খাওয়ান-দাওয়ান ইত্যাদিতে ক্লান্ত হইয়া, রাত্রি ১টার পর সব নিস্তব্ধ হইলে, সদর দরজাটি বন্ধ করিয়া সিঁড়ী দিয়া শুইবার ঘরে যাইতেছেন; শুনিলেন দুইজনে কথাবার্ত্তা করি-তেছে, দুটিই স্ত্রীলোক। এতরাত্রিতে এবাড়ীতে কে কথাবর্ত্তা কয়—জানিবার জন্য কর্ত্তা নামিয়া আসিলেন; দেখিলেন দালানের এক কোণে বসিয়া গৃহিণী স্বহস্তে কোষা-কুষী, পুষ্পপাত্র, তাম্রকুণ্ড মাজি-তেছেন। এ কাজটি আর কাহারও মনে পড়ে নাই। কিছু পরেই সন্ধিপূজার জন্য এসব চাই; তাই গৃহিণী নিজেই মাজাঘষা আরম্ভ করিয়াছেন, আর প্রতিমার মুখপানে চাহিয়া যেন তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন। কর্ত্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ও গিন্নী, কা'র সঙ্গে কথা কহিতেছ?"

গিন্নী। "কেন, জান না? যাঁ'কে তুমি এত এরেবরে বাড়ীতে আনিয়াছ?"

কর্ত্তা। 'তিনি কে ?'

গিন্নী। "জান না ? ঐ দেখ ! দালান আলো করিয়া বসিয়া আছেন। তুমি ত একবার দালানে উঠিলেও না। তাই আমি মাকে বলিতেছি যে তাঁ'র কাছে ত আমাদের সবই অপরাধ। তিনি যেন আমাদের সে সব অপরাধ না লয়েন। আর ক্ষমা ঘৃণা করিয়া তিনি যেন বছর বছর এমনই করিয়া আসেন।"

কর্ত্তা। (একটু লজ্জিত হইয়া) "কি করি গিন্নী ? অনেকগুলি ভদ্র লোক পায়ের ধূলা দিয়াছিলেন। তাঁ'দের আদর অভ্যর্থনা করাও ত আমার কাজ। তা'তেই বড় ব্যস্ত ছিলাম। এদিকে একবারও আসিতে পারি নাই।"

গিন্নী। "তুমি ত বাবু-ভাইদের লইয়াই ব্যস্ত। কিন্তু তুমি কি জান না কাঁ'কে তুমি বাড়ীতে লইয়া আসিয়াছ ? তাঁ'র চেয়ে বড় কে আছে ? তুমি তাঁর দিকে একবার চাইলে না ! বাবুদের লইয়াই মাতিয়া রহিলে ! উনি কি আর তোমার বাড়ী এমন করিয়া আসিবেন মনে করিয়াছ ?"

কর্ত্তা অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেলেন। গৃহিণী কিন্তু সারারাতটি কেবল মহামায়ার কাছেই এই কথাই বলিতে লাগিলেন, "মা, আমাদের অপরাধ লইও না। আবার যেন এস।"

আজ বিজয়া। প্রতিমা দালান হইতে উঠানে নামিয়াছেন। আজ আর পুরোহিত নাই ; বাজে লোক নাই ; শুদ্ধ বাড়ীর মেয়ে ছেলে, ও নিতান্ত আত্মীয়স্বজনের মেয়ে ছেলে। পুরুষেরা উঠান ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। গিন্নী নূতন কাপড় পরিয়া, বরণডালা মাথায়, উপস্থিত হইলেন ; সঙ্গে মেয়ে, বৌ, বাড়ীর আর আর মেয়েছেলে। সকলে আসিয়া মাকে নমস্কার করিলেন। অধিবাসের যত জিনিস ছিল, গিন্নী সকলগুলিই এক এক করিয়া মাএর মাথায় ছোঁয়াইয়া বরণডালায় রাখিতেছেন ; এক একবার ছোঁয়াইতেছেন আর তাঁহার চোখ্ ফাটিয়া জল পড়িতেছে। ক্রমে সব মেয়েদেরই চোখে জল

আসিল। পুরুষেরাও আর থাকিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া ফেলিলেন। অন্য সময় এ দুর্ব্বলতাটুকু যাঁহারা দেখাইতে চা'ন না, এখন তাঁহাদের সে ভাব রহিল না। কারণ, এ শোকে লজ্জা নাই। বরণ আরম্ভ হইল। বিশ ত্রিশ জন স্ত্রীলোক মহামায়াকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন, একবার, দুইবার, তিনবার, ক্রমে সাতবার প্রদক্ষিণ হইল। তাহার পর সকলে গলায় বস্ত্র দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া নমস্কার করিলেন। পরে কর্ত্তা এক পূর্ণপাত্র আনিয়া প্রতিমার সম্মুখ হইতে—গৃহিণী প্রতিমার পিছনে দাঁড়াইয়াছিলেন—তাঁহার অঞ্চলে ঢালিয়া দিলেন। গৃহিণী এই 'কনকাঞ্জলি' লইয়া সম্বৎসর মায়ের শোক নিবারণ করিবেন।

এ সব ত হইয়া গেল। তাহার পর কিছু মিষ্টান্ন আসিল। গৃহিণী একটি মিষ্টান্ন লইয়া মায়ের মুখে দিলেন, আর একটি মায়ের হাতে দিলেন। এইরূপে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ সকলকেই মিষ্টান্ন খাওয়ান হইল, ও পথের সম্বল স্বরূপ কিছু হাতেও দেওয়া হইল। ইহার পর বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিয়া উঠিল!!!

এই দুর্গোৎসবের ব্যাপারটা কি? হৈমবতী বিবাহের পর মহাদেবের সঙ্গে কৈলাসে চলিয়া গিয়াছেন। মেনকা ক্রমাগত গিরিরাজকে মেয়ে আনিবার জন্য জিদ্ করিতেছেন। শেষে, গিরিরাজ কৈলাসে লোক পাঠাইলেন, অনেক কষ্টে মহাদেব, পার্ব্বতীকে তিন দিনের জন্য ছাড়িয়া দিবেন, স্বীকার করিলেন। যে তিন দিন হৈমবতী গিরিরাজের বাড়ীতে ছিলেন, সেই তিন দিন গিরিরাজপুরে মহামহোৎসব হইল। তাহার পর দশমীর দিন হৈমবতী পুনরায় কৈলাসে ফিরিয়া গেলেন। এখন বুঝিলেন, দুর্গোৎসবের ব্যাপারটি মেয়ে আনা ও মেয়ে বিদায়ের ব্যাপার। কর্ত্তা স্বয়ং গিরিরাজ, গৃহিণী স্বয়ং মেনকা, আর মহামায়া তাঁহাদের কন্যা। মেয়ে বিদায়ের ব্যাপার যে দেখিয়াছে, যে ভুগিয়াছে, সেই 'বিজয়া'র অর্থ গ্রহণ করিতে পারে। ভক্তরা বলেন, বিজয়ার সময় মহামায়ারও চোখের কোণে জল দেখা যায়। ভালবাসা ত শুধু বাপমায়ের নয়, মেয়েরও ত ভাল-

বাসা আছে। যখন বাড়ীশুদ্ধ সকলেই কাঁদিয়া আকুল, মহামায়া কি তা দেখিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারেন? তাঁহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হয়।

নদীতে হউক, পুষ্করিণীতে হউক, হ্রদে হউক, বিলে হউক, মাএর বিসর্জ্জন হইয়া গেল। জগৎকারণ যে মাটি, সেই মাটি হইতেই মহামায়ার মূর্ত্তি গড়া হইয়াছিল, মাটিরই সাজসজ্জায় তাঁহাকে সাজান হইয়াছিল। যিনিই মাটি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনিই মাটির মূর্ত্তিতে আসিয়া অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাকে সজীব করিয়াছিলেন, তাহাকে 'পরা শক্তি' করিয়াছিলেন, তাহাকে সকলের চেয়ে বড় করিয়াছিলেন—এখন তিনি আর নাই—যে মাটি সে আবার মাটিই হইয়া গেল, জলে মিশিয়া গেল। যতলোক দেখিতে আসিয়াছিল, এ ব্যাপার সকলেই স্বচক্ষে দেখিল। শোকে, ক্ষোভে, দুঃখে, আপন আপন ঘরে ফিরিল। যাহার দালানে দুর্গা আসিয়াছিলেন, তাহার কথা ত দূরে যাউক, দেশশুদ্ধ লোক দেখিতে লাগিল—সব শূন্য!! সবাই শূন্য মনে বাড়ী ফিরিল!!! তাহারা এতক্ষণ যে এক অমানুষ শক্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছিল, সে শক্তির আজ অন্তর্দ্ধান হইয়াছে; তাই তাহাদের আবার আত্মীয়-স্বজন মনে পড়িয়াছে—মনে পড়িয়াছে এ শক্তি ক্ষণকাল আমাদের নিকটে আসিলেও আমরা এ শক্তি হইতে ভিন্ন, এ শক্তির অনেক নীচে, এখন আমাদের যাহা আছে, যাহা লইয়া আমাদের ঘর করিতে হইবে, যাহা লইয়া আমাদের চিরদিন থাকিতে হইবে, তাহাদের সম্মান, সম্ভাষণ, পূজা করাই আমাদের আবশ্যক। তাই ছেলে আসিয়া বাপের পায়ে গড়াইয়া পড়িল, বাপ তা'কে কোলে লইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, তাহার মস্তকের ঘ্রাণ লইতে লাগিলেন। ছোট ভাই বড় ভাইএর পায়ে লুটাইয়া পড়িল, বড় ভাই তাঁহাকে কোল দিলেন। যাহার সহিত যেরূপ সম্পর্ক, সকলেই পরস্পর সম্মান ও সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। যিনি সকল সম্পর্কের অতীত,

তিনি যতদিন উপস্থিত ছিলেন, ততদিন এ সকল পার্থিব সম্পর্ক তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল। এখন আবার সে সম্পর্ক জাগিয়া নূতন হইয়া উঠিল। গৃহিণী শূন্য দালানে আসিয়া সব শূন্যময় দেখিলেন, তিনি একেবারে বসিয়া পড়িলেন, কাঁদিয়া ত আকুল। কর্ত্তারও অবস্থা তাই। তবে তিনি পুরুষ। তিনি গৃহিণীকে প্রবোধ দিলেন, বলিলেন, "ভয় কি? মা আবার এক বৎসর পরে আসিবেন।" সেই আশায় বুক বাঁধিয়া, সকলে আবার সংসার-ধর্ম্মে মন দিল।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

মাতৃ-পূজা

দুর্গোৎসবের স্মৃতি।

ছেলে-বেলা দুর্গোৎসব করিয়াছি এক ভাবে। হিন্দুর ঘরে জন্মিয়া, মানুষ ছাড়া, মানুষের উপরে, অদৃশ্য দেবতারা আছেন; এই বিশ্বাস রক্তমাংসের সঙ্গে জড়িত ছিল। তখনও কোনও সন্দেহ, কোনও জিজ্ঞাসা জাগে নাই। কোমল-শ্রদ্ধাভরে যাহা শুনিতাম, তাহাই বিশ্বাস করিতাম। আর দুর্গামূর্ত্তিটিও বড় মিষ্ট লাগিত। মুখে যেন তার হাসি লাগিয়াই আছে। সন্ধ্যা-আরতির সময় সুগন্ধি ধূপের ধূমে যখন চণ্ডীমণ্ডপ আচ্ছন্ন হইত, সেই ধূঁয়ার ভিতর দিয়া দুর্গাপ্রতিমাকে বাস্তবিক যেন সজীব বলিয়া মনে হইত। বিজয়ার দিন মনে হইত, আমাদের মনের বিষাদে যেন দুর্গার মুখখানিও ম্লান হইয়া গিয়াছে। তারপর পুরোহিতেই দেবতার কাছে বসিয়া তাঁর পূজা করিতেন বটে, কিন্তু আমরাও আপন আপন অধিকারে

থাকিয়া সে পূজার সাহচর্য্য করিতাম। ফুল তুলিয়া আনিতাম, বিল্ব-পত্র বাছিয়া দিতাম, আরতির সময় দাঁড়াইয়া কাঁসরঘণ্টাদি বাজাই-তাম। চক্ষু দিয়া দেবতার রূপ দেখিতাম, কাণ দিয়া পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ ও চণ্ডীপাঠ শুনিতাম, হাত দিয়া পুষ্প-চয়ন ও বিল্বপত্র শোধন করিয়া দিতাম, রসনায় প্রসাদ-ভক্ষণ করিতাম,—এইরূপে পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা দেবতার পূজার সাথী হইতাম। সে-পূজার সঙ্গে বড় মাখামাখি ছিল। প্রতিমা যে মাটির ইহা দেখিতাম, কিন্তু মাটি ছাড়া যে তাহাতে আর কিছু নাই, এ সন্দেহও তখন মনে জাগিত না। এইভাবে এই প্রতিমার সঙ্গে অতি নিকট সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিত। বিসর্জ্জনের কালেও কি জানি কোনও কারণে তার অঙ্গহানী হয়, এই ভাবিয়া অস্থির হইতাম। আর প্রতিমা-বিসর্জ্জন করিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বাড়ী ফিরিতাম। সে-সকল কথা মনে হইলে, এখনও প্রাণটা কেমন করিয়া উঠে। ঐ শৈশব স্মৃতির জন্যই মনে হয়, এখনও শরতের সূর্য্য, শরতের চন্দ্র, শরতের বায়ু, শরতের প্রকৃতির ছবি এমন মধুর লাগে!

প্রতিমা-পূজার প্রতিবাদ।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে, বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে, শৈশবের কোমল শ্রদ্ধা নষ্ট হইল। ভালই হইল। তার জন্য দুঃখ করি না। সে কোমল শ্রদ্ধা আবার ফিরিয়া পাইতেও চাহি না। বিচার জাগিয়া পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া দিল। এই ভাঙ্গাটা নূতন করিয়া গঠনের জন্য আবশ্যক ছিল। গতানুগতিক বিশ্বাস যার একবার ভাঙ্গিয়া না যায়, সে কদাচিৎ সত্যের প্রত্যক্ষলাভ করিতে পারে। এই ভাঙ্গার মুখে বুঝিলাম, প্রতিমাতে ঈশ্বর-বুদ্ধি অসত্য। শুনিলাম, ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ। যিনি একথা লিখিয়াছিলেন, তিনি ইহার সকল মর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন কি না, জানি না। আমরা সে-বয়সে তার কিছুই বুঝি নাই। আকার চক্ষে দেখা যায়; আকারের ধর্ম্মই

আয়তনের সৃষ্টি করা। আয়তনের ধর্ম্মই বস্তুকে সীমাবদ্ধ করা। এইজন্য অসীম ও অনন্তের আকার নাই, আকার থাকিতে পারে না। এ সকল কথা মোটামোটি বুঝিলাম। আর এই স্থূল বুদ্ধিতেই স্থূল প্রতিমাপূজাদি পরিহার করিলাম।

বাহ্যপূজা ও মানসপূজা।

কিন্তু দেবতাদিগকে যেমন অনুভূতি দিয়া সাক্ষাৎভাবে ধরিতে পারি নাই; এই নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ ঈশ্বরকেও সেইরূপ অপরোক্ষ অনুভূতির দ্বারা প্রত্যক্ষ করিলাম না। জড় প্রতিমার পূজা ছাড়িয়া মানস-প্রতিমার পূজা আরম্ভ করিলাম। বাহ্যপূজা অপেক্ষা মানসপূজা শ্রেষ্ঠ—একথা সকলেই কহিয়াছেন। আমাদের দেশের জ্ঞানী এবং ভক্তেরাও একথা বারম্বার কহিয়াছেন। কিন্তু বাহ্যপূজা এবং মানসপূজা উভয়ই সকাম হইতে পারে। শক্তি-উপাসক দুর্গা কালী প্রভৃতির সমক্ষে দাঁড়াইয়া—রূপ চান, ধন চান, যশ চান, পুত্র চান, এক কথায় সংসারের সুখসম্পদ ভিক্ষা করেন। আর আধুনিক ব্রহ্মোপাসকও আপনার মনোমত বর প্রার্থনা করিয়া থাকেন। সাংসারিক সম্পদের জন্য কামনাও কামনা, অধ্যাত্মসম্পদের জন্য কামনাও কামনা। উভয়বিধ কামনা-মূলক উপাসনাই সকাম। দেবোপাসনা ছাড়িয়াও সকামপূজা ছাড়িলাম না, ছাড়িতে পারিলাম না। প্রার্থনা ত মুখের কথা নহে। প্রাণের গভীরতম, ব্যাকুলতম আকাঙ্ক্ষা ও আর্ত্তনাদই সত্য প্রার্থনা। আর যে যাহা ব্যাকুল হইয়া চায়, তারই জন্য সে প্রার্থনা করে। যে যে-বস্তুর অভাব বোধ করে, আত্মশক্তিতে যে-ঈপ্সিত লাভ অসাধ্য বলিয়া বুঝে, তারই জন্য আপনার ইষ্টদেবতার চরণে বর ভিক্ষা করে। বিষয় চায় বিষয়ী, ভোগ চায় ভোগী, মুক্তি চায় মুমুক্ষু। দেবতায় ঈশ্বরবুদ্ধি নষ্ট হইলেই মানুষ মুমুক্ষু হয় না। দেবোপাসকেরাও মুমুক্ষু হইতে পারেন, আমরা যেরূপ ব্রহ্মোপাসক, আমাদের মতন

বহু বহু লোকে সেইরূপ ব্রহ্মোপাসকের অভিমান করিয়াও মুমুক্ষুত্ব লাভ না করিতে পারেন। এই মুমুক্ষুত্ব অতি দুর্ল্লভ বস্তু। বিবেক বৈরাগ্যাদি সাধনের দ্বারা ইহসংসারের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ রূপরসাদি সম্বন্ধে অনিত্য ও অসারবুদ্ধি দৃঢ় হইলে, নিত্যবস্তু ও সারসম্পদের জন্য প্রাণ অস্থির হইয়া জীবকে মুক্তিপিয়াসু বা মুমুক্ষু করে। এই বুদ্ধি যার দৃঢ় হয় নাই, অর্থাৎ মুমুক্ষু যে নয়, সে মুক্তির জন্য সত্য প্রার্থনা করিতে পারে না। আমরা ভগবানের নিকটে যশ না চাহিতে পারি, কিন্তু সম্ভাবিত কুযশের ভাবনায় অধীর হইয়া, অবমাননা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রার্থনা করি। আর "যশো দেহি" বলা যা', "লজ্জানিবারণ করিও" বলাও তাহাই। আমরা পুত্র চাই না, কারণ পুত্র যে কি বস্তু তাহা ভাল করিয়া বুঝি না। কিন্তু পুত্র পাইলে সে বাঁচিয়া থাকুক, ভাল হউক, এ প্রার্থনা ত করি। এইরূপে তলাইয়া দেখিলে শক্তি-উপাসক আপনার ইষ্টদেবতার নিকটে যাহা কিছু চান, আমরা পাকে প্রকারে আমাদের উপাস্যের নিকটেও তাহাই চাই। তাঁদের দেবোপাসনা যেমন সকাম, আমাদের এই ব্রহ্মোপাসনাও সেইরূপই সকাম। পূর্ব্বকার বাহ্য পূজাতে আর পরবর্ত্তী সংস্কৃত মানসপূজাতে এবিষয়ে কোনও পার্থক্য ঘটিল না। আর তখন বুঝি নাই, এখন বুঝিয়াছি, প্রতিমাপূজা মাত্রেই যে বাহ্যপূজা তাহাও ত নহে। যে পূজার সঙ্গে অন্তরের অনুভূতির যোগ নাই, ধ্যানের দ্বারা যাহা পুষ্ট হয় না, কেবল যন্ত্রারূঢ়ের মতন কতকগুলি বাহিরের ক্রিয়াকর্ম্মই যে পূজার সকলটা, তাহাই বাহ্যপূজা। মন্ত্রের অর্থবোধ নাই, মন্ত্রার্থের অনুভূতি নাই, কর্ম্মের সঙ্গে ধ্যানের ও ভাবের যোগ নাই, টীয়া পাখীর মতন মন্ত্র আওড়াইয়া যাইতেছি, কলের পুতুলের মতন অঞ্জলি পুরিয়া দেবতার চরণে ফুল বেলপাতা ফেলিয়া দিতেছি—ইহাই ত বাহ্যপূজা। কিন্তু নিরাকার ব্রহ্মের পূজাও এইরূপ বাহ্য-পূজা হইতে পারে। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" মুখে বলিতেছি কিন্তু

প্রাণে সত্যের, জ্ঞানের অনন্তের কোনও কিছুর জীবন্ত অনুভূতি নাই, শব্দের উপর শব্দ, পদের উপর পদ, বাক্যের উপর বাক্য, উপমার উপর উপমা, অলঙ্কারের উপর অলঙ্কার চাপাইয়া আরাধনা করিতেছি, অথচ অন্তরে কোনও প্রত্যক্ষ ধারণা নাই,—এও ত বাহ্য-পূজা। দেবোপাসনার মতন এই তথাকথিত ব্রহ্মোপাসনাও ত—"ধমাধমা।" যেমন সাকারোপাসনায় সেইরূপ নিরাকারোপাসনাতেও এই বাহ্যপূজার সমান আশঙ্কা ও অবসর আছে। এইজন্যই দেবতায় বিশ্বাস হারাইলাম, কিন্তু সকাম উপাসনা অতিক্রম করিতে পারিলাম না, সত্য মানসপূজার অধিকারই যে সম্পূর্ণ পাইলাম তাহাও নহে।

এইরূপে প্রতিমা-পূজা ছাড়িলাম, কিন্তু বাহ্যপূজার আশঙ্কার নিঃশেষ নির্বৃত্তি হইল না। আর ক্রমে, ভগবৎ-প্রসাদাৎ, গুরু-কৃপায় বাক্যের মোহ যত কাটিতে আরম্ভ করিল, প্রার্থনা যত থামিয়া আসিতে লাগিল,—"তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক!"—যখন সকল প্রার্থনার সেরা প্রার্থনা হইল, সাকারে নিরাকারে একাকার হইয়া যত ভগবানের বিশ্বরূপ প্রকাশিত হইতে লাগিল, তত পুরাতন প্রতিমা-পূজারও নূতন মর্ম্ম বুঝিতে লাগিলাম। তখন বুঝিলাম সাকার ও নিরাকার দু'এর কিছুই সম্পূর্ণ ও চরম সত্য নহে। তত্ত্ববস্তু, ব্রহ্মবস্তু প্রচলিত অর্থে সাকারও নহে, প্রচলিত অর্থে নিরাকারও নহে। প্রচলিত অর্থে যাহা সাকার তাহা জড়, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। যাহা নিরাকার, সাধারণ লোকের মানস-অভিজ্ঞতাতে তাহা শূন্য, কিম্বা ভাব বা idea মাত্র। সাকার স্থূল বা gross; নিরাকার সূক্ষ্ম বা abstract। আমাদের সাধারণ মানস-ক্ষেত্রে যাহা সাকার ও নিরাকার রূপে প্রকাশিত হয়, ব্রহ্মবস্তু বা তত্ত্ববস্তু, তাহার কিছুই নহে। আমাদের অনুভূতির অভিধানে ব্রহ্মকে আমরা সাকারও বলিতে পারি না, নিরাকারও বলিতে পারি না। তিনি সাকার নহেন, অথচ সকল আকারকে প্রকাশ করিয়া, সকল

আকারকে ধারণ করিয়া আবার সকল আকারকে অতিক্রম করিয়া আছেন। তিনি নিরাকার বটেন অথচ শূন্য নহেন। এইটি যে-দিন হইতে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি, সে-দিন হইতে আমাদের দেশের পুরাতন ও প্রচলিত পূজাপদ্ধতিকেও নূতন চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি।

প্রতিমা-পূজার অধিকার।

প্রতিমা-পূজা করি বা না করি, ইহা যে নিম্ন-অধিকারীর জন্য বিহিত হইয়াছে, একথা আর বিশ্বাস করিতে পারি না। ধর্ম্মের বিকাশে ও তত্ত্বের ইতিহাসে মোটের উপরে তিনটি স্তর দেখিতে পাই। প্রথম স্তরে আত্মানাত্মবিবেক জন্মে নাই, অতীন্দ্রিয়ের অনুভূতি ভাল করিয়া ফুটে নাই, আত্মা ও অনাত্মায়, ইন্দ্রিয়ে ও অতীন্দ্রিয়ে জড়াজড়ি করিয়া থাকে। শিশুদের মধ্যে এই ভাবটি দেখিতে পাই। তারা বিশ্বের সকল পদার্থকেই সচেতন ও নিজেদের মতন রাগদ্বেষাদি-সম্পন্ন মনে করে। শিশু হুঁচট খাইলে, মাটিতে লাথি মারে; 'পবন আয়, পবন আয়' বলিয়া হাতে ঘুড়ীর সূতা ধরিয়া আকুল হইয়া ডাকে; চাঁদ দেখিয়া তাহাকে হাত ছানি দিয়া নিকটে ডাকিয়া আনিতে চাহে। শিশুর চক্ষে বিশ্ব সচেতন, সকলই তার মতন। আর সমাজের শৈশবে মানুষের উপাস্যও সকলই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ। বেদের ইন্দ্র-বরুণাদি সকলই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ ছিলেন। চর্ম্মচক্ষু দিয়াই লোকে এই সকল দেবতাকে দেখিত। ক্রমে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জগতের যাবতীয় পদার্থ সচেতন ও অচেতন এই দুইভাগে বিভক্ত হইল। এই চৈতন্যের সন্ধানে যাইয়া মানুষ এক অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত চিদ্‌রাজ্যে উপস্থিত হইল। এই স্তরে তার ধর্ম্ম ও উপাস্য একান্ত অন্তর্মুখীন হইয়া পড়িল। এই অন্তর্মুখীন বা একান্ত subjective স্তরের ধর্ম্মই আমাদের প্রাচীন উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মসাধন

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এই স্তরের মূল মন্ত্র—নেতি, নেতি, যাহা চক্ষে দেখি তাহা ব্রহ্ম নহে, যাহা কাণে শুনি তাহা ব্রহ্ম নহে। এই ব্যতিরেকী উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে একটা অন্বয়-ধারাও চলিল। প্রাচীন উপনিষদ ব্যতিরেকী ও অন্বয়ী এই উভয় ধারা মিশ্রিত উপাসনার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কেনোপনিষদে এই তত্ত্বটি অতি পরিস্ফুট হইয়াছে।

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনো
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ

সেখানে এই চক্ষু যায় না, এই বাক্য যায় না, এই মনও যায় না। আমরা তাহাকে জানি না, কিরূপে তাহার উপদেশ দিতে হয় তাহাও জানি না।

অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি

যাহা কিছু আমরা প্রত্যক্ষ করি, তিনি তাহা হইতে ভিন্ন, আমরা যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করি না, তিনিই তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ। তবে ইন্দ্রিয়াতীত হইয়াও তিনি এসকল ইন্দ্রিয়ের প্রেরয়িতা—তাঁহারই শক্তিতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় জগতের যাবতীয় রূপরসাদি প্রত্যক্ষ করে।

যদ্বাগানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।
যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতম্‌
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।
যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।

বাক্যের দ্বারা যিনি প্রকাশিত হন না, কিন্তু যাহার দ্বারা বাক্য প্রকাশিত হয়; মনের দ্বারা যিনি গৃহীত হন না, কিন্তু যিনি মনকে মনন করেন; চক্ষুদ্বারা যাহাকে দেখা যায় না, কিন্তু যাহার শক্তিতে চক্ষু দেখে;—তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান। বাক্য, মন, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যেসকল বস্তুকে প্রাপ্ত হয়, তাহা ব্রহ্ম নহে। এই স্তরে

এইভাবে পরমতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব কেবল অন্তরের ধ্যানগম্য ও সমাধিলভ্য হইয়া পড়েন। তাঁর স্বরূপ-উপলব্ধি করিতে হইলে তখন সকল প্রকারের ইন্দ্রিয়-চেষ্টাকে একান্তভাবে নিরোধ করিয়া আত্মস্বরূপে বা শুদ্ধ দ্রষ্টাস্বরূপে অবস্থান করিতে হয়। এই সমাধির অবস্থা অতি উচ্চ অবস্থা; শ্রেষ্ঠতম অধিকারী ব্যতীত কেহ এ অবস্থালাভ করিতে পারেন না। এই স্তরের সাধ্য কৈবল্য, উপাস্য বা ধ্যেয় নির্গুণ ব্রহ্ম।

সম্পদুপাসনা ও প্রতীকোপাসনা।

এই স্তরে এই সমাধিগ্রাহ্য স্বরূপোপাসনার সঙ্গে সঙ্গে, সাধকের মানসকল্পনাকে আশ্রয় করিয়া সম্পদুপাসনা এবং প্রতীকোপাসনারও প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। স্বরূপোপাসনায় যাহারা অনধিকারী, তাহারা সম্পদুপাসনা ও সম্পদুপাসনায় পর্য্যন্ত যাদের অধিকার জন্মে নাই, তাহারা প্রতীকোপাসনা করিয়া থাকে। সূর্য্যোপাসনা, প্রাণোপাসনা, মনোপাসনা,—এসকল সম্পদুপাসনা। সূর্য্য, প্রাণ, মন এ সকলের সঙ্গে ব্রহ্মবস্তুর কতকটা গুণ-সামান্য আছে। ব্রহ্মবস্তু জ্ঞানবস্তু. ব্রহ্মের জ্ঞানেতে জগতের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা। ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ ও বিশ্বপ্রকাশক; আপনাকে প্রকাশিত করিতে যাইয়া বিশ্বকে প্রকাশিত করিয়াছেন, বিশ্বকে প্রকাশিত করিতে যাইয়া আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছেন। এই নৈসর্গিক সূর্য্যও সেইরূপ আপনাকে প্রকাশ করিয়া জগৎকে প্রকাশিত করে, জগৎকে প্রকাশিত করিতে যাইয়াই আপনাকেও প্রকাশিত করে। সূর্য্যেতে ও ব্রহ্মেতে এই সামান্য-ধর্ম্ম আছে। এই সামান্য ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, অন্তরে ব্রহ্মের অতীন্দ্রিয় চিন্ময় প্রকাশ ভাবিয়া এই প্রত্যক্ষ সূর্য্যের ধ্যান করা—সম্পদুপাসনা। উপাসক এখানে সূর্য্যের বাহিরের আকারাদির, রূপাদির বা অন্য জড়ধর্ম্মাদির প্রতি লক্ষ্য করেন না, কিন্তু তাহার জগৎ-প্রকাশকত্ব ও স্বপ্রকাশত্ব ধর্ম্মের প্রতিই মনোনিবেশ করেন ও এই সূর্য্যের প্রত্যক্ষ জগৎপ্রকাশকত্ব ও স্বপ্রকাশত্বকে আপনার মননের বিষয়

করিয়া, ইহার আশ্রয়ে অপ্রত্যক্ষ ও অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্ম-অনুভূতিগ্রাহ্য ব্রহ্মস্বরূপের চিন্তা করিতে চেষ্টা করেন। এইরূপে সাধক আপনার প্রাণবস্তুকে মননের বিষয় করিয়া, কিম্বা আপনার অন্তরীন্দ্রিয় মনকে মননের বিষয় করিয়া, ব্রহ্মের বিশ্বপ্রাণতা ও বিশ্ব চিন্তামণি-স্বরূপ ধ্যান করিতে চেষ্টা করিতে পারেন। এইগুলিই সম্পদুপাসনার পথ। এইপথে চলিয়া ক্রমে স্বরূপ-উপাসনার ক্ষমতালাভ করা যাইতে পারে। স্বরূপোপাসনার ন্যায় এই সম্পদুপাসনাও ধর্ম্ম-বিকাশের মধ্যমস্তরের কথা। এই সম্পদুপাসনার অবলম্বন কেবল শাস্ত্র বা শ্রুতি নহে কিন্তু শাস্ত্র বা শ্রুতি এবং বিচার। এই সম্পদুপাসনার সাধন কেবল শ্রবণ নহে, কিন্তু শ্রবণ এবং মনন দুই। কেবল শ্রদ্ধার অর্থাৎ গুরুশাস্ত্রবাক্যে সত্যবুদ্ধির দ্বারা এই সম্পদুপাসনার অধিকার জন্মে না। বিচার-শক্তি, আপনাপন প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে নিঃশেষে বিশ্লেষণ করিবার এবং তাহার রহস্য ও তথ্য বুঝিবার ক্ষমতাও থাকা আবশ্যক। এখানে কেবল বিশ্বাসের বা শ্রদ্ধার দোহাই দিলে চলে না। এই স্তরে শ্রদ্ধা থাকা চাই, গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে আস্থা থাকা আবশ্যক, এই বিশ্বাসই ধর্ম্মের নহে কিন্তু সাধনের মূল। কিন্তু এখানকার প্রধান উপদেশ—পরীক্ষা। গুরু মানিবে, শাস্ত্র মানিবে কিন্তু সকলের উপরে নিজের অনুভূতিকে প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিবে। এখানকার উপদেশ—

"যাহা না দেখ আপন নয়নে।
তাহা না মান গুরুর বচনে॥"

এই স্তরেই আবার নিম্নতম অধিকারীর জন্য প্রতীকোপাসনারও ব্যবস্থা আছে। স্বরূপোপাসনায় সম্পূর্ণ সত্যকে লাভ করে। সম্পদুপাসনা এই সত্যের একদেশমাত্র গ্রহণ করে। প্রতীকোপাসনায় নিভাজ মিথ্যাকে আশ্রয় করে। এইজন্য প্রতীকোপাসনাকে অধ্যাসজনিত উপাসনা কহিয়াছেন। অধ্যাস অর্থ—অন্যত্র দৃষ্টঃ পরত্রাবভাসঃ। একস্থানে যে-বস্তুর প্রত্যক্ষ হইয়াছে, অন্যস্থানে যেখানে বস্তুতঃ তাহা

নাই, সেখানে তাহার অস্তিত্ব কল্পনা করার নাম অধ্যাস। জঙ্গলে সাপ দেখিয়াছি, ঘরের মেঝেয় দড়ী পড়িয়া আছে, সাপ নহে; আর এই দড়ীগাছকে পূর্ব্বদৃষ্ট সাপ বলিয়া মনে করা অধ্যাসের কার্য্য। অন্তরে অপরোক্ষানুভূতিতে যে ব্রহ্মবস্তুর সাক্ষাৎকার লাভ হয়, বাহিরের কোনও পদার্থে তার অস্তিত্ব আরোপ করা অধ্যাস। যেখানে যে-বস্তু বাস্তবিক জ্ঞানগোচর হয় না, সেখানে সে-বস্তুর অবস্থিতি আরোপ করা অধ্যাস। জ্ঞানমাত্রেই বস্তুতন্ত্র, বস্তুর অধীন, বস্তুসাক্ষাৎকারে উৎপন্ন হয়। প্রস্তরে বা মৃৎপিণ্ডে স্বতঃ ব্রহ্ম-প্রেরণা সাধারণ লোকের হয় না। ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হইবার পরে, সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্মময়ং জগৎ—এই ধারণা সাধনবলে বদ্ধমূল হইয়া গেলে, প্রতীকের মধ্যেও সাধু মহাপুরুষদিগের অন্তরে ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি হইতে পারে, হইয়া থাকে। এরূপ ব্রহ্মস্ফূর্ত্তিতে তাঁহারা যে প্রতীকের সমক্ষে ভাবে বিভোর হইয়া অর্চ্চনাবন্দনাদি করেন, তাহাতে কোনও প্রকারের অধ্যাস নাই। এরূপ প্রতীকোপাসনা সত্য ব্রহ্মোপাসনাই হয়, অধ্যাসজনিত মিথ্যা কল্পনার উপাসনা হয় না। কিন্তু এই প্রতীকোপাসনার অধিকারী সকলে হয় না। শ্রেষ্ঠতম সিদ্ধ মহাপুরুষদিগেরই কেবল এই অধিকার আছে। আর তাঁহারাও অনবচ্ছিন্নভাবে সর্ব্বদাই এরূপ প্রতীকের মধ্যে ব্রহ্মোপলব্ধি করেন না। ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি হয় তাঁহাদের অন্তরে। অন্তরের ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি নিবন্ধন বিশ্ব তখন তাঁহাদের চক্ষে ব্রহ্মময় হয়। যে-খানেই তাঁহারা মানুষকে কোনও বস্তুর আরাধনা করিতে দেখেন, সে-খানেই ভাব-যোগ বশতঃ বা association বা ideas'এর বলে, তাঁহাদের প্রাণের মধ্যে আরাধনার ভাব জাগিয়া তাঁহাদের আরাধ্য দেবতার প্রত্যক্ষ অনুভূতি জাগাইয়া তুলে। এই ভাবেই এই সকল সিদ্ধ মহাপুরুষেরা এই সকল প্রতীকেতে ব্রহ্মোপলব্ধি বা ঈশ্বরোপলব্ধি করিয়া ভাবে বিভোর হইয়া পড়েন। যখন এরূপ ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি তাঁহাদের হয়, তখন তাঁহাদের এই সকল প্রতীকে ব্রহ্ম-

জ্ঞান আর কল্পিত থাকে না, সত্য হইয়া যায়। কারণ তখন ভগবদ্‌ভাবে তন্ময় সাধক—

স্থাবর জঙ্গম দেখে, দেখে না তার মূর্ত্তি।
যাঁহা নেত্র পড়ে হয় ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি।

কিন্তু যাঁহাদের এই তন্ময়তা জন্মে না, যাঁহারা অন্তরের অপরোক্ষ অনুভূতিতে ভগবদ্‌সাক্ষাৎকারলাভ করেন নাই, তাঁহাদের নিকটে প্রতীকোপাসনা অধ্যাসজনিত মিথ্যা উপাসনা মাত্র।

প্রতীকোপাসনার অধিকার।

ফলতঃ অধ্যাসের প্রকৃত অর্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, এই প্রতীকোপাসনার অধিকারই যে সকলের আছে, এমন বলাও সম্ভব হয় না। অধ্যাস অর্থ অন্যত্র দৃষ্টঃ পরত্রাবভাসঃ। সুতরাং অধ্যাসের মূলেও প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে। যে কখনও সাপ দেখে নাই, তার পক্ষে রজ্জুতে সর্প অধ্যাস করা কদাপি সম্ভব হয় না। এইরূপ যে প্রকৃতপক্ষে কদাপি অন্তরের মধ্যে ভগবদ্‌বস্তুর অনুভূতিলাভ করে নাই, তার পক্ষে শালগ্রামাদিতে ভগবদধ্যাস করা সম্ভব নয়। তবে যে সাধারণ লোকে এসকল প্রতীকের পূজা করে, ইহার মূলে একটা শ্রুতজ্ঞান আছে। ইহারা ঈশ্বরের কথা শুনিয়াছে, গুরুশাস্ত্রমুখে ঈশ্বরতত্ত্বের স্বরূপবিস্তব উপদেশলাভ করিয়াছে। পুরুষক্রমানুগত একটা বিশ্বাসের বা আস্তিক্যবুদ্ধির জন্য ইহাদের মনে একটা ঈশ্বর-ভাব আছে। এই ঈশ্বর-ভাবটাকেই ইহারা এসকল প্রতীকে আরোপ করে।

প্রতীকোপাসনার অর্থ।

কিন্তু এদেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতীকোপাসনাকে সাধকেরা অধ্যাত্মযোগের একটা পন্থারূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। পরমতত্ত্ব যে নিরাকার, ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করেন। এই নিরাকারতত্ত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহারা বলেন যে সমাধিতে সকলইন্দ্রিয়চেষ্টার নিঃশেষ

নিবৃত্তি না হইলে এই বিশুদ্ধ নিরাকারতত্ত্বের প্রত্যক্ষলাভ সম্ভব হয় না। এই সমাধিলাভ করিতে হইলে চিত্তবৃত্তির নিরোধ অভ্যাস করা প্রয়োজন। এই যোগের পথে এক এক করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে সংহৃত করিতে হয়। ধ্যান এই সাধনের অবলম্বন। প্রথমে কোনও দৃষ্টবস্তুকে অবলম্বন করিয়া ধ্যান শিখিতে হয়। এই প্রথম অবস্থায় বস্তুর সমগ্রতাকে নিবিষ্ট চিত্তে লক্ষ্য করিতে হয়। ক্রমে ক্রমে দৃষ্টি ও মনকে এই ধ্যেয় বস্তুর অংশ বিশেষে নিবদ্ধ করিতে হয়। তখন ঐ অংশই জ্ঞানগম্য হয়, অপরাংশ হয় না। এইরূপে শেষে একটা অঙ্গে ও সর্ব্বশেষে সেই অঙ্গকেও পরিহার করিয়া নিরাকার শূন্যে দৃষ্টি ও মনকে নিবদ্ধ করিতে হয়। এইরূপে নিরালম্ব ধ্যানের দ্বারা শূন্য-সমাধিলাভ হইলে পরে, ব্রহ্মাত্মৈক্য উপলব্ধি হয়। তখন দ্রষ্টা ও দৃষ্ট দুই লোপ পাইয়া, শুদ্ধ চৈতন্য বা জ্ঞানমাত্র অবশিষ্ট থাকে। ইহাই কৈবল্যমুক্তি। এই কৈবল্যমুক্তি সাধনের জন্য, সমাধিলাভের উপায়স্বরূপ, শালগ্রামাদি প্রতীকের উপাসনা বিহিত হইয়াছে। দেশপ্রচলিত প্রতীকোপাসনার মূলতত্ত্ব ইহাই। কৈবল্যপ্রার্থী বৈদান্তিক ও তান্ত্রিকের পক্ষে এই প্রতীকোপাসনা নিম্ন অধিকারে, সাধনের প্রথমাবস্থায়, প্রশস্ত হইলেও, ভক্তিপন্থা বৈষ্ণবের পথ ইহা নহে। বৈষ্ণব ভক্তিসাধকের চরম লক্ষ্য নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান নহে, কিন্তু চিদাকারসম্পন্ন ভগবদ্-সাক্ষাৎকার। ভক্তির পথ অন্বয়ের পথ, ব্যতিরেকের পথ নয়।

প্রতিমা-পূজা ও ভক্তিপন্থা।

প্রকৃত প্রতিমা-পূজা ভক্তিপথেই প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞানসাধক কৈবল্যের পথে ইহার স্থান নাই। এই জন্য এসকল প্রতিমাকে ঠিক প্রতীক বলা যায় না। প্রতিমা রূপক। অরূপের রূপক হয় না, হইতেই পারে না। নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞানীর গভীরতম অনুভূতি ব্রহ্মসমাধির। এই ব্রহ্মসমাধিকে শাস্ত্রে ও

মহাজনমুখে গভীর সুষুপ্তির সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। সুষুপ্তিতে যেমন অস্তিমাত্র-বোধ থাকে এবং অনাবিল ও অনবচ্ছিন্ন আনন্দ-ভোগ হয়, কিন্তু জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, ভোক্তা-ভোগ্য প্রভৃতি কোনও দ্বৈতের বা সম্বন্ধবোধ থাকে না; এই ব্রহ্ম সমাধিতেও সেইরূপ হয়—আমাদের বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞানীগণ এই কথাই কহিয়াছেন। সুতরাং এই অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয় অনুভূতিকে কোনও প্রকারের প্রত্যক্ষ বস্তুর উপমা বা রূপকাদির দ্বারা ব্যক্ত করা কিছুতেই সম্ভব হয় না। যেখানে সমাধিতে, অপরোক্ষ অনুভূতির দ্বারা কোনও অজড় শুদ্ধ চিন্ময় ভাবমূর্ত্তির বা রসমূর্ত্তির স্বতঃ ও সত্য প্রকাশ হয়, সেইখানেই কেবল সত্যভাবে এইরূপ রূপক গড়িয়া উঠিতে পারে। আমাদের প্রচলিত প্রতিমা-পূজার অধিকাংশই যে রূপক একথাও অস্বীকার করা যায় না। রূপক বলিলেই রূপ আছে; যার কোনও রূপ নাই, বা রূপের সঙ্গে কোনও সামান্য ধর্ম্ম নাই, তার রূপক হয় না ও হইতেই পারে না। এই জন্য প্রতীকোপাসনা আর প্রতিমা-পূজাকে ঠিক এক বলা যায় না। শালগ্রামশীলা প্রতীক। শালগ্রামশীলার মধ্যে আরাধ্য বস্তুর কোনও সত্য ও সহজ প্রেরণা নাই। সূর্য্যকে দেখিয়া যেমন আপনা হইতেই চিত্তে ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্ব ও জগৎপ্রকাশকত্ব ধর্ম্ম অর্থাৎ তাঁহার জ্ঞানস্বরূপের ভাব অন্তরে জাগিয়া উঠে বা উঠিতে পারে, শালগ্রামকে দেখিয়া তাহা হয় না, হইতে পারে না। শাল-গ্রামকে সম্মুখে রাখিয়া চক্ষু বুজিয়া অন্তরের ব্রহ্মানুভূতি বা ব্রহ্ম-প্রত্যয়কে ইহাতে অধ্যাস করিয়া, অর্থাৎ এই শীলাতে ব্রহ্ম আছেন এরূপ ভাবিয়া তবে তার উপাসনা করিতে হয়। অর্থাৎ এখানে "অন্যত্র দৃষ্টঃ পরত্রাবভাসঃ"—অধ্যাসের এই সংজ্ঞাটি সার্থক হয়। এই জন্য, এমন কি, শাক্তদিগের শিবলিঙ্গকেও ঠিক প্রতীক বলা যায় না। শিবলিঙ্গ সম্পদ বা রূপক। ব্রহ্মের বিশ্বস্রষ্টৃত্ব বা বিশ্বযোনিত্বের সঙ্গে শিবমূর্ত্তির কতকটা সামান্য ধর্ম্ম আছে। লিঙ্গো-পাসনা বিশ্বযোনির উপাসনা। কিন্তু শালগ্রামের মধ্যে ব্রহ্মস্বরূপের

এরূপ কোনও সহজ প্রেরণা নাই বলিয়া ইহা খাঁটি প্রতীক। আর শালগ্রামকে যদি রূপক বলিতেই হয়, তাহা হইলেও ইহাকে শুদ্ধ নিরাকারেরই রূপক বলিয়া ধরিতে পারা যায়; নিত্যসিদ্ধ চিন্ময়-রস-মূর্ত্তি নারায়ণ বা পুরুষোত্তমের রূপক বলা যায় না। শূন্যবাদী বৌদ্ধদিগের নিকট আধুনিক হিন্দুগণ এই শালগ্রামযন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন কি না, ইহাও ভাবনার ও গবেষণার বিষয়। অন্য পক্ষে কালী-দুর্গা প্রভৃতি তান্ত্রিকোপাসনা-প্রতিষ্ঠিত প্রতিমাসকল যে রূপক, এ সম্বন্ধে কোনও দ্বিধাই মনে জাগে না। ইহাদের রূপকত্ব প্রত্যক্ষ। গতানুগতিক হিন্দুও

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা"

সাধকদিগের হিতের জন্য অরূপ বা চিদ্রূপ পরমতত্ত্বের চাক্ষুষ রূপাদির কল্পনা হয়—এই বলিয়া এসকল প্রতিমা-পূজার সমর্থন করিয়া, ইহার রূপকত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন।

রূপ ও রূপক।

কিন্তু এখানেও প্রশ্ন উঠে, রূপের সাক্ষাৎকার যার লাভ হয় নাই, রূপকের মর্ম্ম ও মর্য্যাদা সে কি কখনও বুঝিতে পারে? প্রতিমা যে দেবতা নহেন, হিন্দু ইহা বেশ জানেন। অজ্ঞ লোকেও একথা বুঝে। পূজাকালে প্রতিমাকে প্রথমে শোধন করিয়া লইতে হয়। এই শোধন একটা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার, ইহা সত্য। এরূপ শোধনের দ্বারা দ্রব্যগুণের কোনও সত্য পরিবর্ত্তন ঘটে না; কেবল এতক্ষণ যাহা প্রাকৃত কাষ্ঠলোষ্ট্রমৃত্তিকা মাত্র ছিল, তাহাই এই সকল প্রাকৃত ধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া দৈবগুণ ও দেবতার চিদ্‌ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ যে প্রতিমায় জড়ধর্ম্মের বিলোপ হয় বা বিপর্য্যয় ঘটে, তাহা নহে, কিন্তু উপাসকের মনেতেই ইহাতে আর জড়বুদ্ধি ও প্রতিমাজ্ঞান থাকে, দেববুদ্ধির উদয় হয়। এইজন্য এই শোধন-ক্রিয়া বাহিরের নয় ভিতরের—objective নহে নিতান্ত subjec-

tive ; ইহা magic ও hypnotism'এর—ইন্দ্রজাল ও সম্মোহনের একপর্য্যায়ভুক্ত। শোধনের পরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা। অপ্রাণীতে প্রাণ-আরোপই এই প্রাণপ্রতিষ্ঠার মর্ম্ম। এই প্রাণপ্রতিষ্ঠাকে অধ্যাস বলা যাইতে পারে। অন্যত্র দৃষ্টঃ পরত্রাবভাসঃ—যে প্রাণবস্তু নিজের মধ্যে ও অপরাপর প্রাণীমণ্ডলীতে প্রত্যক্ষ হয়, এই অচেতন প্রতিমায় তাহা অপ্রত্যক্ষ। অথচ এই প্রাণপ্রতিষ্ঠার দ্বারা এই অপ্রাণী প্রতিমায় সেই প্রাণধর্ম্ম কল্পিত হয়। এই দিক্ দিয়া দেখিলে প্রতিমা প্রতীক হইয়া যায়, প্রতিমা-পূজা প্রতীকোপাসনার একপর্য্যায়ভুক্ত হয়।

প্রতিমা-পূজা ও নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা।

অন্যদিকে প্রতিমাতে লোকে নিরাকারের ধ্যান করে না, শালগ্রামেতে করিয়া থাকে। আধুনিক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার দ্বারা যাঁহারা প্রতিমা-পূজার সমর্থন করিয়া থাকেন, তাঁদেরও মধ্যে অনেকেই প্রতিমার প্রকৃত মূল্য ও মর্য্যাদা বুঝেন না, প্রতিমা-পূজাকে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার নিম্ন অধিকারের বহিরঙ্গ সাধনরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। তাঁরা বলেন, স্থূলবুদ্ধি মানুষ নিরাকারের চিন্তা করিতে পারে না, মন তাহাতে বসে না, ধ্যান তাহাতে স্থির হয় না। আর প্রাকৃতজনকে মনঃসংযম শিক্ষা দিবার জন্য এ-সকল প্রতিমা কল্পিত হইয়াছে। ইহারা প্রথমে একটা বিশিষ্ট মূর্ত্তিতে মনঃস্থির করিতে অভ্যাস করিবে। ক্রমে জগতের অপর সকল বস্তুকে পরিহার করিয়া এই গোটা প্রতিমাতে মন যখন অনন্য-মনা হইয়া বসিতে পারিবে, তখন এই প্রতিমারও একটি একটি করিয়া অঙ্গকে প্রত্যাহার বা পরিহার করিতে হইবে। প্রথমে সমগ্র প্রতিমার ধ্যান করিবে, এই ধ্যান সাধন হইলে, অর্থাৎ প্রতিমার সম্মুখে বসিবামাত্র বিশ্বের অন্য সকল রূপের স্মৃতি ও চিন্তা যখন একান্তভাবে চিত্ত হইতে লোপ পাইয়া, একমাত্র এই প্রতিমার রূপই নয়নে-মনে জাগিয়া রহিবে, তখন একটি একটি করিয়া

ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকেও ধ্যানের বহির্ভূত করিতে হইবে। প্রথমে ইহার হস্তপদ নাই, এরূপ ভাবিতে হইবে। এসময় প্রতিমার হস্ত-পদের প্রতি লক্ষ্য করিলে চলিবে না। তার পর এই অঙ্গগুলি ধ্যান হইতে নিঃশেষে অপসৃত হইলে, উরস ও উদরাদিকে পরিহার বা প্রত্যাহার করিতে হইবে। তখন কেবল মুখ ও মস্তকই ধ্যেয় হইবে। সর্ব্বশেষে মুখ এবং মস্তকও আর ধ্যেয় থাকিবে না। শেষে কেবল চক্ষু তিনটিমাত্র—দেবতামাত্রেরই তিন চক্ষু, ভূত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকাল দর্শন করে—ধ্যানের বিষয় হইবে। অন্তে এই চক্ষুও মন হইতে, ধ্যান হইতে, সরিয়া যাইবে এবং নিরাকার সত্তামাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। এই নিরাকার চিন্ময় সত্তাই ব্রহ্মসত্তা। ইহাই তখন ধ্যানের বিষয় হইবে ও রহিবে। এই ভাবেই এক এক করিয়া প্রতিমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি হইতে চিত্তবৃত্তির প্রত্যাহার করিয়া, সোপানা-বলি আরোহণে নিত্যসত্য নিরাকার শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপে বা আত্মস্বরূপে বা ব্রহ্মস্বরূপে সাধক সমাধি লাভ করিয়া নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন মধ্যযুগের নিরাকারবাদী বা শূন্যবাদী ব্রহ্মসাধকেরা এই ভাবেই প্রতিমা-পূজাকে ব্রহ্মসাধনার অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছিলেন। আমাদের দেশের শাক্ততন্ত্র সমুদায়ই বোধ হয় অদ্বৈতব্রহ্মপরায়ণ। অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি ও কৈবল্যমুক্তিই তান্ত্রিক সাধনার সাধ্য ও লক্ষ্য। এই জন্য তান্ত্রিক উপাসকেরা কালীদুর্গা প্রভৃতির মূর্ত্তিকে যে ভাবে দেখেন, তাহাতে এ গুলিকে প্রতীকই বলিতে হয়, রূপক বলা যায় না। ধর্ম্মবিকাশের যে স্তরে সত্য রূপকোপাসনার প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয়, এই সকল নিরাকারবাদী বা নির্গুণবাদী বা শূন্যবাদী সাধকেরা সে স্তরে এখনও পৌঁছিতে পারেন নাই।

ভক্তিপন্থা ও প্রতিমা-পূজা।

সে স্তর ধর্ম্মবিকাশের উচ্চতম স্তর। এখানে ব্রহ্মবস্তু বা পরম-তত্ত্ব জড়-ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ নহেন। এখানে পরমতত্ত্ব নিরাকার ও নির্গুণ শূ এবং কেবল স্বসমাধিগ্রাহ্যও নহেন। এখানে ব্রহ্মবস্তু চিদৈশ্বর্য্যপূর্ণ

চিদ্বিভূতি-সমন্বিত, চিদাকার রস-মূর্ত্তি ভগবান।" এই রাজ্যের কথাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কহিয়াছেন :—

ব্রহ্ম শব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান।
চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ সমান ॥
তাঁহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে নিরাকার ॥

সত্য রূপকোপাসনা এই ভগবদুপাসনার অঙ্গ। কারণ—এই ভগবৎ-তত্ত্বের কোনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ না থাকিলেও নিত্যসিদ্ধ চিদানন্দ-ঘন রূপ আছে। জগতের রূপ মাত্রেই সেই নিত্যসিদ্ধ চিদানন্দ-ঘনরূপের নানাপ্রকারের প্রতিচ্ছায়া, অনুপ্রকাশ, প্রতিবিম্ব বা প্রতিরূপ। সৃষ্টির মূলে, বিশ্বের অন্তরালে, স্রষ্টার নিজস্ব প্রকৃতি ও স্বরূপের মধ্যে, যদি এই দৃশ্যমান রূপরসাদির একটা নিত্য-প্রতিষ্ঠা না থাকে, তাহা হইলে সৃষ্টির কোনও অর্থ হয় না, এই দৃশ্যমান জগতের কোনও প্রকারের সত্যতা ও বস্তুত্ব বা reality থাকে না। এই সৃষ্টি ও এই জগৎ তখন মায়িক হইয়া দাঁড়ায়। আর এখানে মায়িক অর্থ শঙ্কর-বেদান্তের পরিভাষায় কেবল ব্যবহারিক মাত্র হয় না, কিন্তু নিতান্ত অলীক, প্রাতিভাষিকের প্রতিশব্দ হইয়া দাঁড়ায়। মায়াটা ব্রহ্মের একটা বিকট কুস্বপ্নে পরিণত হয়। আর ব্রহ্মাণ্ড যদি মিথ্যা হয়, তবে ব্রহ্মও মিথ্যা হইয়া যান। কারণ, ব্রহ্মাণ্ডের অনাদি আদিকারণ-রূপেই আমরা এই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকি। জন্মাদ্যস্য যতঃ—যাঁহা হইতে এই দৃশ্যমান বিশ্বের জন্ম-আদি হয়, বেদান্ত তাঁহাকেই ব্রহ্ম কহিয়াছেন। জন্মাদ্যস্য সূত্রে ব্রহ্মকে ব্রহ্মাণ্ডের কারণরূপেই প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। আর কার্য্য যদি মিথ্যা হয়, কারণও মিথ্যা হয়। মিথ্যা হইতে কেবল মিথ্যারই উৎপত্তি সম্ভব। এইটি দেখিয়াই জগৎকে যাঁহারা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে গিয়াছেন, তাঁহারা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মেতে জগৎকারণত্ব আরোপ করেন নাই। তাঁহারা ব্রহ্মের মায়া-

শক্তি নামে একটা বিরাট রহস্যের কল্পনা করিয়া এই অঘটনঘটন-পটীয়সী শক্তিকেই সৃষ্টির কারণরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ব্রহ্ম জগৎকারণ নহেন। তাঁহার সান্নিধ্যে মায়া বা প্রকৃতি জগৎ-প্রসব করেন। এইজন্য ব্রহ্মের সত্যতা জগৎকে সত্য করে না, জগতের অলীকত্ব ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না। ব্রহ্ম যে মায়া-শক্তির আড়ালে বসিয়া রহিয়াছেন। এদেশের অধিকাংশ লোক শাক্তবৈষ্ণব নির্ব্বিশেষে এই মায়াবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন ও অভিভূত হইয়া আছেন।

বিশ্ব-রূপ ও ব্রহ্ম-স্বরূপ।

আধুনিক হিন্দু অদ্বৈতবাদীই হউন, আর দ্বৈতবাদী বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বা অচিন্ত্যাভেদাভেদবাদীই হউন; মুক্তি সাধকই হউন, কিম্বা ভক্তি-সাধকই হউন;—সকলেই কোনও না কোনও আকারে এই মায়াবাদের দ্বারা অভিভূত হইয়া আছেন। এই জগৎটা যে সত্য—পরিণামী হইয়াও যে ইহা নিত্য, এই জ্ঞান অতি অল্পলোকেরই আছে। আর এই জ্ঞান নাই বলিয়া, অথবা জগৎটা অলীক, মিথ্যা, মায়িক এই ধারণাটা লোকের হাড়ে হাড়ে ঢুকিয়া আছে বলিয়া—এই জগতের রূপরসের মতন কোনও কিছু যে পরমতত্ত্বে বা ব্রহ্মতত্ত্বে আছে কি থাকিতে পারে, ইঁহারা কিছুতেই একথা বুঝিতে ও ধরিতে পারেন না। আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানীগণ চারিদিকের বাহ্যপূজা-পার্ব্বণের প্রাচুর্য্য দেখিয়া সাধারণ হিন্দুসমাজকে যতই সাকারবাদী বলিয়া নিন্দা করুন না কেন, প্রকৃতপক্ষে এদেশের কেউ সাকারবাদী নহে। প্রায় সকলেই ভিতরে ভিতরে, মর্ম্মে মর্ম্মে, জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে ঘোরতর নিরাকারবাদী। ক্বচিৎ কোনও সাধনশীল কিম্বা তত্ত্বদর্শী বৈষ্ণবে পরমতত্ত্বের চিদানন্দঘনরূপ স্বীকার করিলেও, অধিকাংশ বৈষ্ণব ও সকল শাক্তই ঘোর নিরাকারবাদী। আর যাঁহারা এই চিদানন্দঘন রসমূর্ত্তির কথা বলেন,—"শ্যামসুন্দর মদনমোহন" বলিয়া নৃত্য করেন বা মূর্চ্ছা যান, তাঁহাদেরও অনেকে এই চিদানন্দঘন মূর্ত্তিকে হয় ঐন্দ্রজালিক কিম্বা প্রত্যক্ষ জড়রূপসম্পন্ন বলিয়াই

মনে করেন। না হইলে ধাতু গালিয়া, পাথর খুদিয়া, কিম্বা মাটি ছানিয়া, নবনটবর মূর্ত্তি গড়িয়া ভগবানের সত্যরূপ-জ্ঞানে ইহারাই ভজনা করিতেন না। ভগবানের চিদানন্দঘন নিত্য-বিগ্রহের সন্ধান যে পাইয়াছে সে ইহা জানে, আমাদের চিন্তায় ও ভাবনায় যিনি শ্যামসুন্দর, ত্রিভঙ্গমুরলীধর, নর-বপু বেণুকর; প্রাচীন গ্রীশীয়দিগের চিন্তায় ও ভাবনায়, সাধনা ও ধর্ম্ম-কল্পনায় এবং ধর্ম্মকলায়—religious culture, religious imagination এবং religious art'এতে—তিনিই এ্যাপলো (Appolo); রোমক সাধনায় তিনিই জুপিটার। তিনিই বিশ্বের সর্ব্বত্র সর্ব্ব জীবের সর্ব্বেন্দ্রিয়াকর্ষক—শ্রীশ্রীকৃষ্ণ।

সাকারবাদ ও নিরাকারবাদ।

আর ভগবানের বা পরম-তত্ত্বের বা ব্রহ্মের বা আদিকারণের এই চিদানন্দঘনরূপের সন্ধান যে পাইয়াছে সে প্রচলিত অর্থে সাকারবাদীও নহে নিরাকারবাদীও নহে। ভগবানের কোনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ আছে, দৈর্ঘ্যপ্রস্থবেদাদি কোনও আয়তন আছে,—একথা সে বিশ্বাস করে না। কোনও প্রকারের অতিলৌকিক বা ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার দ্বারা ধাতুমৃত্তিকা বা প্রস্তরকে শোধন করিলে, বিশিষ্টভাবে তাহাতে ভগবানের চিদানন্দঘন-বিগ্রহের প্রকাশ হইতে পারে, একথাও সে বিশ্বাস করে না। সে-রূপ অতীন্দ্রিয়, চক্ষুগ্রাহ্য নহে। সে রস অতীন্দ্রিয়—রসনাগ্রাহ্য নহে। সে-স্পর্শ কোটীন্দুশীতল বটে,—কিন্তু জ্যোৎস্নার স্পর্শেরই ন্যায় অন্তরের অনুভূতিলভ্য বাহিরের ত্বকের দ্বারা তার অনুভব হয় না। ভগবৎ-রূপরসের যে সকল বর্ণনা আছে, তাহার দ্বারাই এগুলি যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, অন্তরতম অপরোক্ষ অনুভূতির দ্বারাই কেবল গ্রহণ করিতে হয়,—ইহা বুঝিতে পারা যায়। আর এইটি যে জানে ও বুঝে, সে সাকারবাদী নহে। আবার ভগবানের নিত্যসিদ্ধ, নিত্য-পূর্ণ চিদা-

নন্দঘনরূপ আছে, ইহা বিশ্বাস করে বলিয়াই, সে নিরাকারবাদীও নহে। তাহাকে চিদাকারবাদী বলিলেও বলা যায়, কিন্তু সাকার-বাদী বা নিরাকারবাদী বলা সম্ভব নয়। ধর্ম্মবিকাশের শ্রেষ্ঠতম স্তরেই ভগবানের এই চিদানন্দঘনরূপের প্রকাশ হইয়া থাকে। ধর্ম্মের নিম্নতম স্তরের আশ্রয় এবং অবলম্বন—এই সকল প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়। মধ্যম স্তরের অবলম্বন ব্যতিরেকী বুদ্ধি ও ভেদ-বিচার। উর্দ্ধতম ও শ্রেষ্ঠতম স্তরের অবলম্বন ধর্ম্ম-কল্পনা। প্রথম স্তরে উপাস্য ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ নিসর্গদেবতা বা স্মৃতিপ্রতিষ্ঠ পরলোকগত পিতৃলোকেরা। এই স্তরে আমাদের ধর্ম্ম বেদোক্ত দেব পিতৃধারাকে ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। দ্বিতীয় স্তরে উপাস্য অতীন্দ্রিয় নিরাকার, নির্গুণ ও শুদ্ধ সত্তামাত্র-জ্ঞেয় ব্রহ্ম। তৃতীয় বা চরমস্তরে উপাস্য নিখিলরসামৃত-মূর্ত্তি ভগবান। প্রথম স্তরের সাধনে ইন্দ্রজালের প্রাধান্য বেশী। দ্বিতীয় স্তরের সাধনে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ; শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তি ও বিবেক-বৈরাগ্যাদি সাধন চতুষ্টয়ের দ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয়চেষ্টানিবৃত্তিরূপ ধ্যান ধারণা ও সমাধিরই প্রাধান্য বেশী। তৃতীয় স্তরে ইন্দ্রজালের স্থান নাই, কিন্তু যে অতীন্দ্রিয় সত্তায় বিশ্বাস সকলপ্রকারের ইন্দ্র-জালের প্রাণস্বরূপ, তাহা প্রত্যক্ষ অন্তরঙ্গ অনুভূতিতে ফুটিয়া উঠে; এই অতীন্দ্রিয়ের অনুভূতিকে প্রবল ও প্রস্ফুট করিবার জন্য এই স্তরেও শমদমাদি এবং বিবেক বৈরাগ্য প্রভৃতির অনুশীলন করিতে হয়। কিন্তু এই স্তরে ধ্যান ও সমাধির সাধ্য চিদানন্দমূর্ত্তি ভগবান—নির্গুণ ব্রহ্ম নহেন, সর্ব্বকল্যাণগুণাকর পুরুষোত্তম। এই স্তরের পথ ব্যতিরেকী নহে, কিন্তু অন্বয়ী। এই স্তরে সাধকের প্রধান অবলম্বন ধর্ম্মকল্পনা ও ধর্ম্মকলা —religious imagination ও religious art—এই স্তরেই ভগবদ্রূপের আভাসে যাবতীয় সত্য রূপকের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয়। এইজন্য ধর্ম্মের নিকৃষ্ট অধিকারীর ত কথাই নাই, মধ্যম অধিকারীরও প্রকৃত রূপকোপাসনায় অধিকার নাই। শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী ও সাধকেরাই কেবল এই উপাসনার অধিকারী। ভগবৎ-

রূপের সাক্ষাৎকারলাভ যার হইয়াছে সে'ই কেবল সত্যভাবে ভগবদারাধনার্থে যথার্থ রূপক গড়িয়া তুলিতে পারে।

সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপকল্পনা

—এই সর্ব্বজন-উদ্ধৃত শাস্ত্রপ্রামাণ্যের সত্য অর্থ করিতে হইলে বলিতে হয়, সাধকেরা নিজেদের উপাসনার নিমিত্ত নিজেরাই উপাস্যদেবতার রূপ-কল্পনা করিয়া থাকেন; পরের নিমিত্ত করেন না। ফলতঃ এক ব্যক্তি ভগবানের যে রূপ-কল্পনা করিবেন, অপরের নিকটে তাহা সর্ব্বথা সত্য নাও হইতে পারে, না হওয়ারই কথা। সাধক নিজের অন্তরের অপরোক্ষ অনুভূতিতে যে চিন্ময় রসরূপের প্রত্যক্ষ করেন, তাহাকেই বাহিরের রূপরসাদির সন্নিবেশে চাক্ষুষ করিয়া তুলিয়া এসকল রূপের কল্পনা করেন। এ কল্পনা সত্যও হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে। যেখানে এই কল্পনা অন্তরের অপরোক্ষ অনুভূতির আশ্রয়ে গড়িয়া উঠে, সেখানেই ইহা সত্য হয়। যেখানে এই অপরোক্ষ অনুভূতির আশ্রয় থাকে না, সেখানে এই কল্পনার বস্তুতন্ত্রতাও থাকে না, তাহা মিথ্যা হইয়া যায়। এই মিথ্যা কল্পনাকে ইংরাজিতে ফ্যান্সী (fancy) বলিব, imagination—ইমাজিনেষণ কহিব না। ধর্ম্মজগতে বহুতর ফ্যান্সীর বা মিথ্যা-কল্পনার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ও নিত্যই হইতেছে, ইহা সত্য। এই সকল মিথ্যা কল্পনায় ধর্ম্মকে সতেজ, সজীব ও সরস করে না, নিস্তেজ, নির্জীব ও নিতান্ত বাহ্য আড়ম্বরপূর্ণ করিয়া তুলে। আমাদের দেশের প্রতিমা-পূজার মূলে যে সকল ক্ষেত্রেই এরূপ ফ্যান্সী বা মিথ্যা কল্পনা আছে বা ছিল, এমন কথা বলিতে পারি না। কোনও কোনও স্থলে এই সকল রূপকল্পনা সত্য—ফ্যান্সী নহে, কিন্তু ইমাজিনেষণ—বস্তুতন্ত্র ও প্রত্যক্ষ-প্রতিষ্ঠ। কিন্তু অনধিকারীর হাতে পড়িয়া এসকল সত্য কল্পনাও মিথ্যা হইয়া উঠিয়াছে। অনুভূতিবিচ্যুত, জ্ঞান-সম্পর্কহীন, শুদ্ধ কিম্বদন্তি ও শ্রুতিস্মৃতির আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত পূজা-অর্চ্চনাতে দেশের লোকের বুদ্ধিকে মোহাচ্ছন্ন, ভাবকে অলীক, কর্ম্মকে প্রাণহীন করিয়া ফেলিয়াছে। এই

জন্যই এসকলের প্রতিবাদ করিতে হয়, ঘোরতর প্রতিবাদ করা প্রয়োজন। এই কারণেই এই সকল ক্রিয়াকলাপকে একবার ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দেওয়া আবশ্যক। ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, তন্ন তন্ন করিয়া এসকলের মূল পর্য্যন্ত বিশ্লেষণ করিয়া, ইহাদের মধ্যে কতটা সত্য ও কতটা সত্যাভাস, কতটা বস্তু ও কতটা কল্পনা, কতটা ইমাজিনেষণ ও বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠ আর কতটা ফ্যান্সী ও অজ্ঞতাপুষ্ট—ইহার বিচার না করিলে এসকল ক্রিয়াকর্ম্ম ও সাধনভজনাদি কখনই সত্যোপেত ও সজীব হইবে না। আর এইরূপে সত্যোপেত ও সজীব না হইলে, এসকলের দ্বারা কোনও শ্রেয়ঃলাভ হইবারও আশা নাই।

ভগবৎ-স্বরূপ ও রূপক।

পরমতত্ত্বের বা ভগবানের একটা অতীন্দ্রিয় সমাধিগ্রাহ্য অপরোক্ষ অনুভূতি প্রত্যক্ষ রূপ আছে, এই সিদ্ধান্তের উপরেই যাবতীয় সত্য রূপকের প্রতিষ্ঠা হয়। আর সমাধির শক্তি যাহারা লাভ করে নাই, তাহাদের পক্ষেও, ধর্ম্মের দ্বিতীয় বা মানসস্তরে উঠিয়া, সামান্য অন্তর্দৃষ্টি ও বস্তু-বিশ্লেষণ-ক্ষমতা জন্মিলেই এই প্রত্যক্ষ জগতের ও এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়াদির বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া এই প্রত্যয় বা বিশ্বাস লাভ করা সম্ভব। এই বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারাই আমরা ইহা বুঝিতে পারি যে এই বিশ্বের ক্রমাভিব্যক্তির অন্তরালে ইহার একটা নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ অবশ্যই আছে। এই বিশ্ব বর্ত্তমান আকারে ছিল না। জড়বিজ্ঞান পর্য্যন্ত এই বিশ্বের প্রাচীনতম অবস্থাকে বায়বীয় বা gaseous বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। এই ব্রহ্মাণ্ডে যখন এই বৈচিত্র্য একদিন ফুটিয়া উঠে নাই, এমন এক দিন ছিল; যখন এই নক্ষত্রখচিত অন্তরীক্ষ প্রকাশিত হয় নাই, সৌর জগতের সমাবেশ হয় নাই, পৃথিবীর প্রতিষ্ঠা হয় নাই, উদ্ভিদের উদ্ভব হয় নাই, প্রাণীমণ্ডলীর প্রজনন আরম্ভ হয় নাই,—এমন একদিন ছিল। তখন এই বিশাল ও বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডের কোনও আকার, কোনও চাক্ষুষ গঠন, কোনও প্রত্যক্ষ রূপ ফোটে নাই। সেই একত্ব হইতেই বর্ত্তমান বহুত্বের,

সেই একাকার হইতেই আজিকার অশেষ প্রকারের আকারবিশিষ্ট পদার্থের, সেই বায়ুমণ্ডল হইতে, সেই তেজঃপিণ্ড হইতে এই সকল গ্রহনক্ষত্রাদির, এই শ্যামলা পৃথিবীর, এই গণনাতীত প্রাণীপুঞ্জের ও ক্রমে এই মানবমণ্ডলীর প্রকাশ বা অভিব্যক্তি হইয়াছে। অরূপ হইতে রূপের প্রকাশ হয় নাই। আর জড়বিজ্ঞানই এই প্রশ্ন তোলে—ঐ একাকারত্ব হইতে এই অপূর্ব্ব বিচিত্রতার, ঐ তেজঃ-পিণ্ড হইতে এই শীতল শ্যামল বসুন্ধরার, এবং এই পৃথিবী-গর্ভে ও পৃথিবী-বক্ষে অগণ্যজাতীয় জীবের উদ্ভব ও অভিব্যক্তি হইল কেমনে? তখন এই বৈচিত্র্য, এই শৈত্য, এই জীবমণ্ডলী, এই জনসঙ্ঘ ছিল কোথায়? এই ক্রমবিকাশ বা ক্রমাভিব্যক্তির বিচার-আলোচনাতে এই সিদ্ধান্তেরই প্রতিষ্ঠা করে যে ঐ মূলের একাকারত্বের মধ্যেই এই আকার-বৈচিত্র্যের, ঐ নির্জ্জীবতার মধ্যেই এই জীবমণ্ডলীর অদৃশ্য বীজ লুকাইয়া ছিল। অরণীর মধ্যে যেমন অগ্নি অদৃশ্য থাকে, কিন্তু তার লিঙ্গনাশ হয় না, সেইরূপ ঐ একাকার বিশ্ববীজের গর্ভেই এই বিচিত্র বিশ্বের সকল রূপ, সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি নিহিত ছিল। প্রাণীগণের সমগ্র দেহটা যেমন তাহাদের মাতৃগর্ভের জীব কোষাণুর মধ্যে লুক্কায়িত থাকে, অনাদি-আদি-কারণ-পয়োধিজলেতে ঐ একাকার অণ্ডের মধ্যে এই ব্রহ্মাণ্ডের সকল পদার্থ ও সকল রূপ বীজাকারে বিদ্যমান ছিল। বটবীজের ভিতরে বটবৃক্ষ যেমন নিত্য-সিদ্ধ হইয়া রহে, জরায়ু-গর্ভস্থ কোষাণুর বা cell'এর মধ্যে যেমন সাকুল্য জীব দেহ-জীবরূপ নিত্যসিদ্ধ অবস্থায় থাকে, সেইরূপ কারণ-জল-মগ্ন একাকার জগদ্বীজ বা জগদণ্ডের মধ্যে এই জগতের সমগ্র রূপটি নিত্যসিদ্ধ হইয়া ছিল এবং এখনও আছে। পরমতত্ত্বকে বা ব্রহ্মবস্তুকে বা ভগবানকে জগদ্বীজ বলিলে, তাঁহার স্বরূপের মধ্যে এই জগতের সমগ্র স্বরূপটি নিত্যসিদ্ধ বা etrnally realised হইয়া আছে, ইহা বুঝিতেই হইবে। আর কেবল সমষ্টি-ভাবেই যে এই বিশ্ব বীজাকারে স্বরূপতঃ ব্রহ্মের মধ্যে নিত্যসিদ্ধ হইয়া আছে, তাহাও

নহে; প্রত্যেক ব্যষ্টি পদার্থ এবং জগতের সমুদায় সম্বন্ধও সেইরূপ নিত্যসিদ্ধ হইয়া তাঁহার স্বরূপের মধ্যে রহিয়াছে। এটি না মানিলে, জগতের ক্রমাভিব্যক্তির কোনও বোধগম্য সত্য অর্থ হয় না। যাহা কোথাও প্রস্ফুট আছে, তাহাই একটা শৃঙ্খলার বা পারম্পর্য্যের বা অলঙ্ঘ্য নিয়মের অনুগত হইয়া তিলে তিলে ফুটিয়া উঠিতে পারে। এই জাগতিক ক্রমাভিব্যক্তির বা cosmic evolution'এর পশ্চাতে কোনও নিয়ম, কোনও অপরিহার্য্য ক্রম, কোনও অনন্ত বিধান বা eternal law যদি না থাকে, তবে এই অভিব্যক্তি সম্ভব হয় না, ইহাতে কোনও বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হইতেই পারে না। এ জগতের কোনও শৃঙ্খলা, নিয়ম, কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ বা কোনও পারম্পর্য্য সম্ভব হয় না। এক কথায় ক্রমবিকাশের বা অভিব্যক্তির কোনও অর্থ হয় না।

এই প্রত্যক্ষ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ প্রয়োগে প্রতিষ্ঠিত অভিব্যক্তি-তত্ত্বের আলোচনা করিয়াই আমরা জগৎ-কারণের মধ্যে এই জগতের একটা নিত্যসিদ্ধ স্বরূপের প্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হই। এখানে যাহা কিছু দেখিতেছি ও জানিতেছি, সেখানে সেই অনাদি আদি কারণের মধ্যে তাহা চিরদিন পরিপূর্ণ ও প্রস্ফুট হইয়াছিল ও রহিয়াছে। এখানে এই বহিরাকাশে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রত্যক্ষ হইতেছে ও তিলে তিলে অভিব্যক্ত হইতেছে, ব্রহ্মের সত্তার মধ্যে তাহা অনাদিসিদ্ধ হইয়া আছে। এখানে যেমন আমরা ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া উঠিতেছি, সেইখানে ভগবৎসত্তার মধ্যে সেইরূপ এই আমরাই অনাদিসিদ্ধ হইয়া আছি। যে জ্ঞান, যে ভাব, যে রস, যে সম্বন্ধ এখানে অণু অণু করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে, তাঁর মধ্যে তৎসমুদায় অনাদিসিদ্ধ হইয়া আছে। এই সকল অনাদিসিদ্ধ নিত্য বিভূতি লইয়াই তিনি বিশ্বরূপ হইয়া আছেন। ভগবানের বিশ্বরূপ মিথ্যা জল্পনা নহে, অলীক কল্পনা নহে, কিন্তু সত্য বস্তু। কবি যে বিশ্বরূপের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ঐ সত্যের আশ্রয়েই

সত্যোপেত হইয়াছে; এই কবি-কল্পনা ইমাজিনেষণ, ফ্যান্সী নহে। এই সংসারে আমরা যাহাকে আদর্শ বলি, বাস্তবজীবনের অপূর্ণতার মধ্যেই প্রতিনিয়ত যার প্রেরণা প্রাপ্ত হইতেছি, সেখানে তাহা অনাদিসিদ্ধ, পূর্ণপ্রকট ও পূর্ণায়ত্ত হইয়া আছে। এখানকার পুরুষ দেখিয়াই পুরুষোত্তমের বা পূর্ণপুরুষধর্ম্মীর সন্ধান পাইতেছি। সুতরাং ভগবানের নিত্যসিদ্ধ পৌরুষরূপ অবশ্যই আছে,—সেরূপ জড়রূপ নহে, উপচয়-অপচয়ধর্ম্মাধীন নহে, কিন্তু অতীন্দ্রিয় ও নিত্য। ভগবানের ঐ পৌরুষরূপই ত আমাদের অন্তরের পুরুষাদর্শের আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠা। এখানে নরকে দেখিয়াই, এই নরের মধ্যে যাহা তিলে তিলে ফুটিতেছে ইহা লক্ষ্য করিয়া,—আমাদের অন্তরেতে যে নরত্বের আদর্শ ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া উঠিতেছে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া, এই অভিব্যক্তি ধারার মূলে একটি নিত্যসিদ্ধ নরোত্তমরূপ আছে, ইহা বুঝিতেছি। না দেখিয়াও যেমন ব্রহ্মতত্ত্বে বা ঈশ্বরতত্ত্বে বা ভগবানেতে বিশ্বাস করি, বিশ্বাস করিতে বাধ্য হই; সেইরূপ না দেখিয়াও এই নরোত্তম—এই নারায়ণরূপে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হই। এই পুরুষোত্তম ও নরোত্তমরূপের মধ্যে পুরুষের পুরুষত্ব, নরের নরত্ব সমুদায় শ্রেষ্ঠতম পুরুষধর্ম্ম ও নরধর্ম্ম অনাদিসিদ্ধ হইয়া আছে। এই প্রত্যক্ষ পৌরুষ ও নররূপের মধ্যে যাহা ফুটে ফুটে কিন্তু ফুটিয়া উঠিতে পারিতেছে না, যাহা আপনাকে প্রকাশিত করিবার জন্য যেন নিয়ত আকুলি-বিকুলি করিতেছে কিন্তু কিছুতেই অনন্ত বলিয়া দেশকালের সীমার মধ্যে, অব্যক্ত বলিয়া এই লৌকিক অভিব্যক্তি ধারাতে আপনাকে নিঃশেষে প্রকাশিত করিতে পারিতেছে না, অপ্রত্যক্ষ ভগবানের মধ্যে সেই নিত্যসিদ্ধ পৌরুষ ও নররূপের প্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হই। এই জন্যই পরব্রহ্মের নিগূঢ়তম রহস্য বা supreme mystery যে এই নিত্যসিদ্ধ অতীন্দ্রিয় "মনুষ্যলিঙ্গ" বা নরবপু বা নররূপ, একথা শুনিয়া বুদ্ধি প্রতিবাদ করিতে পারে না, প্রাণ জুড়াইয়া যায়। এই জগতের সকল সম্বন্ধই

এইরূপে সেখানে, অনাদি-আদি কারণেতে, তাঁর স্বরূপের মধ্যে, তাঁর স্বরূপের অন্তঃপুরে নিত্যসিদ্ধ বা অনাদিসিদ্ধ বা eternally realised হইয়া রহিয়াছে। মাতৃত্ব, পিতৃত্ব, সখীত্ব, ভ্রাতৃত্ব, পতিত্ব, পত্নীত্ব, পুত্রত্ব, কন্যাত্ব, দাসত্ব প্রভৃতি এখানে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ও পঙ্গু কল্পনার নিকটে—ভাবমাত্র। কিন্তু মাতা, পিতা, সখা প্রভৃতি, কেবল ভাব নহেন। ইঁহারা যে বস্তু। আর ইঁহারা যে আদর্শটিকে ফুটাইয়া তুলিতেছেন, যে আদর্শটি কাহারও মধ্যে বেশী, কাহারও মধ্যে কম ফুটিয়াছে ও ফুটিতেছে, তাহা যদি আপনার স্বরূপে, সাকার ও মূর্ত্তিমান হইয়া, কোথাও অনাদিসিদ্ধ ও নিত্যপ্রস্ফুট না থাকে, তবে এই আদর্শের কোনও সত্য ও অর্থ থাকে না। আর মাতৃত্ব একটা ভাববাচ্য পদ হইলেও, অবস্তু নহে। মাতৃত্ব একটা প্রত্যক্ষ বস্তু। মাতৃত্বের একটা আকার—একটা রূপও আছে। অপরিচিত স্ত্রীলোকের দেহেও এই মাতৃরূপ দেখিয়া—তাঁহার গুণ, ভাব, স্বভাব কিছু না জানিয়াই, মা বলিয়া প্রণাম করি। এইরূপ পিতৃত্ব, সখীত্ব, প্রভৃতি আদর্শেরও এক একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, ইহা প্রত্যক্ষ কথা। এই সকল রূপ অনাদিসিদ্ধ, নিত্য। জগতের পিতা মাতা প্রভৃতিতে ঐ অনাদিসিদ্ধ রূপই ফুটিয়া উঠে। কেবল মানুষে নহে, সমগ্র জীবমণ্ডলীর মধ্যে এই বিশ্বজনীন, এই অনাদিসিদ্ধ রস-রূপসকল প্রতিফলিত হয়। এ যে বিশ্বপিতৃত্বের, বিশ্বমাতৃত্বের, বিশ্বসখীত্বের, বিশ্বমাধুর্য্যের, বিশ্বদাসত্বের, বিশ্ব-রসের বিশিষ্ট বিশিষ্ট অনাদিসিদ্ধ রসমূর্ত্তি। এই সকল মূর্ত্তি লইয়াই ভগবান চিদাকারসম্পন্ন হইয়া আছেন। তাঁর নিখিলরসামৃতমূর্ত্তিতে এই সমুদায় রস জীবন্ত, প্রস্ফুট, অনাদিসিদ্ধ, পূর্ণাভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। এইজন্যই স্বরূপতঃ তিনি নিরাকার নহেন, কিন্তু চিদাকার। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা সুকৃতিবলে ভগবানের এই চিদ্রসমূর্ত্তির, এই চিদানন্দঘনরূপের প্রত্যক্ষলাভ করিয়াছেন। এই প্রত্যক্ষলাভ যাঁহাদের হইয়াছে, গণেশজননী বা দশভুজা তাঁহাদের চক্ষে কবিকল্পনা নহে, তাঁহারা এ সকল

প্রতিমাপূজাকে নিম্ন অধিকারীর জন্য বিহিত বলিবেন না। তাঁহারা এই পূজাকেই যে সত্য স্বরূপোপাসনা বলিয়া জানেন। এই পূজা প্রতিমার পূজাই নয়। ইহা রূপকের সাহায্যে রূপের পূজা। মনুষ্য-জননীর মধ্যে নিয়ত যে মাতৃরূপ প্রত্যক্ষ হয়, এই পরিণামী রূপের আশ্রয়ে তাহার অনাদিসিদ্ধ স্বরূপের ধ্যানই সত্য মাতৃ-পূজা। এইটি যে বুঝে, এইটি যে জানে, ইহার আভাস যে পাইয়াছে, সে'ই সত্যভাবে এই রূপের ভিতরই মায়ের পূজা করিতে পারে। কিন্তু যার এ অধিকার জন্মায় নাই, সে মাটিই পূজা করিবে, সে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া করিবে, সে এ পথে অনধিকার চর্চ্চা করিতে যাইয়া, অন্ধতম তমেতে প্রবেশ করিবে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

দুর্গা-স্তোত্র

[৺রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-বিরচিত *]

নমো! মহাশক্তি, দেবি! জগৎ-জীবনী।
বীর্য্য, প্রেম, মৃত্যু, মায়া, সকলি আপনি॥
যে হোক তোমার নাম, তুমি মাগো তারা।
কালের জনমপূর্ব্বে ছিলে সারাৎসারা॥
বিনতমস্তকে দুর্গে! প্রণতি চরণে।
এসো, এসো, এসো, মাগো ভুবনভবনে॥
নমো! দশভুজা দেবি! সিংহে সমাসীন।
দেশ কাল পাত্র তব আজ্ঞার অধীন॥
তুমি সকলের বীজ, তব মহোদরে।
অবিরত জাত হ'য়ে পুনঃ তথা মরে॥
তিনে এক, একে তিন, অচিন্ত্য বিশেষ,—
তোমাতেই জাত ব্রহ্মা, উপেন্দ্র, মহেশ,—

* এই অপ্রকাশিত কবিতাটি শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্তের নিকট হইতে শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদারের মারফতে প্রাপ্ত।—নাং সং।

তুমি আদ্য সনাতন, দেবি! ভয়ঙ্করী।
তুমি সকলের সৃষ্টি আর লয়করী॥
নীলাকাশে বিভাসিত তারা-রত্নহার।
কুসুম-মাধুরী চারু ঘেরি চারিধার॥
ঘোর ঝঞ্ঝাবাত, আর বিদ্যুৎবল্লরী।
প্রকাশিছে তব শক্তি, লাবণ্যলহরী।
উর মহাদেবি! আজি মেঘাবৃতাসন।
হিমাদ্রি অনন্তহিমে আছে উন্নয়ন॥
যেখানেতে তোমার যুগল রাঙ্গা পায়।
মুগ্ধ হ'য়ে মহাকাল সুখে নিদ্রা যায়॥
যেথানে নক্ষত্রনেত্রে বিহঙ্গ-উপরি।
দেবসেনাপতি দেব, সুযোগ্য প্রহরী॥
প্রশান্ত বেশেতে তথা দেবগণপতি।
বিদ্যারে করেন ধ্যান প্রেমানন্দমতি॥
কমলা কমল-আভা, হসিতা বিমল।
উষা যথা চিত্রকরে আকাশমণ্ডল॥
কোলে ল'য়ে স্বর্ণবর্ণ, ধর ধান্যধন।
মাতা বসুধার করে দেবনিকেতন॥
শ্বেত-সরোজাভা, সরস্বতী বীণাপাণি।
মোহিনীর শ্রেণী, কলাকলাপের রাণী॥
তুহিনের মাঝে জাগাইল দিব্যতান।
প্রজ্বলিত আনন্দ-অনলে যেই স্থান॥
এসো, এসো, মহাশক্তি! দেবি! প্রভান্বিতা।
হইয়ে সৌন্দর্য্যে আর মাধুর্য্যে মণ্ডিতা॥
তুমি এক আশা দুর্গে! দুর্গতিসময়।
তুমি গো আশ্রয়মাত্র, সহায় নিশ্চয়॥
শান্তি আর সুখে ধন্য কর এই দেশ।
এবৎসর যেন নাহি হয় দুঃখলেশ॥
সুতসুতা সহ এস, কৈলাসবাসিনী।
দুর্গে! দুর্গে! ওমা দুর্গে! দুর্গতিনাশিনী॥

নারায়ণ

২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা] [কার্ত্তিক, ১৩২৩ সাল

অশোকের ধর্ম্মলিপি

[১]

মৌর্য্য নরপতি অশোক তাঁহার সাঁইত্রিশ বর্ষব্যাপী রাজত্বকালের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সাঁইত্রিশটি লিপি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে আবার হায়দারাবাদ রাজ্যে আর একটি নূতন অশোক-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই লিপিগুলি ইতিহাসে কখন অশোক-লিপি, কখন বা অশোক-অনুশাসন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণ এই লিপিসকলকে কখন Asoka Inscription কখন বা Asoka Edicts নামে অভি-হিত করিয়াছেন। বঙ্গভাষায় তাহার অনুবাদ হইয়াছে অশোক্-লিপি বা অশোক-অনুশাসন; কেহবা তাহাকে শুদ্ধ করিয়া বলিয়া থাকেন অনুশাসন লিপি। অনুশাসন অর্থে সাধারণতঃ রাজার আদেশ বুঝায়। কিন্তু মহারাজ অশোক সে অর্থে উহা কোথাও ব্যবহার করেন নাই। অনুশাসন লিপিগুলির ভাব ও ভাষা মনোযোগ সহকারে আলোচনা করিলে এই সত্য আরও পরিস্ফুট হইবে। মূলে আছে ধর্ম্মলিপি— "ইয়ং ধংমলিপি দেবানং প্রিয়েন প্রিয়দসিনা রাঞা লেখাপিতা"। উৎকীর্ণ অনুশাসন মধ্যে সর্ব্বত্রই ধর্ম্মলিপি পদ ব্যবহৃত হইয়াছে।

অনেকেই এই ধর্ম্মলিপিকে অনুশাসন বা আদেশ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই প্রকার ধারণার জন্যই অশোক-লিপির অর্থের পার্থক্য আমরা দেখিয়া থাকি।

ইতিহাস-পাঠকের বুঝা উচিত যে অশোক কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ লেখরাজি আদেশমূলক নহে, উহা উপদেশমূলক। এই ধর্ম্মলিপি মধ্যে কোন প্রকার রাজ-আদেশের কঠোরতা নাই, উহার মধ্যে আছে বিশ্বের প্রতি মৈত্রী ভাবে অনুপ্রাণিত মহা-প্রতাপান্বিত এক সম্রাটের উদার কোমল উপদেশবাণী। উহাতে আছে মাতাপিতার প্রতি ভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা, আত্মীয় সুহৃদের উপকার, পরোপকারিতা, জীবে দয়া, অন্যের বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা, বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি সম্মান, সত্যের প্রতি সমাদর। ধর্ম্মলিপি পাঠে প্রতীয়মান হয় যে প্রাণী-জগতের হিতসাধনই অশোকের মূলমন্ত্র ছিল। লোকের যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য ও প্রকৃত কল্যাণপ্রদ, তাহাই মহারাজ অশোক সহজ ও সরল ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ধৌলি ও জৌগড় অনুশাসন মধ্যে রাজনীতির উচ্চ আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন; সকল মনুষ্যই আমার পুত্র, এই মহাবাক্য পর্ব্বতগাত্রে উৎকীর্ণ করিয়াছেন। রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি এই উভয় আদর্শের সামঞ্জস্য পূর্ব্বক এক ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। অশোকের পূর্ব্বে যদিও মিশর, বাবিলন, আসিরীয় ও পারস্য প্রভৃতি দেশে অনুশাসন উৎকীর্ণ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল এবং তাঁহার পরেও অনেক নরপতি এবম্প্রকার অনুশাসন উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মানবের কল্যাণার্থে প্রস্তরগাত্রে নীতিতত্ত্বের এরূপ উচ্চ আদর্শ অমর তুলিকায় আর কেহ কখনও উৎকীর্ণ করেন নাই। এই সকল অনুশাসনলিপি যদি আদেশমূলক হইত, তাহা হইলে ইহার লঙ্ঘনে কোন না কোন প্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা থাকিত। কি আধুনিক, কি প্রাচীন নৃপতিবর্গের আদেশের মধ্যে আদেশ লঙ্ঘন করিলেই দণ্ডের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অশোক কর্ত্তৃক

উৎকীর্ণ অনুশাসন মধ্যে কোথাও দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা নাই। ধর্ম্ম-লিপিগুলি প্রধানতঃ প্রজাবৃন্দের উপদেশরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। উহাদিগকে সাধারণতঃ sermons on rock বলিলেই উহাদের অর্থ অধিকতর পরিস্ফুট হয়।

ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের যত প্রকার পন্থা নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে (১) বিদেশীয় ঐতিহাসিক ও ভ্রমণকারিগণের লিখিত ইতিবৃত্ত, (২) প্রস্তরগাত্রে ধাতুফলকে বা অন্য কোন আধারে খোদিত লেখরাজি ও মুদ্রালিপি, (৩) গাথা, কাহিনী ও আখ্যায়িকা এবং সমসাময়িক সাহিত্যই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই সকলের মধ্যে আবার অনুশাসনলিপি ও মুদ্রালিপিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হয়। কারণ অনুশাসনাবলী ও মুদ্রালিপি অনুমানের প্রতীক্ষা না করিয়াই সহজ ও সরল ভাবে ঐতিহাসিক ঘটনানিচয় নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ইহা হইতে যে কেবল কতকগুলি ঘটনাপরম্পরা অবগত হওয়া যায় তাহা নহে, উহা হইতে অতীত যুগের ভাষা, লিখন-প্রণালী, লিপিবিদ্যার ক্রমোন্নতি, সমাজ, ধর্ম্ম, রাজকীয় রীতিপদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়েও অসংখ্য জ্ঞানলাভ করা যায়। এই নিমিত্তই অশোক কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ লেখরাজি ঐতিহাসিকের নিকট এত মূল্যবান। প্রাচীন মেম্‌ফিস্ নগরের ধর্ম্মযাজকগণ কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ রোসেটালিপি * যেমন

* খ্রীঃ পূঃ ১৯৮ অব্দে মিশরের মেম্‌ফিস্ (Memphis) নগরের মিশরীয় পুরোহিতগণ তাঁহাদিগের রাজা Ptolemy Epiphanesর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনপূর্ব্বক একটি লিপি উৎকীর্ণ করেন ও সেই লিপি প্রস্তরখণ্ডে উৎকীর্ণ হইয়া বিভিন্ন মন্দিরমধ্যে এক সময়ে রক্ষিত ছিল। অবশেষে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রোসেটা নামক স্থানে একটি প্রস্তরখণ্ডে খোদিত এই লিপি সর্ব্ব প্রথম আবিষ্কৃত হয়। এই লিপিটী দৈর্ঘ্যে ৩'-২", প্রস্থে ২'-৫"। ইহাতে তিনটি বিভিন্ন অক্ষরে খোদিত লিপি বিদ্যমান আছে। ইহাতে মিশরের প্রাচীন hieroglyphics বা বস্তু বা চিত্রলিপি, দ্বিতীয় demotic অর্থাৎ তৎকালে সাধারণ লোকমধ্যে যে অক্ষরের প্রচলন ছিল সেই অক্ষরে, তৃতীয় গ্রীক্

মিশরীয় প্রত্নতত্ত্বের দ্বার উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক জ্ঞান-রাজ্যের এক রহস্য-ময় যবনিকার উত্তোলন করিয়াছে, সেইরূপ ভারতের এই লেখরাজি এদেশের ইতিহাস উদ্ধারকল্পে এক নব যুগের সূচনা করিয়াছে। গত ৮০ বৎসর ধরিয়া এদেশের ইতিহাস গঠনের যে একটা ধারা-বাহিক চেষ্টা চলিতেছে, অশোকলিপির পাঠোদ্ধারই তাহার একমাত্র কারণ ও উক্ত লেখরাজিই সেই ইতিহাস সংগঠনের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ উপা-দান। আমাদের আলোচ্য বিষয়ে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, যে যে স্থানে এই লিপি উৎকীর্ণ আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান আবশ্যক।

অশোক কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ লেখরাজি সাধারণতঃ নিম্নলিখিত নামে অভিহিত হইয়া থাকে—প্রথম শিলা বা গিরিলিপি, দ্বিতীয় কলিঙ্গ-লিপি; প্রাচীন কলিঙ্গরাজ্যে আবিষ্কৃত বলিয়া ইহা কলিঙ্গলিপি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই লিপি প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। যে স্থানে উক্ত অনুশাসন উৎকীর্ণ হইয়াছে, সেই স্থানের নাম অনু-সারে একটিকে বলা হয় ধৌলিলিপি, দ্বিতীয়টি জৌগড়লিপি। ইহা-দের মধ্যেও ধৌলিতে দুইটি এবং জৌগড়ে দুইটি মোট চারিটি লিপি আছে। স্তম্ভলিপি—এগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভগাত্রে খোদিত বলিয়া স্তম্ভলিপি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ভাব্‌ড়া লিপি, সিদ্দপুর, ব্রহ্মগিরি, সাসেরাম, রূপনাথ, বৈরাট, রুম্মিংদি, বা রুম্মিন্ দেবী, নিগ্লিব, দেবী বা Oueen's Edict, সারনাথ, কৌশাম্বী এলাহাবাদ, সাঞ্চী ও বরাবর গুহালিপি, তৎপরে নব প্রকাশিত মাস্কি অনুশাসন। যে যে স্থানে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, সেই সেই স্থানের নাম অনুসারে এই লিপিগুলি ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

অক্ষর। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে উহার পাঠ উদ্ধার হয়। মিশরের প্রাচীন hieroglyphics বা চিত্রলিপির ইহাই প্রথম পাঠোদ্ধার। ইহা হইতেই মিশরের অতি প্রাচীন ইতিহাসকে লোকচক্ষুর সম্মুখে আনয়নের চেষ্টা চলিতেছে। এই রোসেটা প্রস্তরখানি এক্ষণে ব্রিটীস মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।

এই অনুশাসনাবলী পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে—প্রথম শিলালিপি—চৌদ্দটি শিলালিপি ও চারিটি কলিঙ্গলিপি এই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত; দ্বিতীয় স্তম্ভলিপি—ইহার সংখ্যা সাতটি; তৃতীয় খণ্ড বা ক্ষুদ্র শিলালিপি—যথা ভাব্‌্রালিপি, সিদ্ধপুর, ব্রহ্মগিরি, সাসেরাম, রূপনাথ, বৈরাট ও মাস্কি এই শ্রেণীভুক্ত; চতুর্থ ক্ষুদ্র বা অন্যান্য স্তম্ভলিপি—যেমন রুম্মিন দেবী, নিগ্লিভলিপি, সারনাথ-স্তম্ভলিপি, কৌশাম্বী বা প্রয়াগলিপি ও সাঞ্চীলিপি। পঞ্চম গুহালিপি—বরাবর গুহালিপি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

আবিষ্কৃত শিলালিপির সংখ্যা চতুর্দ্দশটি। অশোকের রাজত্বের ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ বৎসরে এই গিরিলিপিগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। অনুশাসনে অশোক তাঁহার অভিষেক বৎসর হইতে রাজত্বকাল গণনা করিয়াছেন। অশোকের অভিষেককাল খ্রীঃ পূঃ ২৬৯ বা খ্রীঃ পূঃ ২৬৮ বলিয়া একরূপ নির্ণীত হইয়াছে। সুতরাং খ্রীঃ পূঃ ২৫৫ বা খ্রীঃ পূঃ ২৫৬ অব্দ মধ্যে অশোকের শিলালিপিগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। মৌর্য্যসাম্রাজ্যের সুদূর প্রান্তস্থিত ছয়টি বিভিন্ন স্থানে এই চৌদ্দটি অনুশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্তর্গত পেশোয়ারের চল্লিশ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে ইসুফজাই সবডিভিসন মধ্যে সাহাবাজগড়ি নামক স্থানে চৌদ্দটি অনুশাসন খোদিত আছে। চৌদ্দটি অনুশাসন মধ্যে তেরটি একত্রে একটি গিরিগাত্রে উৎক দেখিতে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র দ্বাদশসংখ্যক অনুশাসন ইংরা ত যাহাকে Toleration Edict বলে—কারণ এই অনুশাসন ধ্যে অশোকের অসাম্প্রদায়িকতা, অর্থাৎ সকল সম্প্রদায়কে শ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করা কর্ত্তব্য, এই উপদেশ অতি উজ্জ্বল ভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই Toleration Edict বা অসাম্প্রদায়িক শিলালিপিখানি এই স্থানের অনতিদূরে আর একটি গিরিগাত্রে উৎকীর্ণ আছে, স্যার হেরল্ড ডিন্ ইহা আবিষ্কার করেন। এই সাহাবাজগড়ি অনুশাসন প্রথমে এই স্থান হইতে প্রায় এক

ক্রোশ দূরস্থিত কপুরদগিরি নামক স্থানের নাম হইতে কপূর্রদগিরি-অনুশাসন নামে অভিহিত হইত। এক্ষণে সে নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া সাহাবাজগড়ি নামে ইতিহাসমধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে হাজ্‌রা জেলায় মানসহর নামক স্থানে একটি গিরিগাত্রে অশোকের গিরিলিপিগুলি খোদিত আছে। সাহাবাজগড়ির ন্যায় তেরটি গিরিলিপি একত্রে একস্থানে খোদিত দেখিতে পাওয়া যায় ও দ্বাদশসংখ্যক গিরিলিপি অর্থাৎ Toleration Edict খানি স্বতন্ত্র একটি পর্ব্বতগাত্রে খোদিত আছে। এই স্থান হইতে লোকালয় বা রাজপথ অনেক দূরে অবস্থিত। ডাক্তার ষ্টাইন বলেন যে ভ্রেরী বা বট্টারিকা অর্থাৎ দেবী বা দুর্গাতীর্থে যাইবার নিমিত্ত তথায় একটি প্রাচীন রাস্তা ছিল, সেই রাস্তা দিয়া যাত্রীরা যাতায়াত করিত; সেই যাত্রীদিগকে উদ্দেশ করিয়া এই সকল বিভিন্ন অনুশাসন খোদিত হইয়াছিল, ইহাই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। সাহাবাজগড়ি বা মানসের অনুশাসনগুলি প্রাচীন খরোষ্ঠী অক্ষরে খোদিত। এই খরোষ্ঠী অক্ষরের সহিত আরামাইক বা সিরিয়া দেশের অক্ষরের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। খরোষ্ঠী অক্ষর বাম হইতে দক্ষিণ দিকে লিখিত হয়। বোধ হয় খ্রীঃ পূঃ ৫০০ অব্দে হিস্‌ত্যাস্পিস্‌ পুত্র দারায়বুস কর্ত্তৃক সিন্ধুপ্রদেশ বিজিত হইলে পারস্যদেশীয় রাজকর্ম্মচারিগণ ভারতের সীমান্ত প্রদেশে এই অক্ষরের প্রচলন করেন। এই দুইটি ব্যতীত অবশিষ্ট অনুশাসনসকল ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে দেরাদুন জেলার অন্তর্গত কাল্‌সী গ্রামেও চৌদ্দটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মুসৌরীর পঞ্চদশ মাইল পশ্চিমে চক্রতা কাণ্টনমেণ্ট হইতে সাহারাণপুরের পথে একটি পর্ব্বতগাত্রে এই অনুশাসনসকল উৎকীর্ণ আছে, ইহারই অনতিদূরে যমুনা ও টন নদীর সঙ্গমস্থল। প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র বলিয়া বোধ হয়, এই স্থানে গিরিলিপিগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। অনুশাসন-

উৎকীর্ণ-গিরিগাত্রে একটি গজমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। উহার তলদেশে 'গজতম' অক্ষর কয়টি খোদিত।

কাটিয়াবাড় বা প্রাচীন সৌরাষ্ট্রের রাজধানী জুনাগড় নগরের নিকটবর্ত্তী গির্ণার নামক গিরিগাত্রে চৌদ্দটি অনুশাসনলিপি উৎকীর্ণ আছে। এই স্থান জৈনদিগের একটি প্রধান তীর্থভূমি। এই গির্ণার পাহাড়ের পূর্ব্বদিকে অনুশাসনসকল খোদিত ও পশ্চিমে অমরকোট পাহাড়। এতদ্ব্যতীত বোম্বাই প্রদেশে থানা জেলার অন্তর্গত সোপারাগ্রামেও অষ্টম গিরিলিপির কিয়দংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। শিলালিপির এই ভগ্নাবশেষ হইতে অনুমান করা যায় যে, এস্থানেও হয় ত এক সময়ে সমগ্র চৌদ্দটি গিরিলিপি বিদ্যমান ছিল।

কলিঙ্গ প্রদেশের অন্তর্গত বঙ্গোপসাগরকূলে চতুর্দ্দশ গিরিলিপির দুইটি বিভিন্ন পাঠ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথমটি পুরী জেলার অন্তর্গত বিখ্যাত ভুবনেশ্বর নামক হিন্দুতীর্থের তিন ক্রোশ দক্ষিণে ধৌলি নামক গ্রামের নিকটবর্ত্তী একটি প্রস্তরগাত্রে খোদিত আছে। দ্বিতীয় গঞ্জাম জেলার প্রাচীন জৌগড় নামক স্থানে অবস্থিত। এই উভয় স্থানেই একাদশ, দ্বাদশ, এবং ত্রয়োদশ লিপির পরিবর্ত্তে দুইটি করিয়া নূতন অনুশাসন খোদিত আছে। ইহার মধ্যে এক-টিকে বলে Provincial বা প্রাদেশিক ও অপরটিকে Borderers বা সীমান্তলিপি বলা হয়। পর্ব্বতগাত্রে যে স্থানে ধৌলিলিপি উৎ-কীর্ণ আছে, তাহারই উপরিভাগে একটি গজমূর্ত্তির সম্মুখভাগ অঙ্কিত দেখা যায়। ধৌলিলিপি তোসলির এবং জৌগড়লিপি সোমা-পার মাহামাত্র ও শাসনকর্ত্তাদিগকে উদ্দেশ করিয়া উৎকীর্ণ করা হইয়াছিল। (১) দেবানং পিযস বচনেন তোসলিয়ম মহামাত নগল বিয়োহালক বতবিয়স (ধৌলি), (২) দেবানং পিযে হেবং আহা, সমা-পায়ং মহামাতা নগল বিয়োহালক বে বতবিয়া। (জৌগড়)।

ধৌলি এবং জৌগড়ের প্রথম লিপিদ্বয় Provincial বা প্রাদেশিক এবং দ্বিতীয় লিপিদ্বয় Borderers Edict বা সীমান্তলিপি

নামে অভিহিত হয়। যে স্থলে নগরব্যবহারকদিগকে সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহাই Provincial এবং যে লিপিমধ্যে প্রত্যন্ত বাসিগণ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য বিবৃত করা হইয়াছে, তাহাই Borderers বা সীমান্তলিপি। উপরি উক্ত বিবরণ হইতে দেখা গেল যে চতুর্দ্দশ গিরিলিপি নিম্নলিখিত ছয়টি স্থানে উৎকীর্ণ আছে—যথা সাহাবাজ-গড়ি, মানসেরা, কালসী, গির্ণার, ধৌলি ও জৌগড়। এই স্থানগুলি অশোক সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন সীমান্তভাগে অবস্থিত।

অশোকের খণ্ড বা ক্ষুদ্র গিরিলিপির সংখ্যা ছয়টি। একই লিপি বিভিন্ন স্থানে উৎকীর্ণ। তন্মধ্যে তিনটি দক্ষিণ প্রদেশে ও তিনটি উত্তর ভারতে অবস্থিত। দক্ষিণে মহীশুর প্রদেশে চিত্তলগড় জেলার অন্তর্গত সিদ্ধপুর, জটিঙ্গরামেশ্বর এবং ব্রহ্মগিরি এই তিনটি স্থানে উক্ত অনুশাসন উৎকীর্ণ হইয়াছে। উত্তর ভারতে বৈরাট, সাসেরাম, ও রূপনাথ এই তিনটি স্থানে উহা খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুর রাজ্যে বৈরাট, দক্ষিণ বিহারে সাহাবাদ জেলার সাসেরাম এবং জব্বলপুর জেলায় রূপনাথ। বৈরাটের নিকটবর্ত্তী ভাব্‌ড়া নামক স্থান; ঐ স্থানে কোন এক গিরিচূড়ায় একটি বৌদ্ধবিহারভূমিতে এক লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহা ভাব্‌ড়া লিপি নামে পরিচিত। ভিক্ষুসংঘকে উদ্দেশ করিয়া এই লিপিটি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। গয়ার আট ক্রোশ উত্তরে ফল্গুনদীর পশ্চিম পারে বরাবর শৈলশ্রেণী অবস্থিত; এই শৈলশ্রেণীমধ্যে কতকগুলি গুহা নির্ম্মিত; সেই গুহামধ্যেই উৎকীর্ণ লিপি দেখিতে পাওয়া যায়।

চীন পরিব্রাজক হিউএন্‌-ৎসাঙ্‌ (য়ুআন-চুআঙ) অশোক-নির্ম্মিত ষোলটি স্তম্ভের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। ষোলটির মধ্যে এ পর্য্যন্ত দশটিমাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রত্যেক স্তম্ভ একটি সমগ্র প্রস্তর হইতে নির্ম্মিত ও নানাবিধ কারুকার্য্য-শোভিত। নিম্নে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। (১) লৌড়িয়া নন্দনগড়স্তম্ভ—চম্পারণ জেলার অন্তর্গত বেথিয়া হইতে নেপাল যাইবার পথে লৌড়িয়াগ্রাম,

ইহা মথিয়া হইতে তিন মাইল উত্তরে। এই স্তম্ভটি ৪০ ফিট উচ্চ। শিরোদেশের পীট্ মণ্ডলাকারে নির্ম্মিত এবং নানাবিধ কারুকার্য্যে বিভূষিত,—কতকগুলি রাজহংস তাহাদের আহার চঞ্চুপুটে তুলিতেছে, এই খোদিত চিত্রটি এদেশের প্রাচীন শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিতেছে। এই স্তম্ভের মস্তকোপরি একটি সিংহমূর্ত্তি পূর্ব্বাস্য হইয়া স্থাপিত আছে। আরংজেবের সময়ে এক গোলার আঘাতে এই সিংহমূর্ত্তির কিয়দংশ নষ্ট হইয়াছে। সাতটির মধ্যে ছয়টি স্তম্ভলিপি এই স্থানে খোদিত আছে; বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত মঁনস্যুর সেনার ইহাকে মথিয়লিপি নামে অভিহিত করিয়াছেন।

প্রয়াগস্তম্ভ—ইহার মণ্ডলাকার স্তম্ভদেশ সদ্যস্ফুট পদ্মপুষ্প ও লতাদির চিত্রে বিমণ্ডিত হইয়া দর্শকের বিস্ময়োৎপাদন করিতেছে; ইহার দৈর্ঘ্য ৩২´ ও ব্যাস ২´-২″। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিত ইহাকে গ্রীকৃশিল্পের আদর্শ হইতে গৃহীত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার এরূপ অনুমানের কোন কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। কোন কারণে ইহার চূড়াটি নষ্ট হইয়াছিল, সেই নিমিত্ত ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে রয়াল ইঞ্জিনিয়ার Capt. Smith লৌড়িয়ানন্দনগড়ের স্তম্ভের আদর্শে ইহার শিরোভাগ সংস্কার করিতে আহূত হয়েন, কিন্তু তাহাতে আদৌ কৃতকার্য্য হয়েন নাই। এলাহাবাদ ফোর্টে এলেনবরা ব্যারাকের নিকট এক্ষণে উহা স্থাপিত। প্রথম ছয়টি স্তম্ভলিপি, কৌশাম্বী-লিপি ইহাতে উৎকীর্ণ আছে। ইহার উপরিভাগে অশোক অনুশাসন, তাহার নিম্নে একদিকে কৌশাম্বীলিপি ও অন্যদিকে দেবী অনুশাসন (Queen's Edict), তাহার নিম্নে সমুদ্রগুপ্তের খোদিত লিপি।

রামপুরস্তম্ভ—চম্পারণ জেলার অন্তর্গত পিপারিয়া গ্রামের এক মাইল দূরে রামপুর নামক একটি গ্রামমধ্যে এই স্তম্ভটি স্থাপিত আছে। ইহাতেও প্রথম ছয়টি স্তম্ভলিপি খোদিত। স্তম্ভোপরি অতি সুন্দর সিংহমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। সম্প্রতি উহা মৃত্তিকা গহ্বর হইতে

উৎখাত হইয়াছে। Sir John Marshall বলেন, ইহা মৌর্য্য যুগের একটি শ্রেষ্ঠ ভাস্কর কীর্ত্তি; ইহাতে প্রথম ছয়টি স্তম্ভলিপি উৎকীর্ণ আছে।

লৌড়িয়া অররাজ—চম্পারণ জেলার অন্তর্গত বেথিয়ার পথে কেশরী স্তূপের দশক্রোশ দূরে অররাজ মহাদেবের মন্দির। এই মন্দিরের এক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে লৌড়িয়াগ্রাম। এই স্থানে একটি স্তম্ভ স্থাপিত আছে, ইহা দৈর্ঘ্যে ৩৬'-৬"। এই স্তম্ভগাত্রে প্রথম ছয়টি স্তম্ভলিপি উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। মঁন্স্যুর সেনার ইহাকে রধিয়লিপি নাম দিয়াছেন।

দিল্লী তোপ্রাস্তম্ভ—দিল্লীর সন্নিকট ফিরোজাবাদের অন্তর্গত কোশিল পাহাড়ের চূড়ায় এই স্তম্ভটি স্থাপিত আছে। আম্বালার নিকটবর্ত্তী তোপ্রা হইতে ১৩৫৬ খৃষ্টাব্দে সুলতান ফিরোজতোগলক কর্ত্তৃক ইহা আনীত হইয়াছে। সুলতান এই স্তম্ভটি দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং বহুযত্নে সহস্র সহস্র ব্যক্তির সাহায্যে উহা দিল্লীতে আনয়ন করেন। ইহাতে সাতটি স্তম্ভলিপি অবিকৃত ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্তম্ভটি দিল্লীসিবালিক বা ফিরোজসার লাট নামে কথন কথনও উক্ত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৪২'-৭"।

দিল্লী মিরাট স্তম্ভ—এই স্তম্ভটি দিল্লীর অন্তর্গত একটি উচ্চ ভূমির উপর সংস্থাপিত রহিয়াছে, ইহা এক্ষণে ভগ্নপ্রায়। ১৩৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান ফিরোজতোগলক এই স্তম্ভটিও মিরাট হইতে আনয়নপূর্ব্বক দিল্লীতে তাঁহার মৃগয়াবাসের নিকট স্থাপন করেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত গবর্ণমেণ্ট ইহার বর্ত্তমান স্থানে ইহাকে পুনঃস্থাপিত করিয়াছেন। স্তম্ভগাত্রে প্রথম ছয়টি স্তম্ভলিপি অসম্পূর্ণ ভাবে উৎকীর্ণ আছে।

সাঁচী-স্তম্ভ—মধ্যভারতের অন্তর্গত ভূপালরাজ্যে সুবৃহৎ সাঁচী-স্তূপের দক্ষিণদ্বারে এই স্তম্ভটি স্থাপিত আছে। সারনাথ, কৌশাম্বী ও প্রয়াগলিপির পাঠ ইহাতে অসম্পূর্ণ ভাবে উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

ইহার চূড়াটি এক্ষণে ভগ্নপ্রায়। এক সময়ে চারিটি সিংহমূর্ত্তি ইহার শিরোদেশে স্থাপিত ছিল।

সারনাথ স্তম্ভ—বারানসীর প্রায় দুই ক্রোশ উত্তরে যেস্থানে সুবৃহৎ সারনাথ স্তূপ বিদ্যমান, তাহার সন্নিকটে ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে সাঞ্চী ও কৌশাম্বী লিপির পাঠ বিস্তারিত ভাবে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। ধর্ম্মচক্র চারিটি সিংহ কর্ত্তৃক রক্ষিত; স্তম্ভের শীর্ষদেশ ভারতীয় শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচায়ক। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

রুম্মিন্ দেবীস্তম্ভ—বস্তি জেলার অন্তর্গত ডুলহার গ্রামের ছয় মাইল উত্তর-পূর্ব্বে রুম্মিন্ দেবীর মন্দির; এই মন্দির সম্মুখে একটি স্তম্ভ বিরাজিত। রুম্মিন্‌দীই প্রাচীন লুম্বিনী গ্রাম। মাগধী প্রাকৃতের অনেক কথাই 'ল' সংযুক্ত; পরে এই 'ল' স্থানে 'র' প্রয়োগ হইয়াছে। লুম্বিনি = লুম্মিনি = রুম্মিন্। এই স্থান গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান বলিয়া অশোক এই স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন ও এই লিপি উৎকীর্ণ করেন। সুবিখ্যাত জার্ম্মণ পণ্ডিত ব্যুলার এই লিপিকে পাদেরিয়া লিপি নামে অভিহিত করিয়াছেন।

নিগ্লীভ স্তম্ভ—বস্তী জেলার অন্তর্গত নেপাল তরাই প্রদেশে নিগ্লীভ নামক গ্রামে এই স্তম্ভ এক্ষণে স্থাপিত আছে। নিগ্লীভসাগর নামক একটি কৃত্রিম হ্রদের তীরে উহা প্রতিষ্ঠিত। এরূপ প্রবাদ যে পূর্ব্বে এই স্তম্ভটি গৌতমবুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী কনকমন নামক বুদ্ধের জন্মস্থানে প্রোথিত ছিল। গিরিগাত্রে তীর্থসমূহে, রাজ-পথে এই সকল অনুশাসন পথিকের নয়ন আকর্ষণ করিত। যাহাতে সর্ব্বসাধারণের বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হয়, সেই নিমিত্ত অনুশাসনগুলি সেই সময়কার প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত হইয়াছে।

ক্রমশঃ

শ্রীচারুচন্দ্র বসু।

আরতি

সন্ধ্যা যবে ধীরে নেমে আসে
শান্ত-স্নিগ্ধ আঁধার লইয়া,
তখনি ও মন্দির-প্রাঙ্গণে
ওঠে তব আরতি বাজিয়া।
কি মহান্ উদাত্ত সে স্বর,
কি মধুর গম্ভীর বন্দনা,
ওঠে মোর পরাণ-বীণায়
ঝঙ্কারিয়া অনন্ত-মূর্চ্ছনা।
ধূপ গুগ্‌গুলের গন্ধ
অন্ধ হ'য়ে চারিদিকে বহে,—
তুমি আছ এ শুভ বারতা
এ বিশ্বের কাণে কাণে কহে।
হে দেবতা, সে পবিত্র-ক্ষণে
লহ মোর ভকতি প্রণতি,
আমার এ হৃদয়-মন্দিরে
হোক্ সদা তব প্রেমারতি।

শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্তভায়া।

প্রতিবাদের প্রতিবাদ

জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় "আর্ট" সম্বন্ধে যে সুচারু ও জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহার প্রতিবাদ-স্বরূপ ভাদ্র মাসের 'নারায়ণে' রাধাকমল বাবুর 'সাহিত্য ও সুনীতি' নামক প্রবন্ধে পূর্ব্বাপর কোনরূপ যথার্থ সঙ্গতি নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

প্রবন্ধারম্ভেই লেখক গুপ্ত মহাশয়ের রচনা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধার করিয়া "আর্ট" যে কোনরূপ আদর্শপ্রতিষ্ঠাকল্পে নিয়োজিত হয় না, এই মতের উপর একটু বক্রদৃষ্টিপাত করিয়াছেন; অথচ কোন যুক্তি দিয়া উক্ত মতের খণ্ডনও করেন নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে নারায়ণের পৃষ্ঠায় শ্রদ্ধাস্পদ বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় ধর্ম্ম ও "আর্ট" সম্বন্ধে আদর্শের কথা বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"সজীব সাহিত্য মাত্রেই গতানুগতিক ধর্ম্ম ও নীতিকে অগ্রাহ্য করিয়া সহজ মানব প্রকৃতির উপর আপনাকে গড়িয়া তুলিয়াছে"; আমার মনে হয় গুপ্ত মহাশয়ের সহিত এ বিষয়ে তাহার মতভেদ নাই। আদর্শ নিত্য পরি-বর্ত্তনশীল। ধর্ম্মের ও নীতির আদর্শ যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। "আর্ট" সেই কার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারে না, কারণ ক্ষণিক আদর্শ খাড়া করা তাহার কাজ নহে, নিত্য বস্তুর সহিত তাহার কারবার। প্রতিবাদ লিখিবার আগে উক্ত রচনাটি পাঠ করিলে তিনি ভাল করিতেন; তাহার সকল তর্কের উত্তর সেই-খানেই মিলিত। সাধু ও শিল্পীর ভেদকে নিরর্থক বলিতে গিয়া রাধাকমল বাবু যে সকল উদাহরণ দিয়াছেন, সেই সকল মহাপুরুষকে কেবলমাত্র সাধু বলিলে যথার্থরূপে দেখা হয় না, কারণ ভগবদ্দতার ও সাধারণ সাধুত্বের মধ্যে প্রভেদ যথেষ্ট। লেখক পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ না বুঝিয়াই যেন লিখিতেছেন—"শিল্পী ও সাধু উভয়েই সাধক। উভয়েরই পূর্ণ সত্যানুভূতি হয় নাই, উভয়েরই সাধনাবস্থা ইত্যাদি।" তাঁহার

মতে বুদ্ধ প্রভৃতি ভগবদবতারগণ সাধু মাত্র। বুদ্ধ বা খৃষ্টের পূর্ণ সত্যানুভূতি হয় নাই এত বড় কথাটা এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিবার মত সাহস আমার নাই। আমি তাহাদিগকে পূর্ণরসস্বরূপের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করি এবং আমার বিশ্বাস হিন্দুমাত্রেই করিয়া থাকেন। কেবলমাত্র সাধুতার দিক দিয়া তাহাদের বিচার হয় না। লেখক যে ভাবে গোল মিটাইতে চাহিয়াছেন তাহা নিতান্ত বিস্ময়কর। শিল্পী ও সাধুর প্রভেদ লইয়া গুপ্তমহাশয় যে সকল কথা লিখিয়াছেন তাহা উড়াইয়া দিয়া তিনি এককথায় বলিলেন যে, উভয়েরই সমান অবস্থা, অথচ কোন যুক্তি দেন নাই। তর্ক করিয়া বিবাদ মিটাইতে গিয়া নিজের কোলে ঝোল টানিয়া মীমাংসা অবশ্য বেশ নূতন রকমের। সাধু ও শিল্পীর মুখ্য সাধনা একদিকেই বটে, সেই রসস্বরূপের পূর্ণ উপলব্ধি; কিন্তু উভয়ের পথ বিভিন্ন। সাধুর পথ ইহা নয়, ইহা নয়; শিল্পীর পথ ইহাই ইহাই। সাধু দেশকালের অতীত নহেন; তাঁহার আচার নিয়ম আছে, কারণ তাঁহার ভালমন্দের দ্বন্দ্ব এখনও ঘুচে নাই। সাধু জগতকে, মানুষকে একটা বিশেষ আদর্শে গড়িয়া তুলিতে চাহেন—তিনি দেখেন জীবনের একদিক; কিন্তু শিল্পীর আচার নিয়ম নাই, প্রথম হইতেই তিনি আপনাকে মুক্ত বলিয়া মানিয়া লন, তিনি দেখেন জীবনের পরিপূর্ণতা। তিনি মানুষের মহত্ব উদারতা ও অতীন্দ্রিয়তার মধ্যে যেমন ভগবানকে খোঁজেন; মানুষের ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা ও ইন্দ্রিয়পরতার মধ্যেও সেইরূপ ভগবানের সাক্ষাৎ-লাভ করিয়াছেন—অসংখ্য বন্ধনের মধ্যে মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ লাভ করিয়াছেন। শিল্পী আত্মদর্শী মহাজন, তাই জীবের পাপাচরণে তিনি স্থির ও নিশ্চিন্ত রহেন, কারণ তিনি জানেন—

প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহম্ কিং করিষ্যতি

পূজনীয় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে এইরূপই লিখিয়াছেন।

লেখক পরে বলিতেছেন—যে অনেক সময় পাপ, হীনতা দেখা-

ইতে গিয়া অপূর্ণ বা বিকৃত রসসৃষ্টি হইয়া থাকে—বেশ কথা, কিন্তু লেখক কি জানেন না যে সেসকল চিত্র বা সাহিত্য কোন দিনই লোকসমাজে আদর পায় নাই,—পাইবেও না। যেখানে নগ্ননারীত্বে ভগবতী দর্শন হয় নাই—সেখানে নগ্ননারীর চিত্র বা সেরূপ কোন কাহিনী স্থায়িত্ব লাভ করে নাই। মানুষের মনে পূর্ণতার রস যাহা যোগাইয়া দেয়, তাহাই স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে, যাহার মধ্যে সত্য অখণ্ড রস পাওয়া গিয়াছে তাহা চিরকালই বরণীয়। অপূর্ণ বা বিকৃত রস যাহাতে প্রকাশ পায়, তাহা যে "আর্টের" মাপকাঠিতে অতি নীচে তাহা কেহ অস্বীকার করে না এবং যাঁহারা পৃথিবীর সাহিত্য ও শিল্পের ইতিহাসের কোন খোঁজ রাখেন তাঁহারা জানেন যে শুধু রক্তমাংস, বিষয়-সম্ভোগ, ইন্দ্রিয়পরতার অপূর্ণরসপূর্ণ শিল্প কোন দিন আদর পায় নাই। বিস্মৃতির অতল গহ্বরে তাহারা নিমজ্জিত, কোন অদ্ভুতকর্ম্মা প্রত্নতাত্ত্বিকের সাহায্য ব্যতীত তাহাদের সন্ধান পাওয়া দুঃসাধ্য

ইউরোপীয় অনুকরণে বারনারীর ছবি অঙ্কিত করা একটা fashion হইয়াছে—লেখকের একথার বিরুদ্ধে আমি কবিবর রবীন্দ্রনাথের ও চিত্তরঞ্জন দাশের উক্ত বিষয়ে কবিতাদুটির উল্লেখ করিতে পারি; পাঠকসম্প্রদায় তাহার যথার্থ বিচার করিবেন। লেখক এই কথা বলিয়া পাতা ভরাইয়াছেন যে, যাহা অশুদ্ধ, যাহা অসুন্দর, যাহা অমঙ্গল তাহা বর্জ্জনীয়—নিতান্ত পুরাতন কথা; সাহিত্য—যথার্থ সাহিত্য বা "আর্ট"—চিরকালই সত্য; সুন্দর ও মঙ্গলের দিকেই মানব মনকে প্রসারিত করিয়াছে, যাহা করে নাই তাহার স্থান হয় নাই; তবে জানা কথা লইয়া বাজে বকিয়া মাসিকের পাতা ভরাইয়া লাভ কি? রাম শ্যামের দু'খানি চিত্র বা কথা-কাহিনী লইয়া যথার্থ রসজ্ঞানহীন দশজন চীৎকার করিতে পারে, বিজ্ঞাপনের জোরে কয়েকখণ্ড বিক্রয় হইতে পারে, কিন্তু সে বিকৃত শিল্প স্থায়িত্ব লাভ করিবে না—ইহা ত সকলেরই জানা কথা।

রাধাকমল বাবু বলেন, সাহিত্যের উদ্দেশ্য একমাত্র রসসৃষ্টি নহে, জীবনসৃষ্টি। রস কেবলমাত্র অঙ্গ, অঙ্গী নহে। গুপ্ত মহাশয় বলিতে-ছেন আর্টের উদ্দেশ্য ভগবানের রসমূর্ত্তি ফুটাইয়া তোলা, অধ্যাত্ম-বোধের সহায় ও ধর্ম্মজীবনের উদ্দীপক হওয়া; ইহার পরিণতি কি আত্মস্ফূর্ত্তি নহে? পূর্ণরসাধার ভগবানের একত্বের আমরা কি বহুত্ব নহি? শিল্পীর লক্ষ্য যে রসসৃষ্টি তাহার সহিত আমাদের জীবনের সমগ্রতার রসের কোন বিভিন্নতা আছে, এমন কথা ত গুপ্তমহাশয় কোথাও বলেন নাই! শিল্পীর উদ্দেশ্য জীবনসৃষ্টি, তিনি বহুত্বের মধ্যে একত্ব আনিয়া দেন; উপকরণ সজ্জিত করেন না, তাহাতে প্রাণ সঞ্চার করেন—তিনি সাধক নহেন—সিদ্ধ, তিনি সত্যদ্রষ্টা।

আমার যাহা বলিবার তাহা অল্প কথায় বলিয়াছি। কারণ বৃথা তর্ক করিয়া লাভ নাই। তিনি বিশ্বাস করেন যে যথার্থ শিল্পী যিনি, তিনি অখণ্ড রসমূর্ত্তি ফুটাইয়া তোলেন, তাঁহার দৃষ্টি শুধু সত্যই দেখে, হীনতার মধ্যে নিকৃষ্টতার মধ্যে সুন্দরকে, পূর্ণকে দেখে, এখানে গুপ্তমহাশয়ের সহিত তাঁহার ত কোন মতভেদ নাই! তবে তর্ক কিসের, প্রতিবাদ কিসের? অন্যায় যাহা, বিকৃত যাহা তাহা ক্ষণিক, তাহাকে না তাড়াইলেও সে আপনই যাইবে—সময় সে ভার আজন্ম লইয়াছে, তাহা লইয়া বাদবিতণ্ডা যত কম হয় ততই মঙ্গল; কারণ সেই সময়টুকু অন্য মঙ্গলজনক কার্য্যে ব্যয়িত হইলে দেশের ও দশের কল্যাণ হইতে পারে।

শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।

মিলন ও বিরহ

যদি মিলনের পূর্ণ-আনন্দের মাঝে
আঁখি পাতে চেপে বসে
মরণের ঘুম ;—
এই শেষ তার ; শূন্য আর সব
নীরব নিঝুম।
আর যদি বিরহের তপ্ত-শ্বাস সনে
থেমে যায় চিরতরে
বক্ষের স্পন্দন,
এই নহে শেষ তার ; তার শেষ
অনন্ত-মিলন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্তভায়া।

জাতি বা বর্ণভেদের কথা

জাতিভেদ একটা সামাজিক ব্যবস্থা। ব্যবস্থা মাত্রেই অবস্থার উপরে নির্ভর করে। সমাজের এক অবস্থায় যে ব্যবস্থা কল্যাণকর হয়, অন্য অবস্থায় তাহা হয় না।

এই জাতিভেদ একটা সনাতন ব্যবস্থা নয়। আমরা আজ যাহাকে জাতিভেদ বলিয়া জানি, প্রাচীন আর্য্যসমাজে তাহা ছিল না। বৈদিক যুগে এই ব্যবস্থা ছিল বলিয়া মনে হয় না। আমাদের বর্ত্তমান জাতিভেদ বংশগত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু প্রাচীন

কালে একই বংশে, একই পরিবারে জন্মিয়া, কেহবা ব্রাহ্মণ, কেহবা ক্ষত্রিয় আর কেহবা বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতেন। ফলতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তিনটি জাতি নহে, কিন্তু তিনটি বিশেষ সামাজিক বৃত্তি-মাত্র। মানুষ লইয়াই সমাজ, আর মানুষ মাত্রেরই আহার-আচ্ছাদনের আবশ্যক হয়। সমাজ-জীবন একটু ভাল করিয়া গড়িয়া উঠিলেই নানা লোকে সমাজের নানাকাজে প্রবৃত্ত হয়। এক লোকে নিজের বা সমাজের সকল কাজ করে না, করিয়া উঠিতে পারে না, পারিলেও, তাহাতে যে অযথা শক্তিক্ষয় হয়, তাহার উপযুক্ত মূল্য মিলে না। এইজন্য সমাজে শ্রমবিভাগ আরম্ভ হয়। এই শ্রমবিভাগ আরম্ভ হইলে, কতকগুলি লোক বিশেষভাবে সমাজের লোকের আহার-আচ্ছাদনাদি নির্ম্মাণ ও সংগ্রহ ও সরবরাহ করিতে আরম্ভ করে। কৃষি-গো-রক্ষা, বাণিজ্যাদি কর্ম্মে, ক্রমে অভ্যাস ও অভি-জ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহারা বিশেষভাবে দক্ষতালাভ করে। এইরূপে বৈশ্য-বৃত্তি হইতে বৈশ্য-শ্রেণীর উৎপত্তি হয়।

কিন্তু কেবল আহার-আচ্ছাদনের দ্বারাই মানুষের সকল অভাব পূর্ণ, বা সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। মানুষ মাত্রেই কোনও না কোনও রূপে সমাজবদ্ধ হইয়া থাকে। কতকগুলি ইতর জন্তুকে যেমন আমরা নিত্যকালই যুথবদ্ধ হইয়া চলাফেরা করিতে দেখিয়া আসিয়াছি, ইহারা যে কস্মিনকালেও দল-ছাড়া ছিল এমন কথা আমরা জানি না ও বলিতে পারি না, কল্পনা করাও কঠিন; সেইরূপ মানুষকেও আমরা চিরকালই সমাজবদ্ধ হইয়া বসবাস করিতে দেখিয়াছি, তারা যে কস্মিনকালে সমাজ-ছাড়া ছিল বা থাকিতে পারে, এরূপ কল্পনাও করিতে পারি না। মানুষ যতদিন মানুষ হইয়াছে, ততকাল হইতেই সে সমাজ বাঁধিয়া বাস করিতেছে। মানুষ বলিলেই আমরা একটা সামাজিক জীব বুঝি। আর সমাজ বলিলেই, আবার, কেবল কতকগুলি মানুষের সমষ্টি বুঝি না, কিন্তু একটা অঙ্গী বা অর্গেনিজ্‌ম—organism—বুঝি। কতকগুলি মানুষ

একত্র হইলে একটা জনসংঘট্য মাত্র হয়, কিন্তু সমাজ হয় না। জনসংঘট্যের মধ্যে কোনও ঘননিবিষ্ট সর্ব্বাঙ্গীণ সম্বন্ধ নাই, আকস্মিক ঘটনা-যোগে তার উৎপত্তি ও বিলয় হয়। একটা সাময়িক কারণে ইহারা একত্র হয়, আবার সে কারণ চলিয়া গেলে, তাদের সংহতিও ভাঙ্গিয়া খসিয়া যায়। কিন্তু সমাজ-বন্ধনের একটা স্থায়িত্ব আছে। সমাজের ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির সম্বন্ধ আকস্মিক নহে, কিন্তু অঙ্গাঙ্গী। অর্থাৎ সমাজের সমষ্টিগত জীবন-ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, ব্যষ্টির জীবনের সম্যক সফলতালাভ সম্ভব হয় না। সমাজান্তর্গত মনুষ্যগণের উপরে সমষ্টিগত সমাজের শক্তি ও উন্নতি ও সমাজের সমষ্টিভূত জীবন ও গঠনের উপরে সামাজিকগণের ব্যক্তিগত বা ব্যষ্টিগত শক্তি ও উন্নতি অতি ঘনিষ্ঠ-ভাবে নির্ভর করে। একটা জনসংঘট্যের সমষ্টি ও ব্যষ্টির মধ্যে এই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নাই। সমাজ অঙ্গী, সমাজের ভিন্ন ভিন্ন নরনারী ও পরিবার বা গোষ্ঠীবর্গ তার অঙ্গ। আবার প্রত্যেক গোষ্ঠীও এক একটি অঙ্গী, তার অন্তর্ভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন পরিবার সকল তার অঙ্গ। আবার প্রত্যেক পরিবারও এক একটি অঙ্গীস্বরূপ, পরিবারের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি এই পরিবারের অঙ্গ। এইরূপভাবে সমাজের প্রত্যেক অংশে, প্রত্যেক স্তরে, প্রত্যেক অঙ্গের মধ্যে একটা জটিল, ঘনিষ্ঠ অপরিহার্য্য অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রহিয়াছে। সুতরাং মানুষের নিজের আহার-আচ্ছাদনাদির যেমন প্রয়োজন, শীতাতপাদি হইতে আপনার জীবনকে রক্ষা করিবার জন্য মানুষ যেমন আহার ও আবাস খুঁজিয়া বেড়ায়, সংগ্রহ করে, কিংবা সৃষ্টি করিয়া থাকে; সেইরূপ সমাজের সমষ্টিগত জীবন-রক্ষারও প্রয়োজন আছে। সমাজ থাকিলেই ত মানুষ থাকে। অতএব আত্মপ্রয়োজনেই সমাজের অন্তর্গত লোক-সকলকে সমাজ রক্ষার ও সমাজ-শাসনের সুব্যবস্থা করিতে হয়। আহার ও আবাস আকাশ হইতে উড়িয়া আসে না, মাটিতেই জন্মে, মাটিতেই গড়ে। আহারের জন্য ও আবাসের জন্য মাটি চাই—

প্রত্যেক সমাজকে এক একটা ভূভাগ দখল করিয়া বসা চাই। বন-জঙ্গলেই আহার্য্য পশুপক্ষী মিলে, আর কিছু না হইলেও, অন্ততঃ এক একটা বনজঙ্গল দখল করিয়া না বসিলে, বনচারী ব্যাধদিগেরও আহার-সংগ্রহ কঠিন হয়। কৃষির জন্য ভূমি চাই। সকল ভূমিতে সমান ফসল জন্মে না; এইজন্য উর্ব্বর ভূমি সকলেই খুঁজিয়া বেড়ায়। গোচারণাদির জন্য তৃণ-জল-সচ্ছল ভূভাগের প্রয়োজন হয়। সর্ব্বত্র সমানভাবে পশুচারণ ও পশুপালনের সুবিধা হয় না। উর্ব্বর ভূমি, পশুচারণের উপযোগী তৃণ-জল-বহুল দেশ সকল সমাজেই খুঁজিয়া বেড়ায়। এইরূপে যাযাবর অবস্থাতেও ভিন্ন ভিন্ন সমাজের মধ্যে একটা প্রতিযোগীতা ও রেষারেষি সর্ব্বদাই জাগিয়া থাকিত। যেখানে এরূপ রেষারেষি থাকে, সেখানেই আত্মরক্ষার ও বিত্তরক্ষার আয়োজন আবশ্যক হয়। এই ভাবে, সমাজের অতি আদিম ও শৈশবাবস্থা হইতেই যুদ্ধবৃত্তি গড়িয়া উঠে। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে সমাজ ও স্বদেশকে রক্ষা করিতে হইলে যোদ্ধার আবশ্যক হয়। তার পর, সমাজের ভিতরেও একে অন্যের উপরে আততায়ীতা করে। এক পরিবার, এক গোষ্ঠী, এক ব্যক্তি, অপর পরিবার, অপর গোষ্ঠী ও অপরাপর ব্যক্তির সঙ্গে রেষারেষি করে। অপরের স্বত্ব কাড়িয়া লইতে চায়। অপরের সঙ্গে অন্তর্বিবাদে নিযুক্ত হয়। এরূপ অবস্থায়, সমাজের শান্তিরক্ষার জন্য সমাজশাসন আবশ্যক হয়। সমাজের সমষ্টিভূত শক্তি যদি সমাজান্তর্গত ব্যক্তিগণকে আপন আপন ন্যায্য স্বত্ব ও অধিকারের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত না রাখিতে পারে, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের যদি সুব্যবস্থা না থাকে, তাহা হইলে অরাজকতা উপস্থিত হইয়া, সমাজ নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য সমাজের সমষ্টিভূত শক্তিকে সর্ব্বদা একই সঙ্গে দুইটি কর্ম্ম করিতে হয়। এক অন্তর্শাসন, অপর বহিশত্রু হইতে সমাজ ও স্বদেশকে রক্ষা করা। এই দুইটি কার্য্যই শক্তিসাপেক্ষ। এই দুইটি কার্য্যেই নেতৃত্বের প্রয়োজন। এই

দুইটি কার্য্যেই ঈশ্বর-ভাব বা প্রতাপ প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। এই দুইটি কার্য্যই নীতিসাপেক্ষ। নীতি অর্থ এখানে ইংরাজি মর্য্যালিটি—morality—নহে, কিন্তু polity—পলিটি। যাহারা সমাজ-শাসন করে, যুদ্ধ-বিগ্রহাদির সময়ে সেনা-নায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়, ক্রমে সে কার্য্যে তাহারা বিশেষ দক্ষতা লাভ করে। এই ভাবেই ক্ষাত্র-বৃত্তির উৎপত্তি ও ক্ষাত্রবৃত্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষাত্র-বর্ণের সৃষ্টি হয়। বৈশ্যেরাও মাটি ফুড়িয়া উঠে না, ক্ষত্রিয়েরাও ইন্দ্র-লোক হইতে নামিয়া আসে না। উভয়েই সমাজ-জীবনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, সমাজের আত্মপ্রয়োজনে, সমাজ-অঙ্গী হইতে ফুটিয়া ও সমাজের অঙ্গ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়া উঠে। বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় উভয় বর্ণেরই মূল সামাজিক বৃত্তির বা কর্ম্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

ব্রাহ্মণেরাও ব্রহ্মলোক হইতে অবতীর্ণ হন নাই। বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় যেমন সমাজ-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, সমাজ-প্রয়োজনে, সমাজের সেবার জন্য, সমাজের অঙ্গরূপে ফুটিয়া ও গড়িয়া উঠিয়াছেন, ব্রাহ্মণেরাও সেইরূপ, সেই একই প্রয়োজনে, সেই একই পথে, সেই একই সমাজ-অঙ্গীর অঙ্গরূপেই ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া উঠিয়াছেন। মানুষের যেমন আহার-আচ্ছাদনের প্রয়োজন আছে, এই শরীর-রক্ষার ও শরীরের বিকাশ ও উন্নতি সাধনের জন্য; যেমন শাসন-সংরক্ষণের প্রয়োজন সমাজ-রক্ষা ও সমাজের বিকাশ ও উন্নতি সাধনের জন্য; সেইরূপ পারলৌকিক ধর্ম্মশিক্ষা এবং ধর্ম্মসাধনেরও প্রয়োজন আছে। মানুষের যেমন একটা শরীর আছে ও শরীরের কতকগুলি অঙ্গ ও বৃত্তি আছে; সেইরূপ একটা মন ও মানসিক বৃত্তি এবং একটা আত্মা এবং কতকগুলি আধ্যাত্মিক বৃত্তিও আছে। মানুষের গঠন ও প্রকৃতির—তার constitution এবং nature'এর মধ্যেই এই সকল আধ্যাত্মিক বৃত্তিও নিহিত রহিয়াছে। যাহা দেখিতেছে, শুনিতেছে, ছুঁইতেছে, ধরিতেছে,—তাহা ছাড়া একটা-কিছু আছে, যাহা দেখা

যায় যায়, কিন্তু যায় না; শোনা যায় যায়, কিন্তু যায় না; ধরা-ছোঁয়া যায় যায়, কিন্তু যায় না;—এই প্রত্যয় সার্ব্বজনীন। এটি মানুষের একটি মৌলিক আত্মপ্রত্যয় বা original intuition—ইন্টুইষণ। অহং ও ইদং—আমি ও যাহা-আমি নই—এদুটি মানুষ মাত্রেই প্রত্যক্ষ করে। আর জ্ঞানের শৈশবে, বিচার-বিশ্লেষণ শক্তির বিশেষ বিকাশের পূর্ব্বে—মানুষ এই ইদং বা অনাত্মাকে, অহং বা আত্মা হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র হইলেও, এই অহং বা আত্মার মতন, এই অহং বা আত্মার নিগূঢ় গুণ ও লক্ষণ-যুক্ত বলিয়া মনে করে। আমাদের ঘরে শিশুরা আজও ইহা করে; আদিম অবস্থায় বয়োবৃদ্ধ বর্ব্বরেরাও এরূপ মনে করিতেন। এই বিশ্ব তাঁদের নিকটে একটা গভীর রহস্য-পূর্ণ ছিল। এই বিশ্বের সকল পদার্থের অন্তরালে তাঁহারা একটা অদৃশ্য চৈতন্য-বস্তুর সন্ধান পাইতেন। আজ আমরা যাহাকে জড়-শক্তি বা নৈসর্গিক শক্তি বলি, তাঁহারা তাহাকে শক্তিমান দেবতা মনে করিতেন। এই যে অতীন্দ্রিয়ের অনুভূতি, ইহারই দ্বারা তাঁহাদের জীবনটা ভয়ে, বিস্ময়ে, আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া, তাঁহাদিগকে বাস্তব-সুখদুঃখের অতীতে লইয়া গিয়া একটা কল্পরাজ্যের বা রস-রাজ্যের বা কবিতার রাজ্যের সৃষ্টি করিত। ঐ রাজ্যেই তাঁহাদের জীবনের যাবতীয় আদর্শের ও চিরন্তন লক্ষ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তাহারই প্রেরণায় প্রাচীন মানবের দৃষ্টি ও ধ্যান লোক-লোকান্তরে ছুটিয়া বেড়াইত ও ইহজীবনের কর্ম্মের সফলতার জন্য ইহার অতীতে একটা বিশাল ও পরিপূর্ণ পর-লোকের বা স্বর্গলোকের প্রতিষ্ঠা করিত। এই ভাবেই মানুষের নীতি ও ধর্ম্ম, কবিতা ও শিল্প, দর্শন ও বিজ্ঞান,—সভ্যতার সমুদায় মূল উপাদানগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। শাসন-সংযম, শিল্প-দীক্ষা, মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, তার কর্ম্মের প্রেরণা, কৃতিত্বের পুরস্কার ও অকৃতির সান্ত্বনা সকলই ঐ অতীন্দ্রিয়ের অনুভূতি বা অতীন্দ্রিয়ের বিশ্বাস বা অতীন্দ্রিয়ের স্বপ্নের ও কল্পনার উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই অতীন্দ্রিয়ের আকর্ষণেই মানুষের

ধর্ম্মকর্ম্মাদি গড়িয়া উঠে। তার শরীরের প্রয়োজনে যেমন কৃষিবাণিজ্যাদির উৎপত্তি ও বিকাশ হইয়াছে, তার সমষ্টিভূত সমাজজীবনের প্রয়োজনে যেমন শাসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থা গড়িয়াছে, সেইরূপ এই অতীন্দ্রিয়ের অনুভবের প্রেরণায় তার ধর্ম্মকর্ম্ম, সাধন ভজনাদি গড়িয়া উঠিয়াছে। কৃষিবাণিজ্যাদি যেমন একটা সামাজিক বৃত্তি বা কর্ম্ম; শাসন-সংরক্ষণ যেমন একটা সামাজিক বৃত্তি বা কর্ম্ম; যজন-যাজন, ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্ম-শিখান, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন, এসকলও একটা অত্যাবশ্যকীয় সামাজিক বৃত্তি বা কর্ম্ম। সমাজের লোকের অন্ন ও আবাসাদির ব্যবস্থার জন্য যেমন বৈশ্যবৃত্তির আশ্রয়ে বৈশ্যবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার শাসনসংরক্ষণের ব্যবস্থার জন্য যেমন ক্ষাত্রবৃত্তির আশ্রয়ে ক্ষাত্রবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, সেইরূপ সমাজের ধর্ম্ম-সাধন ও ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থার জন্য ব্রহ্মবৃত্তির আশ্রয়ে ব্রাহ্মণ-বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। এসকল বর্ণ আকাশ হইতেও উড়িয়া আসে নাই, সমাজের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেও একেবারে পরিস্ফুট আকারে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, দুষ্টলোকে স্বার্থবশ হইয়া, ষড়যন্ত্র করিয়াও এগুলিকে গড়িয়া তুলে নাই। এই বর্ণত্রয় সমাজ-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের আত্ম-প্রয়োজনে, সমাজ-জীবনের বিকাশ ও পূর্ণতা সাধনের জন্য, ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে অতিপ্রাকৃত বা অতিলৌকিক কিছুই নাই।

অন্ন-বস্ত্রাদির উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহ, সমাজের শাসন ও সংরক্ষণ, এবং ধর্ম্মযজন ও ধর্ম্মযাজন,—এই তিনটি সমাজ-জীবনের প্রধান কর্ম্ম। সকল সমাজে, সকল দেশে, সকল কালেই এই তিনটি কর্ম্ম ছিল; আর সর্ব্বত্রই এই তিনটি মুখ্য সামাজিক বৃত্তির আশ্রয়ে তিনটি শ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রথমে এই সকল সামাজিক বৃত্তির অনুকরণ করিয়া তিনটি বিশিষ্ট বর্ণ বা জাতির সৃষ্টি হয় নাই। আদিতে একই পরিবারের মধ্যে কেহবা কৃষিবাণিজ্য কর্ম্ম করিত, কেহবা সমাজ-শাসন ও সমাজ-রক্ষা করিত, আর কেহবা যজনযাজন

করিত। ফলতঃ তখন দুইটি মাত্র বৃত্তিই, বোধ হয়, বৈশিষ্ট্যলাভ করিয়াছিল, সমাজের সকলকেই ক্ষাত্রবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইত। শান্তির সময় যেমন কেহবা কৃষিগোরক্ষা প্রভৃতি করিত, কেহবা যজন-যাজনাদি করিত, সেইরূপ যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইলে, সকলেই অস্ত্রধারণ করিয়া স্বদেশ ও স্বরাষ্ট্র ও স্বজাতির রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইত। যুদ্ধবিগ্রহাদি যখন একরূপ দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল, তখন সকলকেই ক্ষাত্রকর্ম্ম শিক্ষা ও ক্ষাত্রবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইত। তখন সমাজে প্রকৃতপক্ষে একই বর্ণ ছিল, সকলেই ক্ষত্রিয় ছিল; অথবা অন্য দিক্ দিয়া দেখিলে, দুই বর্ণ মাত্র ছিল, কেহবা বৈশ্য, কেহবা ব্রাহ্মণ ছিল। যুদ্ধবিগ্রহাদি যত কমিয়া যাইতে লাগিল, শান্তি যত স্থায়ী হইতে আরম্ভ করিল, ততই একদল লোক ক্ষাত্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়া বিশেষভাবে কৃষিগোরক্ষা বাণিজ্যাদি কর্ম্মে, আর একদল যজন-যাজন ও অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তখনও বর্ণভেদ গড়িয়া উঠে নাই। এই অবস্থাতেও একই পরিবারের, এমনকি একই পিতামাতার দশজন সন্তানের মধ্যে কেহবা বৈশ্যবৃত্তি, কেহবা ক্ষাত্র-বৃত্তি, কেহবা ব্রাহ্মণবৃত্তি অবলম্বন করিতেন। ইহার বহু পরেও ক্ষত্রিয়ের পুত্র ব্রাহ্মণের, ব্রাহ্মণের পুত্র ক্ষত্রিয়ের, আর বৈশ্য ও শূদ্রের পুত্র ক্ষত্রি-য়ের ও ব্রাহ্মণের কর্ম্ম করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ইহাতে কোনও প্রকারের নিষেধ ছিল না। বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদি বৃত্তি ছিল, কিন্তু বর্ণবিভাগ বা বর্ণভেদ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মহা-ভারতে বর্ণভেদ গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু একবর্ণের লোকের পক্ষে অপর বর্ণের বৃত্তি অবলম্বন একেবারে নিষিদ্ধ হয় নাই। ভারত-যুদ্ধের কালে ব্রাহ্মণেরা অবাধে ক্ষাত্রবৃত্তি অবলম্বন করিতেন; দ্রোণ ও কৃপ তার সাক্ষী। বৈশ্যেরা ক্ষাত্রবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারি-তেন—রাধেয় তার সাক্ষী। শূদ্রেরা যজন-যাজন না করুন, অন্ততঃ নীতি ও ব্যবহারবিদ্ হইয়া রাজসভায় মন্ত্রীর আসন পাইতে পারি-তেন,—বিদুর তাহার প্রমাণ। তবে বর্ত্তমান মহাভারতে আমরা যে

সমাজ-চিত্র দেখিতে পাই, তাহাতে সমাজে একটা বর্ণবিভাগ যে কতকটা পাকিয়া উঠিয়াছিল, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। তবে এই বর্ণবিভাগ যে একদিন সমাজে একটা কঠিন আকার ধারণ করে নাই, অথবা করিয়া থাকিলেও মহাভারত রচনা সময়ে তাহার সংস্কার-সাধন যে আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল, ইহার প্রমাণ এই মহাভারতেই আছে। গীতার—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ

গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ করিয়া আমি ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ-সমান্বিত সমাজ-ব্যবস্থার সৃষ্টি করিয়াছি—এই বাক্যই তার প্রমাণ। জাতিভেদটা তখন গুণকর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জন্মগত বা বংশগত হইয়া পড়িয়াছিল বা পড়িতেছিল। আর এইরূপ জন্মগত বা বংশগত জাতিভেদ লইয়া একটা বিরাট ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন অসাধ্য ; ইহা দেখিয়াই, এই ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠার প্রধান আশ্রয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় এই বর্ণচতুষ্টয়কে গুণকর্ম্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক অজ্ঞাত জাতিকুল রাধেয়ের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ইহার আর এক প্রমাণ। বিদুরের জন্মকথা ইহার তৃতীয় প্রমাণ। পঞ্চ পাণ্ডবের জাতক-কাহিনীর অন্তরালে, কোন্ নিগূঢ় সমাজ রহস্য লুকাইয়া আছে, তাহাই বা ভেদ করিবে কে? বেদব্যাসের জন্মবৃত্তান্তও কঠোর এবং অনুল্লঙ্ঘনীয় জাতিভেদ-প্রথার সমর্থন করে না। বর্ত্তমান মহাভারতখানি যখন সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ হয়, তখন বর্ণবিভাগটা অনেক পরিমাণে পাকিয়া উঠিয়াছে, ইহা স্বীকার করি। কিন্তু তখনও পুরাতন স্মৃতি লুপ্ত হয় নাই। আর তারই জন্য যেখানেই এই জাতিভেদের বিরোধী প্রমাণ ছিল, সেখানেই একটা গোঁজামিল দিয়া ঐ পুরাতন স্মৃতির সঙ্গে আধুনিক অবস্থার ও ব্যবস্থার একটা সঙ্গতি করিবার চেষ্টা হইয়াছিল।

আদিতে গুণকর্ম্ম অনুসারেই বর্ণবিভাগের প্রতিষ্ঠা হয়, ইহা যেমন সত্য, এই গুণকর্ম্ম-প্রতিষ্ঠিত বর্ণবিভাগ যে ক্রমে, স্বাভাবিক উপায়েই,

সমাজ-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, সমাজের আত্মপ্রয়োজনেই আবার জন্ম-গত ও বংশগত হইয়া উঠে, ইহাও সেইরূপই সত্য। দুষ্টলোকে চেষ্টা করিয়া, বর্ণবিভাগেরও সৃষ্টি করে নাই, আর ঐ বর্ণবিভাগ হইতে পরে বর্ত্তমান বর্ণভেদেরও প্রতিষ্ঠা করে নাই। বর্ণবিভাগ ও বর্ণভেদ দুই' সমাজ-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অপরিহার্য্য কারণে গড়িয়া উঠিয়াছিল।

প্রাচীন কালে আজিকার মতন লোকশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। প্রকাশ্য বিদ্যালয়াদির প্রতিষ্ঠা হয় নাই। শিক্ষার্থীগণ উপযুক্ত গুরুর নিকটে যাইয়া আপন আপন অভীষ্ট বিদ্যা শিক্ষা করিত। এরূপ অবস্থায় যে যে-বিদ্যা ভাল করিয়া জানিত, সহজেই সকলের আগে ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্ন ও আগ্রহ সহকারে সেই বিদ্যা আপনার পুত্র ও অপরাপর পরিবারবর্গকেই শিখাইত। কার্য্যকরী বা বার্ত্তিক বিদ্যা কিম্বা technical এবং professional knowledge, এইরূপ ভাবে পুরুষানুক্রমেই রক্ষিত ও প্রচারিত হইত। পিতার বা পিতৃ-ব্যের নিকট হইতে প্রত্যেক পরিবারের বালকেরা তাহাদের বংশের বিশেষ বিদ্যা সকল শিক্ষা করিত। ধর্ম্মযাজন তখন একটা বিশেষ বিদ্যা হইয়া উঠিয়াছিল। ধর্ম্ম তখন যজ্ঞাদি জটিল কর্ম্মের উপরেই নির্ভর করিত। যজ্ঞের মন্ত্রাদি মুখে মুখে শিখিতে হইত। কোন্ ভাবে কোন্ যজ্ঞ করিতে হয়, তাহার ক্রম এবং কুশলতার উপরে যজ্ঞের সফলতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে,—এই ক্রমের বিন্দুমাত্র ব্যতি-ক্রম বা এই নিপুণতার একটুও অভাব হইলে সমস্ত যজ্ঞকর্ম্ম পণ্ড হইয়া যায়—লোকের এই বিশ্বাস ছিল। এরূপ অবস্থায় ধর্ম্মযাজন-কর্ম্ম শিখিতে ও শিখাইতে বিস্তর ক্লেশ স্বীকার করিতে হইত। বিশেষতঃ ক্রমে যখন এই সকল যজ্ঞকর্ম্ম দ্বারা পুরোহিতেরা বিস্তর দক্ষিণা লাভ করিতে লাগিলেন, তখন নিজেদের ব্যবসা রক্ষা করি-বার জন্য যাজ্ঞিকদিগের মধ্যে একটা মন্ত্রগুপ্তির ভাব জাগিয়া উঠিল। কেহ অপরকে সহজে আপনার বিদ্যা আর শিখাইতে চাহিত না।

এই ভাবে যাহা আদিতে কেবল সামাজিক বৃত্তিগত ছিল, এই নূতন অবস্থাধীনে, নূতন ও জটিল শিক্ষা প্রয়োজনে, ক্রমে তাহা বংশগত হইয়া পড়িল। যেমন যজন-যাজনাদি ব্রহ্মকর্ম্ম, সেইরূপ শাসন ও সংরক্ষণাদি রাষ্ট্র-কর্ম্ম বা ক্ষাত্র-কর্ম্ম, এবং কৃষিবাণিজ্যাদি বৈশ্যকর্ম্মও কালক্রমে বংশগত হইয়া পড়িল। প্রাচীন সমাজের অবস্থাধীনে এইরূপ হওয়া কেবল অনিবার্য্য নহে, কিন্তু প্রয়োজনীয় হইয়াও উঠিয়াছিল। সমাজগঠন তখন কতকটা পরিমাণে বাঁধিয়াছে, কিন্তু ভাল করিয়া বাঁধে নাই। জনশিক্ষার ব্যবস্থা তখনও ভাল করিয়া হয় নাই। স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সমাজ-অঙ্গীর সঙ্গে সামাজিকগণের বাহিরের বন্ধন যে পরিমাণে শক্ত হইয়াছিল, ভিতরের যোগ সে পরিমাণে বাঁধে নাই। তখন ভয়েতেই লোকে সমাজ শাসন মানিয়া চলিত, সমাজের সঙ্গে একাত্মতাসিদ্ধ হইয়া এই ভয় তখনও প্রকৃত ভক্তিতে পরিণত হয় নাই। ব্যক্তি অপেক্ষা তার পরিবার, পরিবার অপেক্ষা তার গোষ্ঠী, গোষ্ঠী অপেক্ষা তার জাতি বা সমাজ যে বড়, এই জ্ঞানের উন্মেষ হইয়াছে; কিন্তু কেন বড়, ইহার বিচার-বিশ্লেষণ আরম্ভ হয় নাই। সমাজের শক্তির উপরে গোষ্ঠীর শক্তি, গোষ্ঠীর শক্তির উপরে পরিবারের শক্তি আর পরিবারের শক্তির উপরে প্রত্যেক ব্যক্তির শক্তি একান্তভাবে নির্ভর করে, সমাজের কল্যাণের সঙ্গে সমাজান্তর্গত পরিবার সকলের, গোষ্ঠীবর্গের ও ব্যক্তিগণের কল্যাণ একান্তভাবে নির্ভর করে; সমাজ দেহ, পরিবারাদি তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ; সমাজ শরীর, পরিবারাদি এই শরীরের হস্তপদাদি; সমাজ শরীরী ও অঙ্গী, পরিবারাদি তাহার জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়; শরীরের শক্তি, স্বাস্থ্য ও সুখের উপরে হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শক্তি, স্বাস্থ্য ও সুখ একান্তভাবে নির্ভর করে; সমাজের স্বার্থের সঙ্গে সমাজান্তর্গত পরিবার সকলের ও ব্যক্তিগণের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে; সমাজের এক অঙ্গের হানি হইলে অপর অঙ্গসকল দুর্ব্বল ও অক্ষম হয়, এক অঙ্গের দুর্ব্বলতায় বা রোগে

অপর অঙ্গসকল দুর্ব্বল ও রুগ্ন হয়,—সমাজ-বিজ্ঞানের এ সকল নিগূঢ় তথ্য তখনও ভাল করিয়া লোকের জ্ঞানগোচর হয় নাই। এখনও সভ্যতাভিমানী ইউরোপীয় সমাজে পর্য্যন্ত এ জ্ঞান ভাল করিয়া জন্মে নাই, প্রাচীন ভারতে যদি না জন্মিয়া থাকে, তাহা নিতান্ত দোষের বা ক্ষোভের বা গ্লানির কথা হয় না। আর এই জ্ঞান জন্মে নাই বলিয়াই, যে যে বিষয়ে যতটুকু বিশেষ অভিজ্ঞতা ও কৃতিত্বলাভ করিত, সে তাহাকে আপনার পুত্রকলত্রের মধ্যেই লুকাইয়া রাখিতে চাহিত। এইরূপে কেবল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি বর্ণ জন্মগত হয় নাই, কিন্তু কালক্রমে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও কেহবা ঋগ্বেদী, কেহবা শামবেদী, কেহবা যজুর্ব্বেদী, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন শাখার প্রতিষ্ঠা হয়। প্রাচীনকালে মন্ত্রগুপ্তির চেষ্টা হইতেই যে এরূপ বিভাগ গড়িয়া উঠে নাই, ইহা কে বলিবে? ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যেও বিশেষ বিশেষ অস্ত্রব্যবহারে পুরুষানুক্রমিক শিক্ষাদীক্ষা ও পারদর্শিতা এবং এই পারদর্শিতা-প্রেরিত মন্ত্রগুপ্তি নিবন্ধন যে বিভিন্ন শাখা ও উপশাখার সৃষ্টি হয় নাই, তাহাই বা কে বলিবে? বিভিন্ন সমাজের সংমিশ্রণেও এইরূপ শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে, ইহাও সত্য। কিন্তু প্রাচীনতম যুগে, সামাজিক সংমিশ্রণের অবসর ও প্রয়োজন উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্যে যে-সকল শ্রেণীবিভাগ হইয়াছিল, তাহা যে সম-ব্যবসায়ীদের স্বাভাবিক প্রতিযোগীতা ও মন্ত্রগুপ্তির চেষ্টা হইতে জন্মে নাই এমন কথা বলা যায় না। বৈশ্যদিগের মধ্যে যে এই কারণেই নানা শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছে এবং অধিকাংশ ব্যবসায়ই পুরুষক্রমানুগত হইয়া পড়ে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। শূদ্রেরাও এই কারণে নানাভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে, কেহবা সৎশূদ্র, কেহবা অন্ত্যজ হইয়া যায়। ব্রাহ্মণাদি জাতির অঙ্গসেবা যাহারা করিত, তাহাদের "জল চল" হইয়া গেল; তাহারা সৎশূদ্র হইল। যাহাদের এ সুযোগ ও সুবিধা ছিল না বা ঘটিল না, তাহারা অস্পৃশ্য ও অন্ত্যজ রহিয়া গেল।

এই ভাবেই কালক্রমে আমাদের বর্ত্তমান জাতিভেদ বা বর্ণ-ভেদের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সমাজের আত্মপ্রয়োজনে, অবস্থাবিশেষে এই বর্ণভেদের ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল। বহু, বহুদিন সে পুরাতন অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; কিন্তু সে ব্যবস্থা বদলায় নাই। ইহাই ত দোষের কথা।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

যমুনা

শ্যামের বাঁশরী শুনি উজান যমুনা নদী
বহিত নাচিয়া কিবা বৃন্দাবনে নিরবধি!
সে যমুনা আজি সেথা ছুটিতেছে কুলু কুলু,
প্রেমেতে গলিয়া যেন প্রাণখানি ঢুলু ঢুলু!
নিরমল স্বচ্ছ নীর এখনো প্রেমের ক্ষীর,
শ্যামের সোহাগ-স্রোত এখনো বহিছে ধীর!
এখনো সে প্রেমরাগ লেখা আছে নদী-গায়,
এখনো সে প্রেমগান নাচিয়া যমুনা গায়!
এখনো তেমন নদী বিহগের কলরোলে,
উষার কনক করে সুনীল ঘোম্‌টা খুলে;—
এখনো তেমন নদী ব্রজ-বালা-পদ চুমি
শু'য়ে আছে কোলে করি পুণ্যময় ব্রজভূমি;
এখনো অতীত স্মৃতি ডেকে আনে অনুরাগে,
এখনো রঞ্জিয়া উঠে প্রভাতে কনক-রাগে!

গোপীর চরণ-মুক্ত অলক্তের রক্তধারা
এখনো বহিয়া নদী প্রেম-গর্ব্বে মাতোয়ারা!
এখনো সে শ্যামলতা আছে যেন প্রাণ ধরি
নিষ্কাম পবিত্র শান্ত গোপী-প্রেম চুরি করি;
পাপিয়া কোকিল গায় মাতাইয়া কুঞ্জবন
পবিত্র মিলন-গান স্মরিয়া সে ব্রজধন!
বিশ্ব-জননীর কণ্ঠ আলিঙ্গিয়া বাহু-পাশে,
শারদ শশাঙ্ক-করে এখনো যমুনা হাসে।
এখনো সাধক যারা অবগাহি নদী-নীরে .
হেরে সেই যুগ্ম-রূপ দাঁড়াইয়া নদী-তীরে।
নগ্ন চক্ষে শ্যামহীন হেরি সেই বৃন্দাবন,—
মনঃ চক্ষে যেন নাথ! হেরি সেথা শ্যামধন;
জুড়াই যমুনা-নীরে তাপিত পরাণ মোর,
হৃদয়ে প্রেমের ধারা বহে যেন নিরন্তর!

শ্রীযামিনীমোহন দাস।

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম

[১৪]

দলাদলি।

ধর্ম্ম হইলেই দলাদলি হয়। সভা হইলেই দলাদলি হয়। পাঁচ-জনে মিলিয়া কাজ করিতে গেলে মতান্তর হয়ই হয়, আর মতান্তর হইলেই দলাদলি হয়। দলাদলিটা দোষের কথাও বটে, দোষের কথা নয়ও বটে। দলাদলিতে যখন মূল কাজ পণ্ড হয়, তখন দোষের। যখন মূল কাজের শ্রীবৃদ্ধি হয়, তখন গুণের। যখন

দলাদলির মীমাংসা করিয়া দিবার লোক থাকে, তখন দলাদলিতে উপকার হয়। যখন মিটাইয়া দিবার লোক থাকে না, তখন উহাতে অপকার হয়। বৌদ্ধ-ধর্ম্মে যে দলাদলি হইয়াছিল তাহাতে ধর্ম্মের উন্নতিই হইয়াছিল; দুই দলই ধর্ম্মপ্রচারের জন্য কোমর বাঁধিয়া পৃথিবীর চারিদিকেই ঘুরিয়াছিলেন। একদল উত্তরে, একদল দক্ষিণে। তাঁহারা যে সব দেশে গিয়াছিলেন, তাহার অনেক দেশ এখনও বৌদ্ধ আছে। সুতরাং এতবড় একটা বড় দলাদলির ইতিহাসটা কিছু জানা চাই।

প্রথম কথা কি লইয়া দলাদলি হয়? অতি তুচ্ছ কথা। যাহা লইয়া দলাদলি হয়, পালিতে তাহাকে দশবথু বলে, সংস্কৃতে দশবস্তু। অর্থাৎ দশটি জিনিস লইয়া দলাদলির সূত্রপাত। যথা :—

(১) কপ্পতি, সিঙ্গিলোণ কপ্পো :—অনেক ভিক্ষু শিংয়ের পাত্রে একটু লুণ সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। তাঁহারা তো ভিক্ষা করিয়া খাইতেন? সব সময়ে তো লুণ দেওয়া ব্যঞ্জন পাইতেন না। আবার সেকালে সকলে সকলের লুণ খাইতেন না। লুণ না দিয়া ব্যঞ্জন রান্না হইত। তাই পরিবেশনও হইত। লোকে লুণ মিশাইয়া খাইত। এখনও অনেক খাঁটী হিন্দুর বাড়ীতে আলুণী ছক্কার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা বোধ হয় মনে করেন লুণ দিলেই "এঁটো" হয়। তাই পরিবেশনের সময় আলুণীই পরিবেশন করেন। পাতে লুণ থাকে, সেই লুণ মিশাইয়া লোকে 'এঁটো' করিয়া খায়। এইরূপ ব্যবহার বোধ হয় সেকালেও ছিল। লোকে ভিক্ষুদের রান্না জিনিস দিত, আলুণীই দিত। ভিক্ষুরা একটু লুণ সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন—তাও রাখিতেন শিংয়ে অর্থাৎ যাহার দাম নাই, কুড়াইয়া যথেষ্ট পাওয়া যায়। তখন ত আর Bone-Millএর এত দরকার হয় নাই। এই যে সামান্য কথা ইহা লইয়াই ঘোর দলাদলি উপস্থিত হইল। যাঁহারা কড়া ভিক্ষু, তাঁহারা বলিলেন, ভিক্ষুর আবার সঞ্চয়? তাহা হইলে আর ভিক্ষু রহিল না, গৃহস্থ হইয়া

গেল। যাঁহারা তত কড়া ভিক্ষু নন, তাঁহারা বলিলেন, একটু লুণ সঞ্চয় করিলাম তাতে বহিয়া গেল কি? আমরা কি কিছুই সঞ্চয় করি না! আমাদের পাত্র আছে, চীবর আছে, শয়ন আসন এসব তো আমাদের থাকে, একটু লুণ থাকিলেই সর্ব্বনাশ হইয়া গেল? এই আপত্তির নাম সিঙ্গিলোণ কপ্পো।

(২) কপ্পতি দ্বঙ্গুল কপ্পো ঃ—বুদ্ধদেব নিয়ম করিয়া গিয়াছিলেন, বেলা ঠিক্ দুই প্রহরের পর কোন ভিক্ষু আহার করিতে পারিবে না। ১২টা বাজিবার পূর্ব্বে সকলকেই আহার সারিয়া লইতে হইবে, ১২টা বাজিলে পর আর কেহই আহার করিতে পারিবে না। তাহার পর যদি খাইতে হয় তো জল ও ফলের রস খাইতে হইবে। কিন্তু ইহারা তো ভিক্ষু, ভিক্ষা করিয়া রান্না ভাত আনিয়া তো খাইতে হইবে? একালের মত তো আর স্কুল, কালেজ, আফিস ছিলনা, যে ৯টার মধ্যে ভাত চাই! সেকালের লোকে খাইত বেলায়, রাঁধিতও বেলায়। ভিক্ষুরা সেই বেলার রান্না ভিক্ষা করিয়া আনিয়া খাইত। দুপুরের আগে খাইতে হইবে দুপুরের পর এক গ্রাসও খাইবার হুকুম নাই। সুতরাং অনেকের খাওয়া হইত না, অনেকের আধ-পেটা হইত। তাই তারা মনে করিত, দুই প্রহরের সময় ছায়া যেরূপ থাকে, তাহা হইতে দুই আঙ্গুল ছায়া সরিয়া গেলেও খাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু কড়া ভিক্ষুরা বলিলেন, সে কখন হতে পারে না। মহাপ্রভুর আজ্ঞা দু'প্রহরের পূর্ব্বে খাইতে হইবে, সে আজ্ঞা কি আমরা লঙ্ঘন করিতে পারি! সুতরাং মতান্তর হইল, দলাদলির একটা কারণ হইল।

(৩) কপ্পতি গামান্তর কপ্পো ঃ—ভিক্ষুরা একই গ্রামে ভিক্ষা করিবে, একদিনে দুই গ্রামে যাইতে পারিবে না, নিয়ম ছিল। কোন কোন ভিক্ষু মনে করিতেন, যদি গ্রামান্তরে নিমন্ত্রণ হয়, আগে স্বগ্রামে ভিক্ষা কিছু খাইয়া গেলে দোষ কি? প্রথমতঃ দু'বার খাওয়া দোষ, দ্বিতীয় দোষ আগে স্বগ্রামে খাইয়া, গ্রামান্তরে নিমন্ত্রণ গেলে, যে

বেচারা নিমন্ত্রণ করিয়াছে, তাহার রান্না অন্নব্যঞ্জন সব ফেলা যায়। কারণ ভিক্ষুরা তো একবার খাইয়া গিয়া আবার সব জিনিস খাইয়া উঠিতে পারেন না; সুতরাং বুদ্ধদেব নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন যে গ্রামান্তরে নিমন্ত্রণ যাইলে ঘরে খাইয়া যাইতে পারিবে না। কড়া ভিক্ষুরা বলিলেন, এ নিয়ম ঠিক। অন্যে বলিলেন, গ্রামান্তরে যাইতে হইলে যদি পেটে কিছু না থাকে তাহা হইলে যাইতে বড় কষ্ট হয়। সুতরাং কিছু খাইয়া গেলে দোষ কি? এও একটা বিবাদের কারণ।

(৪) কপ্পতি আবাসকপ্পো :—এখানে আবাস শব্দের অর্থ লইয়া একটু গোলযোগ আছে। এক এক মঠে অনেক ভিক্ষু বাস করিতেন। যাঁহারা এক ঘরে বাস করেন তাঁহাদের এক আবাস। আবাস শব্দের অর্থ ঘর। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে আবাস শব্দের অর্থ পরগণা বা ডিহি। বুদ্ধদেব নিয়ম করিয়াছিলেন যে, এক জায়গার যত ভিক্ষু থাকিবে, সব এক জায়গায় আসিয়া উপোষথ করিবে। উপোষথ শব্দের অর্থ উপবাস, বাঙ্গলায় যাহাকে উপোষ বলে। সংস্কৃতে দুই এক জায়গায় উপবসথ শব্দ পাওয়া যায়, তাহা হইতে উপোষথ হইয়াছে। বৌদ্ধশাস্ত্রে ক্রমে উ লোপ হইয়া পোষথ বা পোষধ হইয়াছে। জৈন ভাষায় আবার ষ, ধ, লোপ হইয়া শুধু পো হইয়া দাড়াইয়াছে। তাহাদের ধর্ম্মে একটা পো-শালা আছে, সেখানে সকলে আসিয়া পোষধ ব্রত ধারণ করেন অর্থাৎ উপোষ করিয়া ধর্ম্মকথা শ্রবণ করেন। অষ্টমী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা এ কয়দিন পোষধের দিন। বুদ্ধদেব নিয়ম করিয়াছিলেন এক আবাসের লোক একজায়গায় পোষধ করিবে। কিন্তু কেহ কেহ বলিলেন, এ নিয়ম বড় কড়া, যাহার যেখানে ইচ্ছা, সে সেখানে পোষধ করিবে। বৃদ্ধেরা বলিলেন, তাহা হইতে পারে না, তথাগতের আজ্ঞা মানিয়া চলিতেই হইবে। আর সকলে বলিলেন, পৃথক পৃথক হইয়া পোষধ করিলে, উপাসকদিগের সুবিধা হয়, তাহাদের

ধর্ম্মকথা শুনাইবার সুবিধা হয়, এবং তাহাতে ধর্ম্মবৃদ্ধি হয়। বৃদ্ধেরা বলিলেন, সকলে একত্র বসিয়া উপবাস করিলে, লুকাইয়া খাইবার সুবিধা হয় না, পৃথক পৃথক উপবাস করিলে সেটা হওয়ার সুবিধা হয়। সেজন্য আবার ভিক্ষুদের দেখিবার দরকার হয়। সুতরাং ইহা একটা বিবাদের কারণ হইল।

(৫) কপ্পতি অনুমতি কপ্পো:—বৌদ্ধদের সকল কর্ম্মই সঙ্ঘে নির্ব্বাহিত হইত, অর্থাৎ এক বিহারের যত ভিক্ষু সকলে একত্র বসিয়া (ভোট লইয়া) বিহারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। সকল ভিক্ষু উপস্থিত না থাকিলে, কোন কোন বিহারের ভিক্ষুরা অনুপস্থিত ভিক্ষুদের অনুমতি পাওয়া যাইবে, এইরূপ মনে করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া লইতেন। এ বিষয়ে যে মতামতি হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। একদল বলিবেন, "অনুপস্থিতেরা যে তোমাদের হইয়া মত দিবেন একথা তোমরা কি করিয়া ভাব।" আর একদল বলিবেন, "তাহারা তো উপস্থিত ছিলেন না, আমরা কি করি, কাজ তো ফেলিয়া রাখা যায় না।"

(৬) কপ্পতি অচিন্ন কপ্পো:—গুরু করিয়া গিয়াছেন আমিও করিব। পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে ইহাতে দোষ কি? বৃদ্ধেরা বলিবেন, তথাগতের যাহা উপদেশ তাহার তো ব্যতিক্রম হইবার জো নাই। তোমার গুরু কোথায় কি করিয়া গিয়াছেন, সেটা তো আর তথাগতের উপদেশের বিরুদ্ধে প্রমাণ হইবে না। অতএব তোমাকে সে কার্য্যটি ছাড়িতে হইবে। সে বলিল, বাঃ, বরাবর চলিয়া আসিতেছে, আমার গুরুও করিয়া গিয়াছেন, আমি করিলেই দোষ হইবে? সুতরাং ইহা লইয়া বিবাদের একটা কারণ হইল।

(৭) কপ্পতি অমথিত কপ্পো:—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে দুপ্রহরের পর ভিক্ষুরা জল ও ফলরস খাইতে পারিবে। ঘোলটাকে ভিক্ষুরা রস বলিয়াই মনে করিতেন। ঘোল খাওয়ায় তাঁহাদের দোষ ছিল না। দই মওয়া হইলে তবে তো ঘোল হয়! অনেক ভিক্ষু দইয়ে

জল দিয়া পাতলা করিয়া তাহাকে ঘোল বলিয়া খাইতেন। এই যে 'আমওয়া' দই এটা ভিক্ষুদের পক্ষে নিষিদ্ধ। অনেক ভিক্ষু বলিলেন, এ নিষেধের কোন মানে নাই। এ জিনিসটা তো দইয়ে জল দিয়া তৈয়ারী হইয়াছে, ঘোলও জল দিয়া তৈয়ারী হয়। একটা 'মওয়া', একটা 'আমওয়া'। এতে আর এতই তফাৎ কি? বৃদ্ধেরা বলিলেন, বেশ তফাৎ আছে। একটাতে মাখনটা থাকিয়া যায়, আর একটাতে থাকে না। মাখন তো ফলের রসও নয়, জলও নয়, সুতরাং সেটা তো খাওয়া উচিত নয়। সুতরাং মাখন খাওয়াও যা, 'আমওয়া' দই খাওয়াও তা। এ কার্য্যটি একেবারেই করা উচিত নয়। সুতরাং এটাও একটা বিবাদের কারণ।

(৮) কপ্পতি জলোগী কপ্পো:—মদ গাঁজিয়া উঠিবার পূর্ব্বে জল বলিয়া সেইটাকে খাওয়া। অর্থাৎ তাড়ি হইবার পূর্ব্বে ঝাঁঝওয়ালা রস খওয়া। ইহা লইয়াও দলাদলি হইল। বৃদ্ধেরা বলিলেন, "ওতো মদ। মদ খাওয়া ভিক্ষুদের নিষেধ। সুতরাং মদ হওয়ার পূর্ব্বে উহাকে খাইলে পেটে যাইয়া মদ হইবে।" অপরে বলিলেন, "আমরা তো মদ খাইলাম না, তথাগতের আদেশ তো পালন করিলাম, পেটে যাইয়া মদ হইলে আমরা কি করিব।"

(৯) কপ্পতি অদশকং নিষীদনং:—নিষীদন শব্দের অর্থ আসন। আর দশা শব্দের অর্থ কাপড়ের ছিলে। যে আসনের ছিলে না থাকে, বৌদ্ধদের তাহাতে বসিতে নাই। ছিলেগুলি কাটিয়া ছাঁটিয়া দেখিতে যে সুন্দর আসন হয়, তাহাতে বসা ভিক্ষুদের নিষেধ। ভিক্ষুরা অনেকে চা'ন এইরূপ সুন্দর আসনে বসিতে। বৃদ্ধেরা বলেন, তাহাতে ভগবানের যে আজ্ঞা আছে 'উচ্চাসনে বা মহাসনে বসিবে না', সে আজ্ঞা লঙ্ঘন হয়। অতএব ছিলাকাটা আসনে বসিতে নাই। বিরুদ্ধবাদীরা বলিলেন, ছিলা কাটিলাম আর না কাটিলাম তাহাতে কি আসিয়া গেল? আমরা উচ্চাসনেও

বসিতেছি না, মহাসনেও বসিতেছি না। তবে আমরা ভগবানের আজ্ঞা কি করিয়া লঙ্ঘন করিলাম।

(১০) কপ্পতি জাতরূপরজতবিত্তি :—সোণারূপা গ্রহণ করা বুদ্ধদেবের আদেশে ভিক্ষুদের নিষেধ। কিন্তু বৈশালীর ভিক্ষুরা ছলে ও কৌশলে সোণারূপা লইতেন। কিরূপে লইতেন তাহার উদাহরণ দেখুন। তাঁহারা উপোষথ-শালায় একটি জলপূর্ণ পাত্র রাখিতেন এবং উপাসকদের বলিতেন, তোমরা এই জলে কার্ষাপণ কাহাপন বা কাহন ফেলিয়া দাও। তাহারা ফেলিয়া দিত, ভিক্ষুরা সোণারূপা ছুঁইতেন না, কিন্তু আপনাদের লোক দিয়া সেগুলি তুলিয়া লইয়া খরচ করিতেন। কার্ষাপণ বলিতে সেকালে চৌকা চৌকা তামার পয়সা বুঝাইত। বৃদ্ধেরা বলিলেন, ইহার দ্বারা বুদ্ধের আজ্ঞা লঙ্ঘন হইল। অন্য ভিক্ষুরা বলিলেন, আমরা তো ছুঁইলাম না, কি করিয়া বুদ্ধদেবের আজ্ঞা লঙ্ঘন হইল। সুতরাং এটিও বিবাদের কারণ হইল।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর ঠিক এক শ বৎসর অতীত হইয়া গেলে, বৈশালীর ভিক্ষুরা বিশেষতঃ যাহারা বজ্জী বংশে জন্মিয়াছিল, তাহারা এই দশ বস্তু চালাইবার চেষ্টা করিতেছিল। এমন সময় যশ নামে একজন ভিক্ষু বৈশালীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাদিগের দশবস্তু চালাইবার চেষ্টা যে ধর্ম্মবিরুদ্ধ এ বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ রহিল না। তিনি প্রথমেই মহাবনবিহারে উপোষথ-শালায় দেখিলেন একটা ধাতুপাত্রে জল রহিয়াছে, উপাসকেরা তাহাতে কাহাপন দিতেছে। তিনি বলিলেন, এটা বড় দোষের কথা। তিনি উপাসকদিগকে বারণ করিয়া দিলেন, তোমরা দিও না। বৈশালীর ভিক্ষুরা খুব চটিয়া গেল। তাহারা নানারূপে তাঁহার উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। তিনি পলাইয়া কৌশাম্বী গেলেন। এবং সেখান হ'তে পাবা ও অবন্তীতে ভিক্ষুদের নিকট লোক পাঠাইয়া দিলেন ও নিজে অহোগঙ্গ পর্ব্বতে গমন করিলেন। সম্ভূত শোন-

বাসী অহোগঙ্গ পর্ব্বতে বাস করিতেন। যশ তাঁহার নিকট সকল কথা বলিলেন। ক্রমে পাবা হইতে ৬০ জন ও অবন্তী হইতে ৮০ জন ভিক্ষু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যে রেবত সকলের চেয়ে প্রাচীন ও সকলের চেয়ে বিদ্বান। তাঁহাকে এ কথা জানান যাক। তিনি তক্ষশীলার নিকট বাস করিতেন। সহজাতি নামক স্থানে রেবতের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। রেবত শুনিয়া বলিলেন, এ দশটাই ধর্ম্মবিরুদ্ধ এবং এই দশটাই উঠিয়া যাওয়া উচিত। বৈশালীর ভিক্ষুরা তাঁহাকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন এবং তাঁহার এক শিষ্যকে বশ করিয়া ফেলিলেন। রেবত তাঁহাদের কথা শুনিলেন না এবং শিষ্যটিকে বিদায় করিয়া দিলেন। বৈশালীর ভিক্ষুরা পাটলীপুত্রের রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইল না।

সহজাতিতে ১১৯০ হাজার ভিক্ষু আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু রেবত বলিলেন, যাহারা এ বিবাদ উপস্থিত করিয়াছে তাহাদের সম্মুখেই এ বিবাদের নিষ্পত্তি হওয়া উচিত। অতএব তোমরা বৈশালী চল। সেখানে রেবত দেখিলেন যে লোকে বাজে কথা কহিয়া সময় নষ্ট করিতেছে। সুতরাং তিনি প্রস্তাব করিলেন উব্বাহিকা করিয়া ইহার নিষ্পত্তি কর। অর্থাৎ আটজন লোককে বাছিয়া লইয়া তাহাদের হাতে নিষ্পত্তির ভার দাও। ৮ জন বড় বড় ভিক্ষু বাছিয়া লওয়া হইল। ইহাদের সকলেরই বয়স এক শতের উপর। ইহারা সকলেই তথাগতকে দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই দশবস্তুর বিরুদ্ধে মত দিলেন। ক্রমেই সে মত প্রচার হইল। যাঁহারা সে মত গ্রহণ করিলেন, তাঁহাদের নাম হইল স্থবিরবাদী অথবা থেরাবাদী। যাঁহারা গ্রহণ করিলেন না, তাঁহাদের নাম হইল মহাসাঙ্গিক। এইরূপে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর একশত বৎসর পরে দশটি সামান্য কথা লইয়া ঝগড়া হইয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মের দুই দল হইয়া গেল।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

বৃন্দাবনে

[বাঁশী ও কবি]

বাঁশী। সেই আমি সেই আমি
আর নহে কেহ।
রাধা রাধা রাধা রাধা
আধা মোর দেহ।

কবি। কোথা বাজে ও বাঁশরী?
যমুনার তীরে
মৃদু মৃদু মধু মৃদু
ধীর সমীরে।
আয় লো ললিতে আয়
আয় চন্দ্রাবলী,
শোন কি মধুর ভাবে
বঁধুর মুরলী।

বাঁশী। সেই আমি, সেই আমি,
আর নহে কেহ।
লো নব অঙ্গিনী সব
তোরা শুধু দেহ।
ওলো পাত্র ভেদে বারি যথা
নীল পীত সিত,
সই, আমারি মাধুরী তোরা
নোস্‌ গরবিত।
ওলো হয়েছিনু হইয়াছি ;—
আর যাহা হব,

ও সেই পুরাণো সোণায় গড়া
নিত্য অভিনব।

কবি। আয় আয় গোপবধূ
তোদের ভাগ্যে নাহি ওর
শুনায় গোপন কথা
মোর গোপেন্দ্র কিশোর!
আয় লো বিশখা আয়
আয় চন্দ্রকলা,
বাসন্তী যামিনী রাজে
মোর বঁধু উতলা!
সরম ভরম ত্যজি
আও গোপ নারী
ঐ শ্যাম যমুনায় ডারি
কনক গাগরী
রুনি ঝুনি রুনি ঝুনি
আইস কিশোরী,
রাধা বোলে সাধা
ডাকে মোর শ্যামের বাঁশরী।

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

মায়ের দেখা

জননী তুমি কখন এসে দাঁড়ালে,
শিউলি বনে ছায়ার আধ-আড়ালে ?
কমল মুখে মধুর হাসি
অরুণ ভাঙ্গা সুধার রাশি,
ভুবন ভরে কেমন করে ছড়ালে,
দূর্ব্বাদলে চরণখানি বাড়ালে ?

ভোরের আলো অমিয়াসরে নাহিয়া,
মেঘেরা চলে ধরণী পানে চাহিয়া।
তোমার দু'টি চরণ-রাগে,
দীঘির বুকে কমল জাগে,
ঘুমের চোখে পাখীরা উঠে গাহিয়া ;
শিশির ঝরে ধানের শীষ বাহিয়া।

নয়নে তব করুণা সুধা উছলে !
উজল দিঠি কোমল ঘন কাজলে।
ভ্রমর পড়ে চরণ-গীতা,
বরণ করে অপরাজিতা,
কামিনী বন কুসুম ঢালে আঁচলে,
সীঁথিতে শুক তারকামণি উজলে !

উদয়গিরি অস্তগিরি ঘিরিয়া,
সজল চোখে কাহারা দেখে ফিরিয়া ?
ধবল গিরি কনক চূড়ে
কাহার জয়পতাকা উড়ে ?

উঠিছে দিশি শঙ্খনাদে ভরিয়া।
রচণ ঘিরি কুসুম পড়ে ঝরিয়া!

রিক্ত করে সিক্ত চোখে দাঁড়ায়ে,
ছিলে গো দেবি, যুগল বাহু বাড়ায়ে,
ঘুচায়ে আজি চিত্ত-মসী
কে দিল হাতে দীপ্ত অসি,
বিল্বদল চরণতলে ছড়ায়ে,
গলায় দিল জবার মালা জড়ায়ে?

সেজেছে মাগো এবার ভাল সেজেছে,
মূরতি হেরি হৃদয়বীণা বেজেছে।
মিলিছে কেশ জলদজালে
দীপিছে রবি বিমল ভালে
আঁধার ভাঙ্গি নূতন আলো এসেছে—
শঙ্কাহর ডঙ্কা তব বেজেছে!

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

প্রেম ও পরিণয়

[গোবর গণেশের গবেষণা ।]

ভবের হাটে সকলেই বেচাকেনা করিতে আসে। এখানে হরেক রকমের কারবার চলিতেছে। যাহাকে আমরা সংসার বলি তাহাও এক রকম কারবার—একটি ফারম্‌বিশেষ। এই ফারমের সাইন-বোর্ডে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে—"কর্ত্তা গিন্নী এণ্ড কোম্পানি"।

এই কারবারের মূলধন হচ্চে দাম্পত্যপ্রেম বা মধুর রস। Capitalist Partner রূপে স্ত্রীকেই এই মূলধন যোগাইতে হয়; তাঁহার পুঁজীতেই এই কারবার চলিয়া থাকে। স্বামী হচ্চেন Working Partner অর্থাৎ শূন্য অংশীদার। সুতরাং তিনি সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত খাটিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইবেন। তাঁহার এই সকল ঘর্ম্মবিন্দু ঘনীভূত ও crystalised হইয়া যথাসময়ে মণিমুক্তার আকারে তাঁহার অংশীদারের শ্রীঅঙ্গের শোভা সম্পাদন করিবে। স্বামীর ইহাই ন্যায্য লভ্যাংশ; তিনি ইহার অধিক দাবী করিতে পারেন না,—করিলে ধনী চটিয়া গিয়া মূলধন তুলিয়া লইয়া কারবার বন্ধ করিয়া দিবেন।

লাভের ভাগ লইয়াই অংশীদারদের মধ্যে মনোমালিন্য ও বিরোধ হয়। কর্ত্তা গিন্নী কোম্পানির মধ্যে এইরূপ বিরোধের নামান্তর হচ্চে দাম্পত্য-কলহ। ইহার বহ্বারম্ভ হইলেও ক্রিয়া অতি লঘু, তাই রক্ষা। বিরহান্তে মিলনের ন্যায় কলহান্তে আলিঙ্গনেই সকল গোলযোগ মিটিয়া যায়। তখন কারবার আবার জোরে চলিতে থাকে।

কি কি কারণে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বিরোধ ঘটে তাহা সকলেরই ভাবিয়া দেখা উচিত, যেহেতু এই বিরোধে সংসারের শান্তি নষ্ট

হয়। আমিও এসম্বন্ধে কিছু গবেষণা করিয়াছি। খৃষ্টানী মতে ভগবান আদিমানুষের পঞ্জর হইতে রমণী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এটা কেবল কথার কথা। আমরা সকলেই স্ত্রীকে স্তোক দিয়া বলিয়া থাকি—"তুমি আমার বুকের কলজে।" ফলতঃ স্ত্রী যদি পুরুষের বুকের কলিজা বা পাঁজর হইত, তাহা হইলে সংসারে দাম্পত্য কলহের অস্তিত্ব থাকিত না।

কোরাণ সরিফে লেখে যে স্ত্রীলোকের মধ্যে আত্মা নাই। সুতরাং মুসলমানী মতে স্ত্রী হচ্চে প্রাণহীন পুত্তলিকাবিশেষ। এটি ওয়াজিব্ কথা। অনেক ঘরে দেখিতে পাওয়া যায়, রমণী যেন পুরুষের হাতে কলের পুতুল; পুরুষ এই মাটির পুতুলকে ইচ্ছামত ভাঙ্গিতে গড়িতে ও নাচাইতে পারে। আর এক কারণেও মনে হয় স্ত্রীজাতির মধ্যে আত্মা নাই। আমরা পুরুষ মানুষ—আমাদের আত্মা আছে; তাই আমরা জগতের যতকিছু ভাল জিনিস সর্ব্বাগ্রে নিজেদের গ্রাসে দিয়া বসি—অর্থাৎ আত্মার ভোগ লাগাই। রমণী কিন্তু ভাল জিনিস নিজের মুখে না দিয়া পরের মুখে তুলিয়া দেয়। তাহার ভিতরে আত্মা থাকিলে সে কখনই এরূপ করিতে পারিত না। সুতরাং প্রমাণ হইল যে রমণীর আত্মা নাই। এখন তাহাকে এই কথাটি বুঝাইয়া দিতে পারিলেই সংসারের সকল গণ্ডগোল চুকিয়া যায় তাহার আত্মপ্রতিষ্ঠা বা self-assertionএর চেষ্টা হইতেই দাম্পত্য-কলহের উৎপত্তি হয়। যাহার আত্মা নাই, তাহার আবার আত্মপ্রতিষ্ঠা! যার মাথা নাই তার মাথাব্যথা!

তবে আত্মার অভাব পূরণ করিবার জন্য ভগবান রমণীর বুকের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড হৃদ্‌পিণ্ড (hypertrophied heart) দিয়াছেন। স্ত্রীলোকের এই জাতিগত হৃদ্‌রোগের জন্য পুরুষের সঙ্গে তাহার অনেক সময় বিরোধ বাধে। রমণী-হৃদয় পুরুষের সংস্পর্শে আলোড়িত হয়। এই হেতু স্বামীর কোনরূপ বেচাল দেখিলে স্ত্রীর প্যাল্‌পিটেশন ও হিষ্টিরিয়া হয়। নারী হৃদয় প্রস্তরবৎ নিস্পন্দ হইলে

পুরুষের সহস্র ত্রুটিবিচ্যুতিতেও সংসারে অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত না।

রমণীগণ সামান্য খুটিনাটি লইয়া পরস্পরে খেয়োখেয়ি করিতে বিশেষ মজবুত, একথা পাঠিকাগণ স্বীকার করিবেন কি না বলিতে পারি না। স্ত্রীলোকদের কথায় কথায় মতভেদ ও ঝগড়া হয়, ইহা সকলেই জানে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, একটি বিষয়ে জগতের সকল স্ত্রীলোক একমত। তাঁহারা সকলেই বলেন, স্বামীর দোষেই স্ত্রী বিগড়াইয়া যায়। রাস্কেল স্বামী বাহিরে চরিয়া রোজ রাত্র ১টার সময় বাড়ী আসে বলিয়াই তাহার স্ত্রী দুষ্টা হয়। স্বামী বেচারা বলিবে, তাহার স্ত্রী দুষ্টা বলিয়াই তাহাকে বাহিরে চরিয়া বেড়াইতে হয়, কারণ সংসার তাহার কাছে শ্মশান। এখন প্রশ্ন হচ্চে এই যে, দোষ কোন্ পক্ষে? পুরুষ পক্ষে, না স্ত্রী পক্ষে? আমি দুষ্ট পুরুষদিগকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগকে not guilty বলিব; এবং বিগড়ান স্ত্রীদিগকে দুই ভাগ করিয়া এক ভাগের স্কন্ধে ষোল আনা দোষ চাপাইব।

কেহ কেহ বলেন, Jealousy বা ঈর্ষাতে দাম্পত্য প্রেমের রঙ্ চড়াইয়া দেয়, তাহাতে প্রেমের পাথারে তরঙ্গ তোলে। আমি বলি, ইহা হইতে ঝড় তুফান পর্য্যন্ত আসিতে পারে এবং তাহাতে দাম্পত্য সুখের ভরাডুবিও হইতে পারে। ঈর্ষা হচ্চে ব্যক্তিবিশেষের প্রকৃতিগত দোষ। কি পুরুষ, কি রমণী, ঈর্ষার আগুন যাহার ভিতর থাকিবে, বুঝিতে হইবে, সে নিশ্চয়ই বিবাহের পূর্ব্বে ভাই-ভগ্নীকে ঈর্ষা করিয়াছে, এবং বিবাহের পর দাম্পত্য জীবনে এই আগুন জ্বালাইয়া সংসারের শান্তি নষ্ট করিবে; এবং বার্দ্ধক্যে সে পাত্রাভাবে পুত্রকন্যার উপরেও ঈর্ষা করিতে ছাড়িবে না। কবিরাজেরা বলেন যে, মধুকে আগুনে চড়াইলে বিষ হয়। আমি বলি মধুর রসকে ঈর্ষার আগুনে উত্তপ্ত করিলে তাহাও বিষে পরিণত হয়।

দাম্পত্য সম্বন্ধের মধ্যে কৃতজ্ঞতার দাবী চলে না। স্বামী যদি

স্ত্রীর কোন উপকার করেন, এবং সেজন্য তিনি যদি কৃতজ্ঞতার দাবী করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ঠকিতে হইবে। এই দাবী না করিলে হয় ত স্ত্রী যথেষ্ট প্রেমদানে তাঁহার নিকট অঋণী হইবেন। কৃতজ্ঞতার দাওয়া হচ্চে প্রেমের দম্বল—তাহাতে মধুর রস একদম টক্ হইয়া যায়। স্ত্রীপুরুষ উভয়ের পক্ষেই একথা খাটে। খাতক-মহাজনের সম্বন্ধও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্থান পায় না। সুরসিক ফরাসী লেথক ম্যাক্স্-ও-রেল দাম্পত্য-তত্ত্বের কিছু গবেষণা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, অর্দ্ধাঙ্গিনীকে টাকা ধার দিয়া তাহার জন্য কথনও তাগাদা করিবে না, বা তাহা ফিরিয়া পাইবার প্রত্যাশা রাখিবে না। বরং যদি তোমার স্ত্রী তাহা ফেরত দেন, তাহা হইলে সেই টাকা দিয়া একখানি সুন্দর গহনা গড়াইয়া তাঁহাকেই হাস্যমুখে উপহার দিবে। এইরূপ করিলেই মধুর রস ওতপ্রোত থাকিবে এবং তোমার প্রাপ্যগণ্ডা সুদে আসলে আদায় হইবে।

ইতর জীবজন্তুর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, স্ত্রী কুরূপা এবং পুরুষ সুন্দর। সিংহীর কেশর নাই সিংহের আছে। ময়ূরের সৌন্দর্য্য ময়ূরীর অপেক্ষা অনেক অধিক। মুরগী দেখিতে নেড়াবোঁচা; কিন্তু মোরগের পালক ও চূড়ার বাহার ধরে না। ইহাতে মনে হয়, ইতর প্রাণীর মধ্যে ভগবান পুরুষের উপরে স্ত্রীর মনোরঞ্জন করিবার ভারার্পণ করিয়াছেন। কিন্তু মনুষ্যজাতির বেলায় তাঁহার বিধান অন্যরূপ। তিনি স্ত্রীলোককেই রূপ ও রমণোপযোগী গুণে ভূষিতা করিয়াছেন। তাই স্ত্রীজাতি সাজগোজ করিতে এত ভালবাসে। ইহা দেখিয়া অল্পবুদ্ধি পাঠক হয় ত ঠিক করিয়া লইবেন, পুরুষের চিত্তবিনোদন করিবার জন্যই রমণীর সৃষ্টি। আমি বহু গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, রমণী পুরুষের জন্য বেশভূষা করে না। বোসেদের ছোট বৌ যে জড়োয়া গহনায় সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া ঝক্ মারিতে থাকে, তাহা কেবল সরকারদের মেজ বৌয়ের উপর টেক্কা দিবার জন্য—তাহার স্বামীর চক্ষু ঝলসিবার জন্য নহে। স্ত্রীলোক

বেশভূষার পরিপাটি করে অপর স্ত্রীলোকের ঈর্ষা উৎপাদনের জন্য। ইহা করিতে পারিলেই সে তাহার সাজগোজ সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিবে। এইজন্য পর্দ্দাপার্টিতে বড় ঘরের রমণীরা সাজগোজের চূড়ান্ত করিয়া আসেন; সেখানে ত পুরুষদৃষ্টির প্রবেশাধিকার নাই। স্ত্রীচরিত্রজ্ঞ রসিক ম্যাক্স ও-রেল বলিয়াছেন, "যদি কোনদিন পৃথিবী হইতে সকল স্ত্রীপুরুষ লোপ পাইয়া কেবল দুইটিমাত্র রমণী অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে ঐ দুইজনের মধ্যে তখন অবিরাম বেশভূষার সংগ্রাম চলিতে থাকিবে এবং তাহারা পোষাকের বাহারে পরস্পরকে পরাস্ত করিতে চেষ্টা করিবে।" ইহাই হচ্চে স্ত্রীচরিত্রের বৈচিত্র্য।

স্ত্রী অভ্রান্ত বা চালচলনে অত্যধিক খাঁটি হওয়া সুবিধা নয়। যে স্ত্রী তাঁহার স্বামীর কাছে ভুলচুক্ করিয়া অপ্রস্তুত হইতে জানেন না, তাঁহাকে লইয়া স্বামী সুখী হন না। এরূপ স্ত্রী যে খুব strict হইবেন তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি স্বামীর সামান্য ত্রুটিও উপেক্ষা করিবেন না, পান থেকে চূণ খসিলেই খড়গহস্ত হইবেন। এহেন স্ত্রী যে গৃহে বিরাজ করিবেন, সে গৃহ যেন একটি বিচারালয়, স্বামী বেচারী যেন আসামী, এবং স্ত্রী যেন জজসাহেব—সর্ব্বদাই বিচারে বসিয়া আছেন। পুরুষ ও রমণীর পক্ষে সংসার হচ্চে পদে পদে পদচ্যুতির ক্ষেত্র। এখানে দুর্ব্বলা রমণী হামেষাই ভুল করিয়া বসিবেন এবং স্বামীর নিকট তজ্জন্য 'সাপরাধী' হইবেন; স্বামী তাঁহাকে চুম্বন দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। স্বামারই দণ্ডদাতা হওয়া উচিত; তাহাতে order ঠিক থাকে।

প্রেমরোগগ্রস্ত কোনও পুরুষ যেন রমণীর পদানত হইয়া কর-জোড়ে না বলে, "আমি তোমায় অত্যন্ত ভালবাসি"। যে আহাম্মক এরূপ করিবে সে কিছুতেই রমণীর ভালবাসা পাইবে না—কৃপা পাইতে পারে। প্রেম নিম্নগামী—ইহার ঊর্দ্ধপাতন অসম্ভব। কর্পূ-রাদি volatile পদার্থেরই ঊর্দ্ধপাতন হইয়া থাকে। প্রেমকে এই-রূপ বস্তু মনে করিয়া ঊর্দ্ধপাতনের চেষ্টা করিলে তাহাও কর্পূরের

মত উবিয়া যাইবে। কৈলাসশিখরে বসিয়া মহাদেব পার্ব্বতীকে অঙ্কে লইয়া সস্নেহে প্রেম সম্ভাষণ করিতেন। আমার মনে হয়, ইহাই প্রেমজ্ঞাপনের সঠিক চিত্র। স্ত্রী ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবে, স্বামী নতমুখে স্ত্রীর পানে তাকাইবে; মধুর রস উর্দ্ধ হইতে নিম্নে পড়িবে—যথা চাতকিনীর মুখে বারিধারা। অতএব স্ত্রীর অপেক্ষা পুরুষের ধনে মানে, গুণে জ্ঞানে, বয়সে ও হাতে-ওসারে কিছু বড় হওয়া আবশ্যক। ম্যাক্স-ও-রেল রমণীর পাণিগ্রহণ বিষয়ে এই পরামর্শ দিয়াছেন—"Marry her at an age that will always enable you to play with her all the different characteristic parts of a husband, a chum, a lover, an adviser, a protector and just a tiny suspicion of a father."

দাম্পত্য প্রেম কলাবিদ্যানুশীলনের সহায় না অন্তরায়?—এই প্রশ্ন লইয়া বহুকাল হইতে অনেক বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। আমি বলি, ইহা ঘোর অন্তরায়। সুদক্ষ চিত্রকর নিভৃতে বসিয়া তন্ময় হইয়া চিত্র আঁকিতেছেন; সেখানে তাঁহার প্রণয়িণী আসিয়া তাঁহার গণ্ডে একটি উৎসাহসূচক চুম্বন দিয়া গেলে নিশ্চয়ই তাঁহার তুলির গতির ব্যতিক্রম হইবে। কথিত আছে, এক প্রসিদ্ধ কবি তাঁহার পাঠাগারে বসিয়া কালিকলম লইয়া একমনে কবিতা লিখিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার স্ত্রী আসিয়া ধোপার হিসাব লিখিবার জন্য তাঁহার হাত হইতে একবার কলমটি চাহিয়া লইয়া গেলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে কলম ফিরিয়া আসিল বটে; কিন্তু সে কলম হইতে আর কয়েক দিনের মধ্যে কবিতার অমৃত-নিস্যন্দিনী ধারা বাহির হইল না। স্ত্রীর অঞ্চলের হাওয়ায় কবিত্বের ব্যাঘাত জন্মে। এজন্য স্ত্রীকে কবি-স্বামীর কাছ থেকে অনেক সময় তফাতে থাকিতে হয়। তাই কবিবর বায়রণ বলিয়াছেন, কবির অর্দ্ধাঙ্গিনী হওয়ার মত স্ত্রীলোকের দুর্ভাগ্য আর নাই। কোন রসিক পাঠক হয় ত জিজ্ঞাসা করিবেন, তবে রজকিনীর অঞ্চল সঞ্চালনে মহাকবি চণ্ডীদাসের কবিতা ফুটিয়া উঠিত কি করিয়া? উত্তর—সে যে "পরকীয়া"। পরকীয়া প্রেম আর্টের অন্তরায় নয়। বঙ্গরঙ্গমঞ্চ-

গুলি এ কথায় যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিতেছে। এই সকল রঙ্গমঞ্চে "পরকীয়া" পদাঘাতের নূপুর-নিক্কণে চৌষট্টি কলা ফুটিয়া ওঠে।

পুরুষ রমণী উদ্বাহের উদ্বন্ধন গলায় পরিলে বীণাপাণি তাহাদের প্রতি কিঞ্চিৎ বাম হন। স্বামী-স্ত্রীর সংসারে আর্ট-কার্ট বেশী দিন টেঁকে না। দাম্পত্য জীবনের উপর লক্ষ্মী ও ষষ্ঠীর দৃষ্টিই ভাল। কেহ কেহ বলেন যে এখানে, বিশেষতঃ স্ত্রীর উপর, সরস্বতীর দৃষ্টি তত বাঞ্ছনীয় নহে। সংস্কারবাদী বলিবেন, খনা গার্গী লীলাবতীর মত রমণী বঙ্গের ঘরে ঘরে শোভা পাওয়া কর্ত্তব্য। তা'হোলেই ত চক্ষুস্থির! মার্কিণদেশে অনেকটা এই ভাব হইয়া আসিতেছে। কিছুদিন হইল একজন মার্কিণ সাহেব অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের দেশে মেয়ে ডাক্তার, মেয়ে উকিল-ব্যারিষ্টার, মেয়ে সম্পাদক, মেয়ে লেখক ও মেয়ে বক্তার সংখ্যা খুব বাড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু "মেয়ে স্ত্রীলোক" বা female women এর সংখ্যা বিলক্ষণ কমিয়া আসিতেছে। ম্যাক্স-ও-রেল বলিয়াছিলেন—"I would rather be the husband of a simple little dairymaid than that of a George Sand or a Madame de Stael।" বিদ্যারও মাদকতা আছে। এই মাদক সেবন করিলে স্ত্রীলোক সহজেই উন্মত্ত হইয়া পড়ে। পুরুষ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া চেষ্টা করিলে নেশা একেবারে ত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু স্ত্রীলোক নেশাকরা একবার অভ্যাস করিলে আর জীবনে সে অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারে না। অতএব অবলাকে বিদ্যা উদরস্থ করিতে হইবে সাবধানে টনিক ডোজে—যেন তাহাতে নেশা না হয়।

স্ত্রীপুরুষের যৌবনে দাম্পত্যপ্রেমের যেরূপ হেউটেউ চলিতে থাকে, বয়স গড়াইয়া আসিলে তাহা মন্দীভূত হয়। অধিক বয়সে শরীরের সকল রসের সঙ্গে মধুর রসও শুকাইতে সুরু করে। ডবকা বয়সে যে পুরুষ তাহার স্ত্রীকে পলকে হারায়,

হয় ত পঞ্চাশের পরপারে গিয়া তাহার সেই স্ত্রীর জন্য আর ততটা থাকিবে না। প্রেমের নদীতে মাত্র একবার জুয়ার আসিয়া তাহাকে কাণায় কাণায় ভরিয়া তোলে; তারপর ভাঁটা পড়িতে আরম্ভ হয়। এই ভাঁটাই শেষজীবন পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। বার্দ্ধক্যের মরা গাঙ্গে আর ফিরে বান ডাকে না। যখন প্রথম ভাঁটার টান দেখা দেয়, তখন স্ত্রী হয় ত তাঁহার স্বামীর ব্যবহারের শৈত্যে কিছু ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন। বয়সদোষে স্বামীর ক্ষুধামান্দ্য হইয়া আসিতেছে, ইহা স্ত্রীর বোঝা উচিত। এ অবস্থায় রমণীর কর্ত্তব্য হচ্চে রকমারী উপাদেয় তেলাল-ঝালাল তরকারী প্রস্তুত করিয়া স্বামীর মুখের কাছে ধরিয়া তাঁহার রুচি-বৃদ্ধির চেষ্টা করা। তাহা না করিয়া তিনি যদি মানময়ী রাধে হইয়া অভিমানে বদন ফিরাইয়া বসেন, তাহা হইলে বেচারী স্বামীর প্রতি তাঁহার অবিচার করা হইবে।

অষ্টাদশ পুরাণের যুগে এদেশে বিবাহে পণপ্রথা প্রচলিত ছিল। তখন কন্যা বা কন্যার পিতা পণ না দিয়া পণ করিয়া বসিতেন; তাহা লইয়া স্বয়ম্বর সভা এবং লাঠালাঠিও হইত। তখন আসুরিক ও গান্ধর্ব্বাদি অনেক বিটকেল বিবাহ চলিত ছিল। তারপর মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দুধর্ম্ম যখন মধ্যাহ্নে মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তীব্র কিরণজাল বিস্তার করিয়া সমাজকে আলোকিত করিয়া তুলিল, তখন আমাদের স্বর্গীয় কর্ত্তারা মনুর মতে অষ্টমে গৌরীদান আরম্ভ করিলেন। এই সুন্দর সভ্য বিবাহ-প্রথা এতাবৎ নির্ব্বিবাদে চলিয়া আসিতেছিল। দুঃখের বিষয়, আজকাল এই বিবাহের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতেছে। এখন ব্রাহ্মদিগের দেখাদেখি হিন্দুসমাজেও বিধবা বিবাহ, Love Marriage ও Late Marriage আসিয়া পড়িতেছে। যে মধুর রস এতদিন হিন্দু-বিবাহের পরবর্ত্তী ছিল, তাহা এখন তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইতেছে। সুতরাং পরিণয়াভিলাষী পুরুষ ও রমণীকে তাহাদের অর্দ্ধাঙ্গ নির্ব্বাচন বিষয়ে কিঞ্চিৎ পরামর্শ দেওয়া আবশ্যক।

কোন কোন পুরুষ স্ত্রীজাতিকে আদৌ দেখিতে পারে না। আমি ইহাদিগকে রমণীবিদ্বেষী পুরুষ বলি। এরূপ পুরুষকে কোন রমণীরই বিবাহ করা উচিত নয়। কোন কোন নির্ব্বোধ রমণী হয় ত বলিবেন যে, এরূপ নারী-বিদ্বেষী স্বামী পাইলে তাহার স্ত্রীকে আর ভবিষ্যতে কখনও ঈর্ষার আগুনে পুড়িতে হইবে না, যেহেতু এরূপ পুরুষের চোখে সকল স্ত্রীলোকই বিদ্বেষের পাত্রী। এটি নিতান্ত ভুল। সকল দিকে কৃপণ না হইলে পুরুষ রমণীবিদ্বেষী হয় না। এরূপ পুরুষকে স্বামীরূপে লাভ করিয়া স্ত্রী তাহার নিকট হইতে মধুর রস আদায় করিতে পারিবেন না। সুতরাং এ বিবাহ বিড়ম্বনা মাত্র। আমার মতে, ইহা অপেক্ষা নারীভক্ত পুরুষকেই বিবাহ করা কর্ত্তব্য। হয় ত এরূপ পুরুষ প্রেম বিলাইবার উদ্দেশে একাধিক রমণীর পশ্চাতে ধাবমান হইতে পারে। কিন্তু যে ভাগ্যবতী রমণী এহেন পুরুষপুঙ্গবকে স্বামীরূপে পাকড়াও করিয়া প্রেমের পিঞ্জরে পুরিতে পারিবেন, তিনিই জয়-পতাকা উড়াইতে সক্ষম হইবেন।

আবার যে রমণীকে বিবাহ করিতে চেষ্টা করিয়া অনেক পুরুষ ফেল হইয়াছে, তাহাকেও কোন পুরুষের বিবাহ করা কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু প্রেমান্ধ নির্ব্বোধ পুরুষগণ কি আমার এই অমূল্য উপদেশ গ্রাহ্য করিবে? একশ্রেণীর লোক আছে, যাহারা কেবল নিলামের সময়ই মালের কিম্মৎ বুঝিতে পারে; যে মাল তাহারা পূর্ব্বে দশ টাকায় লয় নাই, তাহা নিলামে চড়িলে তখন হয় ত একশ টাকায় ডাকিয়া বসিবে, এবং তাহা তাহার গলায় পড়িবে। এই শ্রেণীর পুরুষ Highest Bid করিয়া স্ত্রীকে ঘরে আনিয়া পরে হায় হায় করে। যখন এই স্ত্রী ভয়ানক ভালবাসিয়া তাহার স্বামীকে বলিবে,— "ওগো, তুমি মরে গেলে আমি আর একদণ্ডও বাঁচব না", তখন স্বামী বলিয়া বসিবে—"যদি তাই ভয় হয়ে থাকে, তবে তুমি না হয় আগেই মরে পড়।" ফারখতের অন্য উপায় নাই।

শ্রীগোবর গণেশ দেবশর্ম্মা।

ভোগাতীতা

নহে নীরে, বঁধু-রূপে ভাসে আঁখি-তারা ;
নহে শোকে, প্রেম-যোগে যোগিনীর পারা।
নহে হাসি, দিব্য জ্যোতি বদনমণ্ডলে ;
নহে ফুল, তুলসীর মালা দোলে গলে।
শিরে বাঁধা চুলগোছা চূড়ার আকার,
চুপে চুপে বঁধু-নাম জপে অনিবার।
অঙ্গের লাবণি, নহে রূপের নিঝর,
সারা দেহে লুটে যেন প্রেমের লহর !
যে হেরে বালারে, তার নত হয় শির,
বঁধুর খেয়ান যেন ধরেছে শরীর !
বঁধুময়ী সে মুরতি হেরিয়া মদন
ফুল-ধনু ফেলি' লুটে ধরিয়া চরণ !
বাঁশী, হাসি, আলিঙ্গন—মিলনের দান,
ভোগাতীত করে হিয়া বিরহ মহান্ !

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

অদৃষ্টের পরিহাস

ভাঙ্গা-গড়া।

১

বিলাসিনী বাপের বাড়ী ফিরিয়া আসিল। ভাদ্রমাস; একবার করিয়া মেঘ আকাশ ঘেরিয়া ফেলিতেছে, আবার, খররৌদ্রের আলোকে আকাশ নীল ও বাতাস তপ্ত হইয়া উঠিতেছে। বিলাসিনীর হৃদয়েও মেঘ ও রৌদ্রের বিলাস। একবার করিয়া নিরাশা, একবার করিয়া কত আশা!

পিতা চক্ষের জলে কন্যাকে বুকে টানিয়া লইলেন। বিলাসিনীর মুখে যে তারই মাতৃমুখচ্ছবি! নীরবে নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, 'কে জানে তোর কপাল এমন পুড়িল কেন?' তাহার দাদা মুখের দিকে তাকাইতে পারিল না; তাহার বৌ'দি 'ঠাকুরঝি কি হ'লো ভাই' বলিয়া গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সবাই কাঁদিল, কেবল বিলাসিনীর চক্ষে জল নাই। পক্ষ্ম দুটি সিক্ত, আঁখি রক্তাভ; দেহ বায়ুতাড়িত শীর্ণ পত্রের মত কাঁপিতেছে।

তাহার পর সকলেই চক্ষু মুছিল, বিলাসিনীও মুছিল। সংসারেও মেঘ ও রৌদ্রের খেলা যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে লাগিল। কিন্তু মানুষের বুকের ভিতরে যে এক আগুন আছে, যে আগুনে মানুষ পুড়িয়া পুড়িয়া খাঁটী হয়, সে আগুন ধিকি ধিকি তেমনি জ্বলিতেছিল। মানুষ যে আগুন লইয়া ঘর করে!

২

পিতার আগুন নিভিয়া আসিতেছিল। রুগ্ন বৃদ্ধ উন্মুক্ত বাতায়ন দিয়া সুদূর আকাশের পানে চাহিয়া থাকিতেন; যেখানে সব ভস্ম

ফেলিয়া মানুষ ধোঁয়া হইয়া উড়িয়া যায়, পড়িয়া থাকে এই সংসারের সব।—বৃদ্ধ দেখিতেছিলেন একটি একটি করিয়া পারাবত উড়িয়া চলিয়াছে। বিলাসিনী দেখিতেছিল পার্শ্বের বাড়ীর প্রতিবেশীর দ্বিতল কক্ষে এক চিত্রকর চিত্র অঙ্কিত করিতেছে। রঙ তুলিকা চারিদিকে ছড়ান, চিত্রকর অনন্যমনে তাহার সেই ধ্যানের প্রতিমা গড়িতেছে। বিলাসিনীর বুকের ভিতর টিপ্ টিপ্ করিয়া উঠিল; তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল, একটা চাপা নিশ্বাস পড়িল। বিলাসিনী সেখান হইতে সরিয়া নিজের ঘরে গেল; মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার দাদার ছেলে মনু তাহার মাথার চুল ধরিয়া টানিতে লাগিল—ডাকিল 'পিছিমা!'—

৩

পিতা বলিলেন, 'আমার মৃত্যুর পর তুমি আছ; তুমি দেখ্‌বে, আমি বৃদ্ধ, রুগ্ন, শক্তিহীন, সমাজের সঙ্গে লড়াই করবার মত আয়োজন আমার নাই'। পুত্র বলিল, 'আমি কি বিলীকে বিলিয়ে দিতে বলছি! এ বিয়েতে আপনার অমত কেন, সমাজের ভয় আমার নেই! সমাজ আমার স্বস্তি, শান্তি কতটা দেখ্‌ছে, যে তার অনুশাসন আমায় মান্‌তে হবে? রাজা বিদেশী; সমাজের সঙ্গে তাঁর কোনই সম্পর্ক নেই। তিনি তাঁর তুলাদণ্ডে আমার ন্যায্য প্রাপ্য দিয়েছেন, তিনি ত আমার সমাজে আসেন নি, আমার তবে তুলাদণ্ড কোথায়? এ ক্রীতদাসের সমাজ চায় সকলেই হীন হয়ে থাকুক—হাজার হাজার বছর ধরে বামুনে এই করে এসেছে, তা বলে তাই মান্‌তে হবে!" পিতা বলিলেন, 'মেনে এসেছি চিরকাল। ব্রহ্মচর্য্য ত্যাগে নষ্ট হয় এ কথা কখন বুঝি নি,—বুঝতে পারিনি; ঋষিদের মানি, আর মানি অদৃষ্ট। তাই ভাবি, ভাঙা কপাল কি আর জোড়া লাগে বাবা! মেয়ে সুখে থাক্ বা থাকবে এ কি বাপের ইচ্ছে নয়, তবে হোল কই?' পুত্র বলিল,

'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে-পতৌ'—

পিতা বলিলেন, 'জানি ঋষি উদার, দিব্য চক্ষুষ্মান! তবু কাল ধর্ম্মে স্মৃতিকে ফেল্‌তে পারি কই? আমি ত পা বাড়িয়ে রয়েছি বাবা, ঋষিবাক্যের বোঝা আমার মাথায়, সংসারের বোঝাও আমার মাথায়; তবে এখন অশক্ত বৃদ্ধ, ইচ্ছা হলেও পেরে উঠব কি? পুত্র বলিল, 'তুমি অনুমতি দাও, আমি—' পিতা বলিলেন, 'বিবেচনা করা উচিৎ, একের জন্য দশের না ক্ষতি হয়। সমাজধর্ম্ম দশকে বাঁচাইবার জন্য। সমাজের মুখ ত চাইতেই হবে। আমার কন্যা আমার সমাজ হইতে বড় কি! আর আমার কন্যা কি সমাজের কেউ নয়!' পুত্র নীরবে নিশ্বাস ফেলিল। বিলাসিনী দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়া সকলই শুনিল। ফিরিয়া দেখিল, আমড়াগাছের ডালে এক জোড়া ঘুঘু ঠোঁটে ঠোঁট মিলাইতেছে। বিলাসিনী ভাবিল— 'হতেও পারে।' দূরে পূর্ব্বপ্রান্তে অন্ধকার মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছিল; সেখান হইতে সন্ধ্যাতারকা জ্বল্ জ্বল্ করিয়া তাকাইয়া রহিয়াছে। বিলী ভাবিল, 'তারার কথা বলা যায় না, ও ত এখনি নিভ্‌তে পারে।'

৪

পুত্রবধূ স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাগা, ঠাকুর কি বল্‌লেন?' পুত্র বলিল, 'ভাবিবার কথা; সমাজ কি বলবে।' বধূ বলিল, পোড়া সমাজ! সমাজ! এমন সোণার কমল যে ধূলোয় পড়ে শুখিয়ে গেল, পোড়া সমাজের ত চোখ নেই।' পুত্র বলিল, 'সমাজ যে পুরুষ!' বধূ চক্ষু মুছিয়া বিলাসিনীর কক্ষে গেল, বলিল, 'ঠাকুরঝি! শোন্, তোর মত আছে কি না বল?' বিলাসিনীর মুখ লাল হইয়া উঠিল; সে দ্রুত চলিয়া গেল। পার্শ্বের বাড়ীর প্রতিবেশী সেই চিত্রকর যুবক তখন ছবি আঁকিতে আঁকিতে ঝিঁঝিট খাম্বাজে সুর ভাঁজিতেছিল

'মন চুরি যে করেছে, তারে কি সই পাব আর'

৫

'কে রমণী? এস, আজ ক'দিন ধরে বুকের ভেতর বড় ধড়ফড় করছে; খাঁচার ভেতর পাখী যেমন ছটফটিয়ে ওঠে। তুমি ভাল আছ বাবা?'

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার বুকটা একবার ভাল করে কাউকে দেখালে হয় না?'

'আর দেখিয়ে কি হবে, দেখাদেখির ভরসা আর কেন, এদিকে ত সব ফরসা হয়ে আসছে, এখন পূরো আলোয় এলেই বাঁচি। হাঁ, বিলীর আঙুলে কি হয়েছে একবার দেখে যেয়ো, সে ত দেখাতেই চায় না।'

'না কিছু হয় নি' বলিয়া বিলাসী কাপড়ের মধ্যে হাত লুকাইল।

রমণী হাতখানা দেখিয়া, ছুরির মুখ দিয়া সেই অঙুলের কোনটা উস্কাইয়া দিল। বিলা কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রমণী যখন বিলাসিনার হাত ধরিয়া দেখিতেছিল, বিলাসিনীর সমস্ত দেহটা যেন ঝিম ঝিম করিয়া উঠিতেছিল। তাহার চক্ষু বাতায়নপথে দেখিল, চিত্রকর—শৈলেন্দ্র তেমনি তন্ময় হইয়া ছবি আঁকিতেছে। উন্নত নাশা, কুঞ্চিত কেশদাম, উজ্জ্বল চক্ষু।

৬

পরক্ষণেই শৈলেন্দ্রের চিত্রশালিকায় রমণী উপস্থিত। শারীরিক গঠনের—শৈলেন্দ্রের অঙ্কিত ছবির শারীরিক গঠনের—ভাব সম্বন্ধে তর্ক চলিতেছিল। রমণী বলে, 'আচ্ছা তোমাদের এ রকমটা কি বল দেখি, সমস্ত শরীরের সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি হতে দাও না কেন?'

'বলি শরীরটাই ত সব নয়—কেবল কতকগুলা মাংসপেশী এঁকে দিলেই কি সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি হল? ও সব তোমাদের ভুল; ভাবই শ্রেষ্ঠ।'

'বটে। ভাবে বুঝি সব অমনি হয়ে যায়? বুদ্ধকে পায়েস দেবার সময় সুজাতা বুঝি হাতে দু'খানা বাঁকারী বেঁধে দিয়েছিল'? না ভাবে অমনি বুঝি ডাইনী হয়ে গিয়েছিল?

'তোমরা ডাক্তার মানুষ, তোমরা কেবল শরীর-চক্রের চাকায় ঘুরে মর। তুমি, রোঁদার জীবনীতে যে সব ছবি বেরিয়েছে, দেখেছ?'

'বিলক্ষণ দেখেছি। তা তার সঙ্গে তোমাদের ত কোন মিল দেখিনে, রোঁদার সঙ্গে পাহারাওলার মত তোমরা শুধু রোঁদ দিয়ে বেড়াও এই টুকু ছাড়া'।

"তুমি সেই 'ভাবনা' ছবিখানাকে কি মনে কর"?

'তুমি কি মনে কর?'

'কেন খুব চমৎকার! রোঁদা যে সত্য নিয়ে বিশ্বের দরজায় মাথা কুটে মরেছে তাই সে এঁকেছে—সে ত হাত পা আঁকতে যায় নি, সে শুধু ভাবটাকে ওই জড় অস্ফুট পাথর থেকেই পাথরকে জীবন দিয়ে নারী মূর্ত্তিতে ফুটিয়ে তুলেছে। বুঝলে?"

'হ্যাঁ ভাবনা বটে, তা ভাবনার পরিণাম জড়তায়—হুঁ'।

'আমরাও তেমনি ভাবটাকে শুধু মুখে ফোটাতে চাই, সে যে রোঁদার দেখে তা নয়, এমনি আমাদের ভাব-সাধনা থেকে, এ যে একটা সাধন।'

'তোমাদের এ সাধন কি প্রসাধন তা আমার দ্বারা বোঝা অসম্ভব। তবে এটুকু বুঝি খোদার ওপর এ খোদকারী তোমাদের পাগলামী মাত্র।'

'যাক তুমি ও বুঝবে না হে বুঝবে না?'

'তা ভাল, সেদিন তোমার ওই যে ইয়ের বাড়ী গিয়েছিলুম ছবি দেখতে—অনেক ছবি দেখলাম; সে আমায় সঙ্গে সঙ্গে করে দেখালে—বনবাসে সীতা, অশোকবনে সীতা, সাবিত্রী, নচিকেতা, আর কত কি বিলিতী ছবি। সব আমরা খুব ত সুখ্যাৎ করলুম, তারপর

একখানা ছবির সামনে এসে দাঁড়াতেই তোমার ইয়ে ত কেঁদেই অস্থির, আমি বল্লুম 'ব্যাপার কি!'

সে বল্লে 'বুঝতে পারলে না, এইখানিই আমার সব চেয়ে চমৎকার ছবি।' আমি ত তার ভাবই বুঝলাম না। দেখলাম, শুধু যে একখানা কাগজের উপর শুধু একটা লাল বৃত্তাকার রেখা লেখা রয়েছে। সে তখন বললে "এর ভাব কি জান, এ ধ্যানের বস্তু, ও বড় করুণ কাহিনী, যুগ যুগান্তের অতীতের ইতিহাস। এই পথ দিয়ে মারীচের স্বর্ণমৃগরূপে রামকে নিয়ে পলায়ন, এই পথ দিয়ে লক্ষ্মণ সীতার নাক নাড়ায় তাড়া খেযে গেলেন। এই পথ দিয়ে এসে রাবণের সীতাকে হরণ। এই পথ দিয়ে সব হয়ে গেছে, কেবল পড়ে আছে ওই সে অতীতের সাক্ষী, সেই লক্ষ্মণের গণ্ডী, সীতার লজ্জাহীনতার শেষ পরিচয়—কি করুণ—বেদনায় রাঙা হয়ে রয়েছে। দেখি তোমার ইয়ের চক্ষু বয়ে ধারা গড়িয়ে পড়ছে। তা ভাই বেশ, এ একটা রকম বটে। শৈলেন্দ্র খুব হাসিয়া উঠিল, তারপর আবার রঙ ও তুলি লইয়া ছবিতে রঙের খেলা খেলিতে লাগিল। রমণী হাসিয়া বলিল, 'দেখ সব জিনিসেই একটা পূর্ণতা আছে। শুধু ওই ভাবটাকে বেশী জাগিয়ে তোলায় ভাবও হয় না, বস্তুও হয় না, যাকে আঁকতে গেলে যেমন যার যে সম্পর্কে মা তা বাদ দিলে চলে না, তেমনি সবটারই একটা সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি দেখানই ভাল; কেননা তাই হয়—'

'এখানা কি রকম হয়েছে'?

'মন্দ নয়, তবে সেই এক কথা, মুখখানার ভাব বিলীর, আর ধড়টা অজান্তার জানোয়ারী রকম; তোমার সব ছবিতেই দেখি বিলীর মুখ, কেবল ধড়টা দেখি আর একজনের।'

শৈলেন্দ্রের মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে সামলাইয়া লইয়া কহিল, 'তোমার সব তাতে ঠাট্টা। কিন্তু কি বলে ফেল্লে খেয়াল করেছ?—মুখ খানার ভাব।'

'তা মিথ্যে ত বলিনি, তুমি আঁক ছবি, আমি কাটি আঙুল!

শরীর চক্রের চাকায় আমি মরি ঘুরে, আর তুমি কেবল রূপের ঝলক আর রঙ নিয়েই থাক'।

'কি রকম ?'

'হ্যাঁ বিলীর নাকি আবার বিয়ে ?'

'বিয়ে !' শৈলেন্দ্রের হাত হইতে তুলি পড়িয়া গেল।

'হ্যাঁ ! বিয়ে ! চমকে উঠলে যে ? পুরুষে দশটা পারে, আর মেয়েতে পারে না ?'

'আমি ও সব ত কিছু বুঝি না।'

তা বুঝবে কেন, মানুষের সুখদুঃখু বোঝবার ত কোন দরকার নেই। রঙের রকমারী হলেই হোল। রমণী চলিয়া গেল।

শৈলেন্দ্র ভাবিতে লাগিল বিলাসিনীর কথা ; শৈশবে তাহার সঙ্গে এক সঙ্গে ক্রীড়া ; কৈশোরে বিবাহের কথা উঠিল, হইল না। জাতের মিল নাই, তাহার পর তার বিবাহ ; তারপর সে বিধবা, তারপর সবই তার কাছে এক একখানা ছোট ছোট ছবির মত মনে হইতে লাগিল।

হঠাৎ একটা চঞ্চল আলোক সেই ঘরের মধ্যে খেলা করিয়া উঠিল,—অঙ্কিত চিত্রের মুখে, একবার শৈলেন্দ্রের মুখে, একবার কক্ষ-গাত্রে। শৈলেন্দ্র ফিরিয়া দেখিল, পার্শ্বের বাড়ীর কক্ষ হইতে কে একখানা আর্শি রৌদ্রে ধরিয়া তার প্রতিবিম্বটা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া তাহারি ঘরে ফেলিতেছে। ফিরিয়া, মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল বিলাসীর অধরে হাসির রেখা ; অপাঙ্গে বিদ্যুৎ ; উরস-সরের স্তোকনম্র কনক মুকুল যেন প্রশ্বাসের ভরে দুলিতেছে। চক্ষে চক্ষে মিলিল ; বিলীর হাত হইতে সে দর্পণ পড়িয়া গেল ; টুকরা টুকরা হইয়া ভূমিতে ঠিকরাইয়া পড়িল ; বিলাসিনী তাকাইয়া দেখিল, তাহার রূপ খণ্ডিত হইয়া ভূমিতে বিক্ষিপ্ত হইয়া জ্বলিতেছে। রাগে জ্বলিয়া সেই ভাঙা আর্শি তুলিয়া সে ঘরের কোণে ফেলিয়া দিল। আরো অসংখ্য খণ্ডে সেই দর্পণ ছড়াইয়া পড়িল, প্রতি কাচখণ্ডেই তাহার রূপের অগ্নিশিখা !

বিলাসীর বৌদিদি সেই ঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'ঠাকুরঝি !—একি !'

৭

পিতা বলিলেন, 'হতে পারে না, আমি ভেবে দেখেছি, আমায় তা হ'লে একঘরে হতে হবে।' পুত্র হাসিয়া বলিল, 'তাতে আপনার ভয় কিসের। একঘরে হবার ভয় এত বেশী।'

'নয়ই বা কেন ?' দিন ফুরিয়ে এসেছে, শাস্ত্রকারদের অনুশাসন না মানবার মত শক্তি আমার নেই। তারপর আবার যদি সে স্বামীরও মৃত্যু হয় !

'আপনার কাজ আপনি করুন।'

'আমার কাজ আর হোল কই, যদি শান্তি-স্বস্তিই না হোল—'

'শাস্ত্রকার কি চিরসত্যের উপর দাঁড়িয়ে; কালধর্ম্মের গতিকে কি সে রোধ করতে পারে ?'

'সত্য কালধর্ম্মে বিকৃত হয় না। তাঁরা ঋষি, মন্ত্রদ্রষ্টা, স্রষ্টা, শাস্ত্রবেত্তা—'

'সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি ত ফুরোয়নি, তবে স্রষ্টার সৃষ্টি ফুরবে কেন; শাস্ত্রকি অভ্রান্ত ?'

'তর্কে মীমাংসা অসম্ভব; তবে আমার বিশ্বাস, পরলোক, পর লোকের সঙ্গে স্বামীর একটা সম্পর্ক; হিন্দুর বিয়ে কুকুর বেরাল পোষার চুক্তি নয় ? দেশ কাল পাত্রে শাস্ত্র অনুশাসন করে'—

"তার চেয়েও হীন, কেননা মুখে ধর্ম্মের, শাস্ত্রের, অগ্নির, নারায়ণের ধমক্‌। ভেতরে, সেই যে খড় বাঁখারী সেই খড় বাঁখারী ?

"দেশ কাল পাত্রে আমিও সেই নতুন অনুশাসন করতে বলি। নতুন শাস্ত্র পুরোণকে কেটে ছেঁটে পার গড়, কিন্তু তোমরা আজকাল সমস্ত জগৎটাকে এমন লালসার চোখ দিয়ে দেখ

কেন ? না হয় একটু মাতৃত্বের—ত্যাগের চোখ দিয়েই—দেখলে ? ব্রহ্মচর্য্য যার ধাতে সয়, যে চায় তাকে দাও না কেন, তাকেও তোমরা টানতে চাও কেন ? ষাট বছর ধরে সংসার করে দেখলুম, সুখ কতটুকু বাবা ! ওসব কথা এখন থাক, তবে বিলী এখন বড় হয়েছে, সে যদি তা চায়, তবে একটা ভাববার কথা বটে !'

'আর তা না হলে ? "বিলী কি তার নিজের ভালমন্দ বুঝতে পারে ?'

"কেউ কার ভালমন্দ গড়ে দিতে পারে না" ! অদৃষ্ট ! অদৃষ্ট !

'অদৃষ্ট, আর শাস্ত্র, এইতেই দেশের এত দুর্দ্দশা !"

'বাবা, যখন ছেলেবেলার স্বপ্ন, যৌবনে ধোঁয়ার মত উড়ে যায়, যখন যৌবনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা বার্দ্ধক্যে অপূর্ণ রয়, যখন দেখবে শিয়রে অন্ধকারে কি ভীষণ কঠোর হাত তোমায় ধরবার জন্য বেড়াচ্ছে, যখন দেখবে শিশু হাসতে হাসতে ঘুমিয়ে পড়ে, আর সে ঘুম ভাঙে না, তখন,—অদৃষ্ট ! কত ত ভেবেছি, কত ত ভেঙেছি, কত ত গড়েছি,—এই যে আজ তের বছর হোল তোমার মা চলে গেছে,—এই যে তার সংসার থেকে সে কোথায় তফাৎ হয়ে রইল, কি এমন আছে, যে আমাদের এমন দূরে দূরে রাখলে, এক বিশাল সমুদ্রের মত রহস্য, তার তলও নেই অতলও নেই, কিছু বোঝবার নেই বাবা। অদৃষ্ট ! অদৃষ্ট !—তবুও ত সেই পারের দিকেই চেয়ে আছি ; তার দরজায় মাথা কুটে কুটে মরেছি, সে একটা রা-ও করেনি—'

পুত্র চলিয়া গেল। পিতা বক্ষে হাত দিয়া শুইয়া পড়িলেন ; ডাকিলেন 'বিলী'। বিলাসিনী তখন তার আপনার ঘরে দাঁড়াইয়া একখানা চিঠী পড়িতেছিল ; দুয়ারের নিকট দাঁড়াইয়াছিল তাহাদের বাড়ীর ঝী মঙ্গলা।

'তোকে কি বল্‌লে ?'

'বল্‌বে আবার কি ? চিঠীখানা দিলে, বল্‌লে দিদিমণিকে দিস্।

'যা এ চিঠী ফিরিয়ে দিগে যা, কে তোকে আন্‌তে বল্‌লে,—যা থাক!'
'আঃ পোড়া আমারই যত দোষ। খর্ খর্ করিয়া মঙ্গলা চলিয়া গেল।

বিলাসিনী মুখ ফিরাইয়া দেখিল, ছাদের আলিসায় কপোত কপোতী; গাছের আমড়ায় সোণার রঙ। দূরে চাহিয়া দেখিল, অন্ধকার;—মেঘের খানিকটায় লাল আভা; আঁধার তাহাকে ঢাকিতে চায়—মেঘও আঁধার ঠেলিয়া ফুটিতে চায়।

৮

বধূ কহিল, তুমি ত বিয়ের সব ঠিক কর্‌লে, তা ঠাকুরঝির মত জিজ্ঞেসা করেছ? স্বামী কহিলেন, 'তার আবার মতামত কি, যা তার ভাল তাই আমরা কর্‌ছি, আমরা কি তার পর?'

'পর ত নও, কিন্তু তবু সে ত বড় হয়েছে?'

'ছেলে বিলেত ফেরত, আমেরিকা বেড়িয়ে এসেছে, দুনিয়া দেখেছে, পয়সা আছে, দেখ্‌তে শুনতে বেশ, জমিদার এর চেয়ে কে সুপাত্র?'

'সে বিচার ত আমার নয়। সে রূপ ত আর আমার এই অন্ধকারে দেখবার জন্যে নয়। তোমার বোনের যদি পছন্দ না হয়? তোমারি ত বোন!'

কেন আমার পছন্দটা কি মন্দ দেখলে?

তোমার যে পছন্দ নেই, তা ওই মনু পর্য্যন্ত বোঝে, ওই ওকে জিজ্ঞাসা করে দেখনা কে সোন্দর?

'হ্যাঁরে, কে সোন্দর রে, তোর মা না?—'

মনু তাহার মার গলা জড়াইয়া বলিল—'বাবা'!

'দেখলে ত তোমার পছন্দ নেই!'

স্বামী বধূর কপোলদেশে তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলীর সাহায্যে মৃদু আঘাত করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

৯

রাত্রি ঘন, নির্জ্জন; নীরব। মেঘে মেঘে ঘন-ঘোর। মাঝে মাঝে

এক একবার করিয়া একটা একটা তারা দেখা যাইতেছে, মাঝে মাঝে একফালি চাঁদ আঁধার সাগরে একবার করিয়া ভাসিয়া উঠে, আবার আঁধার মেঘ-সমুদ্রের অন্ধ তরঙ্গে ডুবিয়া যায়। গৃহমধ্যে তৈলহীন দীপশিখা উজ্জ্বল। পার্শ্বের দালানে খোপের ভিতর পায়রা বকুম্-কুম্ বক্‌বক্‌কুম্ করিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে; কপোতকপোতীর পরস্পরের পক্ষ ঝাপটের শব্দ শোনা যাইতেছে; মাঝে মাঝে তাহার সঙ্গে বর্ষারাতের মেঘের গুরু গুরু শব্দ গড়াইয়া চলিয়া বেড়াইতেছে। অন্ধকারা ত্রিযামা রজনী, ঝিম ঝিম্—ঝিল্লী দেয় তান; দূরে দূরে পেচক ফুৎকারে।

বিলাসিনী চিঠী পড়িতে লাগিল। সে-ই চিঠী।

"...ছেলেবেলার কথা ভোলা যায় না জানি, কিন্তু ছেলেবেলা ফিরিয়া আসে না, যৌবনের মাদকতায় মত্ত হইয়া মাতাল, কিন্তু নেশা ভাল করিয়া ধরে না, কি যেন বলিতে চাই, কি যেন পাই অথচ পাই না! রঙে, সুরে, মনে তোমাকে মিলাইতে চাই—চাই কিন্তু পারি না"—

"রঙে, সুরে, মনে, আর কিছুতে নয়! বটে"!

অকস্মাৎ পদশব্দে বিলী চমকিয়া উঠিল, কহিল 'কে'? ফিরিয়া দেখিল, রুগ্ন পিতা দালান দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। বিলাসী চিঠী-খানা লুকাইল।

পিতা বলিলেন, 'এতরাত্রে আলো জ্বেলে কেন মা, ঘুমুস্‌নি।'

'না এই—পড়ছিলাম, ঘুম আস্‌ছে না।'

ঠিক সেই স্নেহময়ী মাতার সজাগ স্বরূপ দৃষ্টি! পিতা যে স্রষ্টা, সে কি না দেখিয়া থাকিতে পারে। পিতা বলিলেন,—'ঘুমো মা ঘুমো, অসুখ করবে'। পিতা চলিয়া গেলেন।

দূরে উপরে অন্ধ আকাশ পানে চাহিয়া কহিলেন, হে অনন্ত! যে পৃষ্ঠা কখন পড়া যায় না, সেই পাতাখানা একবার খোল, একবার খোল! একটি বার!

বিলাসিনী আবার সেই পত্র বাহির করিয়া পড়িল,

"—বর্ণে বর্ণে রূপে রূপে তোমায় মিলাইয়া দেখিতে চাই,"

"চাই, চাই, চাই,—চাই না কেবল আমাকে! জাগবার আগে তাকিয়েছিলুম সে এক রকম, ফোটবার সময় তাকিয়ে আছি, সে একরকম, তুমি কেবল দেখলে ফোটার আগে, তুমি কেবল শুনলে হাওয়া কি বলে—ভাল!"

বিলাসিনী চিঠী রাখিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'পোড়া পায়রা-গুলোও ঘুমোয় না গা।'

১০

সে দিনও চিত্রশালিকায় খণ্ড অখণ্ড লইয়া দুই বন্ধুতে দারুণ তর্ক চলিতেছিল। শৈলেন্দ্র বলে, "খণ্ডের মধ্যেই তিনি আছেন"।

রমণী বলে। 'অখণ্ড খণ্ডের মধ্যে আছেন কি রকম; একি সোণার পাথর বাটী নাকি'? তুমি আঁক ছবি, তর্ক কর দর্শনের।"

'সত্যের অনুভূতি দুই যায়গায়ই এক, সেখানেও পূর্ণ হওয়া, এখানেও পূর্ণ হওয়া'।

'যদি পূর্ণ হওয়াই চরম, তবে—তার মানে কি অঙ্গ বাদ দিয়ে পরিণতি না কি! না ভাবে'।

"তোমাদের ওই ভাবের ভাব ভাই কিছু পাইনে, গোলাপ যখন ফোটে, পূর্ণ হয়ে ওঠে। সেই ভাবে যখন সে ভরে ওঠে, তখন কি সে তার ডাঁটা থেকে কাঁটা বাদ দেয়? গোলাপ আঁকলে কি শুধু ওই ফোটবার ভাব আঁকলেই, খণ্ড রস অখণ্ড হয়ে ওঠে। এ কেমন কথা, এই যে তুমি বিলীর ছবি, বিলীর মুখখানা, যার তার কাঁধে বসিয়ে দিচ্ছ, এটা কি সেই অখণ্ড খণ্ডে দেখা দিচ্ছে? না তারই ভাবের পূর্ণতা হচ্ছে!"

"এ ত বিচার বুদ্ধির কথা নয়! ও সবই কি জান ভাবের—'

"তা তোমরা যত পার ভাব জড়ো কর, আর ভাবনায় জড় কর,

স্বষ্টিকর্তা কিন্তু মানুষকে পরিপূর্ণ করেই গড়েছেন, আর তার ভাবও সেই পূর্ণতার ভিতর দিয়েই ফুটে ওঠে, সে কেবল চোখে কাণে নাকে চুলের ডগায় ভাবের খেলায় লুকোচুরি করে না, গায়ের রোমাঞ্চ পর্য্যন্ত ভাবে হয়! যা কিছু ভিতরে হয় তার সকল দিক শরীরকে পূর্ণভাবে আশ্রয় করে, প্রকাশ হয়ে ওঠে, কলাকলার শ্রেষ্ঠত্ব সেইখানে, যেখানে ভাব বলবে আমি আকার, আকার বলবে আমি ভাব, দ্রষ্টা দেখবে সত্য, জীবন শুধু রঙের খেলা নয়, শুধু রেখার টান নয়, আধখানা মানুষ, আধখানা পাথর নয়।

এমন সময় বিলাসিনীদের বাড়ীর ঝী মঙ্গলা তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিল, "রমণ দাদা, রমণ-দাদা, দিদিমণি হঠাৎ কেমন মুচ্ছ গেছে, তাই বাবা বল্‌লেন, আপনাকে ডাক্‌তে।"

রমণী তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

"মঙ্গলা কি হয়েছে?"

'কি জানি বাপু, ডবকা মেয়ে, কার উপদৃষ্টি হোল না কি? মঙ্গলা দৌড়িয়া চলিয়া গেল। শৈলেন্দ্র অন্যমনস্ক হইল! বিলীর যে ছবি অঙ্কিত করিতেছিল, তাহার সেই কাঁচা তৈল-রঙের উপর একটা মাছি উড়িয়া পড়িল; শৈলেন্দ্র সেই মাছিটাকে উঠাইতে গিয়া চিত্রের কপালে হাত লাগাইয়া, কাঁচা রঙ ধেব্‌ড়াইয়া ফেলিল; ভিতরের সিন্দুরের রঙ বিকৃত হইয়া ফুঠিয়া উঠিতে দেখাইল যেন বিলীর কপালটা কিসের আঘাতে ছেঁচিয়া গেছে, তাহা হইতে রক্ত বাহির হইতেছে।

১১

স্নেহময় পিতা কন্যার শিয়রে বসিয়া সজল নয়নে কহিলেন, "মা, মা, বিলী, কেন মা অমন কচ্ছ, মা?"

কন্যার সর্ব্বশরীর তখন প্রস্তরবৎ কঠিন—স্পন্দহীন। মুখ দিয়া ফেনা উঠিতেছে। বৌদিদি জলের ঝাপটা দিয়া মাথার উপর

পাখার বাতাস করিতেছে, আর মনু মার আঁচোল ধরিয়া মুখের মধ্যে পুরিয়া ভয়চকিত দৃষ্টিতে মার পৃষ্ঠদেশে মাকে জড়াইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

রমণী আসিয়া দেখা দিল।

'এই যে বাবা রমণ, দেখ এই এক কি কাণ্ড, আমি আর পারি নে, আমার বুকের ভেতর ধড়ফড় করছে।'

রমণী বিলাসিনীর ঘাড়ের শির দুই হাত দিয়া চাপিয়া দুই চারিবার টানিতেই সে চক্ষু উন্মীলন করিল।

সন্তান-স্নেহ-বিহ্বল বৃদ্ধ সজল নয়নে কহিল, 'বাবা, তুমি না থাকলে কি বিপদই হোত। মা বিলী কিছু খাবি?—'

রমণী বলিল, 'একটু দুধ গরম করে খেতে দিন। ও কিছু না, মানসিক চিন্তায় হয়েছে। আপনি বিশ্রাম করুন গে, আপনার আবার অসুখ বাড়বে।'

পিতা বলিল, 'হাঁ এই যাই বাবা! কি এত তোর ভাবনা মা, আমি যতক্ষণ আছি। তারপর? তারপর তোর দাদা আছে, এই মনুয়া আছে, কি বলিস মনুয়া কেমন?'

মঙ্গলা বলিল, 'ওমা আজ যে একাদশী! 'ও আজ একা—'বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রামকৃষ্ণ নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেলেন।

মনু তখন আস্তে আস্তে তাহার পিসীমার কাছে আসিয়া নিমীলিত আঁখির পাতা হাত দিয়া ধারে ধীরে খুলিয়া দেখিল; বিলাসিনী কষ্টে একটু হাসিল। মনু হাসিয়া উঠিল, কহিল 'পিসামা'।

বধূ পুত্রকে লইয়া চলিয়া গেলেন। পরক্ষণেই একবাটী গরম দুধ ও দুটি সন্দেশ আনিয়া দরজা ভেজাইয়া দিয়া বিলীকে খাওয়াইলেন। বলিলেন, "তুই খা, খা, প্রাণটা গেল খাবি খেয়ে—আবার ধর্ম্ম।"

১২

পিতাপুত্রে এক বিষম কলহ হইয়া গেল। পুত্র বলিল, 'তারপর আপনার মেয়ে যদি ব্যভিচার করে",

'সে জন্য তুমি দায়ী হবে কতকাংশে, আর কন্যা তার জন্য পুরা দায়ী।'

"তবে কি আপনি বলেন যে এই আইনের গণ্ডী দিয়ে, বিবাহ দিয়ে তাকে একটা গোড়া থেকেই রক্ষা করা সঙ্গত নয়?"

"আমার বিবেকের চেয়ে তোমার আইন বড় নয়। তুমি কি বল যে এই আইনের রশারশি দিয়ে বেঁধে এই তোমাদের আইনসঙ্গত ব্যভিচার করবার জন্যে, আমি—আমি—আমার কন্যার জন্য পথ সুগম করে দেব। কখন নয়। আমার পুত্র, আমার কন্যা যদি তারা ব্যভিচার করে, আমি আমাকে দোষ দেব, আমার রক্ত মাংসকে দোষ দেব। আমার কন্যা যদি ব্যভিচার করে করুক্। সু-কু উভয় জ্ঞান তার হয়েছে। আমি তাকে তার স্বামীর হাতে দান করেছি, কন্যার উপর আমার দ্বিতীয় বার দানের অধিকার নেই। আমার দ্বারা এ কার্য্য হবে না। বিশেষতঃ তোমার ওই আইনের ধারায়, আমি নেই।

"কন্যা আইনসঙ্গত স্বাধীন। তবে যদি আপনি বলেন যে ব্যভিচার করে করুক্, তার ওপর ত কথা নেই—তা হলে আমাকে তফাৎ হতে হয়।"

"দেখ বাবা! আমি বামুনের ছেলে, শাস্ত্রও কিছু বোধ হয় ঘেঁটেছি, বহু অর্থ উপার্জ্জন করেছি, সমাজে প্রতিষ্ঠা আছে, মনু, যাজ্ঞবল্ক, পরাশরের উত্তরাধিকারা, সেই পথেরই পথিক, মহাঋষিরা যে পথে গেছেন, সেই মহাজনের পথেই চল্‌তে চেষ্টা করেছি। তবে আমার আত্মা বলেও একটা জিনিষ আছে। সত্য কতদূর জেনেছি তা বলতে পারিনে; আমার আত্মা কখন ব্যভিচার করেনি, আমার পুত্র, আমার কন্যা'—বৃদ্ধ কথা কহিতে পারিলেন না, তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল, চক্ষু দিয়া জল দুই গণ্ড বহিয়া ঝরিয়া পড়িল। কহিলেন, 'বিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়ো—সে যদি বিবাহ চায়, দাও; আমার কোন অমত নাই, তবে তার মত জিজ্ঞাসা করিয়ো। মনে রেখ তোমরা তোমার মায়েরও ছেলে—'

বৃদ্ধ ভাবিলেন, 'আমার ব্রাহ্মণী আমার কোলে গেছে, কন্যা আমার কোলে তেমনি থাক্ না কেন! আত্মা স্বাধীন, কন্যার আত্মা যদি ভোগ চায়, সে কি কেউ তার গতি ফিরিয়ে দিতে পারবে?' বৃদ্ধ মাথা নীচু করিয়া চুপ্ করিয়া রহিলেন, প্রশস্ত ললাটে চিন্তার দাগ নাই, শ্বেতশ্মশ্রু বক্ষ ছাইয়া আছে। মুখ ফিরাইতে দেখিলেন, তাহার মনুয়া তাঁহার ছোট খেলো হুঁকাটী সংগ্রহ করিয়া, কলি-কাটি উল্টাইয়া, তাহার উপর বসাইয়া, হাসিতে হাসিতে আসিতেছে —'দাদা-'দাদা—আমি তামুক—?'

পুত্র ধমক দিয়া উঠিল। বৃদ্ধ তাহার মনুয়াকে বুকে জড়াইয়া কহিল, "এই ত ভগবানের অন্তঃপুর। এই ত সেই অন্তঃপুরের প্রবেশ পথ—পুত্র! তুমি তফাতেই যাও আর কাছেই থাক, কিন্তু ভুলনা, ভগবান তোমার দুয়ারে দ্বারী হয়ে রয়েছেন।—

১৩

বিলাসিনী সকলই শুনিল। পিতা, ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ সকলেরই মত সে বুঝিল। বিলাসিনী ভাবিল, 'সবাই ত বিয়ে দেয়, কিন্তু বিয়ে করে কে!—তাহার মনে পড়িল ছেলেবেলার কথা, মাতৃহীনা বালিকা কেমন করিয়া পিতার কাছে মাতৃস্নেহ পাইয়াছে, মনে পড়িল, তাহার বিবাহ,—আলোক-উজ্জ্বল সচন্দ্র নিশা। তারপর কেমন করিয়া শুধু হাত হইল। মাঝখানটায় যেন একটা ঝড় বহিয়া গেছে—তখন আবার মনে পড়িল, শৈলেন্দ্র। মুখ শক্ত হইল, অধর দন্তে চাপিল, ভাবিল, তবু ছেলেবেলায় ত বুঝি নাই শৈলেন্দ্র কি, এখন আবার—তা একবার বুঝিনা কেন—'

শৈলেন্দ্রের চিত্রগৃহে বিলাসিনী প্রবেশ করিল। আলুলায়িত কেশ-দাম লুটাইয়া পড়িতেছে। শৈলেন্দ্র চমকিয়া উঠিল; বলিল..."এস, এস, বিলী! বিলী!...না তুমি মরতে পাবে না, না মর না—

মরা ছাড়া আর আমার পথ কি? রঙে সুরে, মনে চাই রঙে সুরে মনে কি পাও নাই!'

"না-না, আমি তোমার, আমি তোমার, তুমি আমার"

"এ কথা ছেলেবেলায় শোনায় ভাল, এখন ত জীবন স্বপ্ন নয়"—

না-না তুমি আমার, এখন আমার, যাই কেন অদৃষ্টে থাকুক না তুমি আমার,—যদি তুমি না মর, না-না তুমি মর না—বস এই-খানে বস"—

"রঙের মানুষ রঙ্ রাখ।"

"ওঃ তোমার এই কেশের রাশি, এই মুখ, এই উজ্জ্বল ললাট, এই তিলফুল মত নাক, এই বান্ধুলী ফুলের মত অধর, এই চকিত-হরিণ নয়ন, ওঃ তোমার দেহের ওই সৌরভ, তুমি আমার পাশে, আমি তোমার পাশে, ও ঠিক যেন গোলাপ, পথে ঢল ঢল করে মুখ তুলে ফুটেছে। ঠিক, একটু এমনি করে বস, এই, এই, আমি মুখখানা রঙে তুলে অমর হয়ে যাই! তোমায় অমর করে রাখি।

"তোমার কাছে শুধু রূপের আর রঙের বর্ণিমে শুনতে ত' আসিনি"—

"না-না প্রতি রেখায় রেখায় নূতন ভাব ফুটিয়ে তুলব! এ কল্পনা নয়, এ সত্য! এই দেখ তোমার সমস্ত চিঠী, এই দেখ কোথায় তারা আছে জান, তাদের কত ভাল করে রেখেছি—কোথায় তোমায় বসাই—ইচ্ছে হয় প্রতি চিত্রের বর্ণফলকের ভঙ্গি-মায়, তোমার ওই রঙ ফলিয়ে তুলি—চাঁদের আলোর মত কেমন ঝর-ঝর করে রূপ যেন ঝরে জ্যোৎস্না হয়ে নামছে—"

"তুমি সব শুনেছ? আমার আবার বিয়ে শুনেছ—"

শৈলেন্দ্রের মুখ লাল হইয়া উঠিল; কহিল 'হাঁ।'

"তাই তোমার কাছে এসেছি তখন জাতের কথা ছিল, এখন ত আর—তুমি ত জান, তোমার—কি করা উচিৎ—"

"আমি বিয়ে, বিয়ে, আমি"—শৈলেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। তাহার মুখখানা পাংশু হইয়া গেল।

"চুপ করে রইলে যে? সব পাপ, সব অন্যায় থেকে, আমাকে

জগতের ওপর তুলে ধর। আমার সব লজ্জা, ভয়, ঘৃণা, দৈন্য সব—ওকি! পেছুচ্ছ?... এখন তোমার চোখের চাহনি বদ্‌লাচ্ছে—কেন?—তুমি যে বলতে আমায় ভালবাস? হুঁ! তার মানে, সুবিধেমত ভালবাস—”

“না-না শোন—শোন···

“চুপ করলে কেন, মঙ্গলা আমায় বুঝিয়েছিল, এতে খারাপ হবে; তাদের মত হবে, তা আমার পক্ষে তাতেই বা আর বেশী ক্ষতি কি—তবু চুপ করে রইলেঁ—ভগবান কোন কথা কয় না—চুপ করলে কেন, মানুষের মত কথা কও—

“এই যে চিত্র! এই, এই, এ নূতন আত্মা, এই আমার দ্বিতীয়—এই এই জাগবে, এই ভাব, এই সাধনা—কিন্তু এখন—আমি স্রষ্টা, জীবনে আমার কোন বন্ধন নেই—বিবাহ—ওঃ বন্ধন—আমি যে মুক্ত—তোমার কাছ থেকে সব আহরণ—চিত্র, চিত্রে যা খুসী তা করা যায়, কিন্তু মানুষের জীবনে—”

তুমি তোমার ছবি নিয়ে খেল, আমি—তবে শুধু তোমার খেলার পুতুল—

“কিন্তু আমি চিত্রকর, আমার আত্মা, ওই রঙে, রঙে, ওই বায়ুচালিত মেঘের হিল্লোলে—ওই নালা ঘোরা—কোনখানে তোমার মুখখানি রেখে আলো ধরলে সুন্দর দেখায়, তাই আমি জ্বালি, নিবাই।”

আর আমি শুধু তোমার সেই সুন্দরী গড়বার পুতুল হয়ে ছায়ার মতন, শুধু তোমার ছবির গায়ে রঙের মত লেগে থাকব”—বিলাসিনী চমকিয়া উঠিল। একটু সরিয়া পিছনে হটিল। শৈলেন্দ্র কহিল, “একবার দাঁড়াও ওই কপালের রঙের আভাটা—”

“কপাল ত ছেঁচে গেছে” আর রঙের আভায় কাজ কি!—বিলী হাসিয়া উঠিল। ফিরিয়া দেখিল, রৌদ্র নাই, দিনের আলো গাঢ় মেঘে মসীলিপ্ত আঁধার হইয়া আসিয়াছে। বিলী চক্ষে

অন্ধকার দেখিল, তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল, চক্ষে যেন কতকগুলা পীতাভ অগ্নির সূক্ষ্ম রেখা ঝলকিয়া গেল। শৈলেন্দ্র তুলিকা হাতে লইয়া সেই পথের পানে চাহিয়া কহিল—রঙ মাটি সবই আছে, আমি চাই—আমি চাই—চিত্রের জন্য—এ খেয়ালের রঙমহাল এ জীবন কিছু নয়, পাগলের মত্ততা। রঙমহালে রঙের খেলা চাই। আমি যে স্রষ্টা!

বিলী চাপা ভাঙা গলায় চীৎকার করিল, 'তুমি পার না?' তুমি স্রষ্টা! বটে! আচ্ছা!...

(১৪)

পুত্র বলিল, ওগো, বিলীকে একেবার ডেকে জিজ্ঞাসা কর, তার মত কি।

"বধূ বলিল, "এ বিয়েতে তার মত বোধ হয় নেই"।

বিলী আসিল। বিলাসিনীর দাদা তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

বিলী বলিল, 'আমার ভালর জন্যেই ত তোমরা এ কাজ করতে চাও—এতে আমার কি ভাল হবে? একদিন তোমরা বিয়ে দিয়েছিলে, আবার তোমরা বিয়ে দিতে চাইছ! আমি সে বিয়েও করি নি, এ বিয়েও করব না। বিয়ে দেওয়া হতে পারে, বিয়ে করা হতে পারে না"। বিলী এতদিন তাহার দাদার মুখের পানে চাহিয়া কখন কথা কহিতে পারিত না—আজ যেন এক নিশ্বাসে হঠাৎ এত কথা জোর করিয়া বলিয়া ফেলিল।

ভাই বলিল, 'কি রকম, মেয়ে মানুষের এত পাকাম।'

"তোমরাই ত এতটা পাকিয়ে তুলেছ।"

'তোর ভালমন্দ আমরা বুঝি নি?'

'ভালমন্দ বোঝা যেতে পারে, ভালমন্দ করে দেওয়া যায় না'।

'তবে তোর ইচ্ছে নেই'।

'না'।

'তোকে—বিয়ে করতেই হবে।'

বিলী তখন মরিয়া—বলিল—"একবার অন্তের ইচ্ছেয় যা হয়ে গেছে, আবার তা হয় না",

'তোকে বিয়ে করতেই হবে।'

'কেন দাদা, আমাকে—না। না। আমি করব না।'

বৃদ্ধ পিতা থাকিতে না পারিয়া কহিলেন, 'আয় মা আয়। বাবা! শান্ত হও। হাসিয়া কহিলেন, সংসার ভেঙেছে বুঝতে পারছি।

"ওর মতই সব।—আপনিই ওর মাথা খেয়েছেন।"

পিতা কন্যার হাত ধরিয়া বক্ষে টানিয়া লইলেন, কহিলেন, 'বাবা! এ পুত্র নয়—কন্যা—তায় বিধবা'।

পুত্র গর্জ্জিয়া জোরে নিশ্বাস ফেলিল। বধূ কহিল, 'তুমি পাগল'—"ছেলেবেলা থেকে আদর দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছেন, এখন ভুগুন। আমি এরপর যে—

"এর পর কি?"

"এর পর আপনার কন্যা যদি ব্যভিচার করে, সেজন্য আমি দায়ী নয়—আর এরূপস্থলে আমার তা হলে থাকা হয় না।"

বধূ ভয়ে ত্রস্তে 'কি কর' 'কি কর' করিয়া উঠিল।

"তুমি উন্মাদ! এ ব্যভিচার তার নয়—এ ব্যভিচারের স্রষ্টা তুমি। বেরোও আমার বাড়ী থেকে!" বৃদ্ধের ষষ্টি বৎসরের বিরাট সংযম ভাঙিয়া গেল—

ক্রোধে কম্পিত স্বরে কহিলেন—বেরোও—দূর হও! এক্ষুণি—"

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

রঙ্গলালের "বিরহ-বিলাপ"*

[মুখবন্ধ]

বাঙ্গালাদেশের সাহিত্য-কাননে অনেকদিন হইতে এক নূতন বাতাস বহিতেছে। নূতন ও পুরাতনের সন্ধিস্থল ছাড়াইয়া বাঙ্গলা সাহিত্য অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। বাঙ্গলাসাহিত্যের শৈশব-শ্রী যৌবনে পুষ্ট হইয়া অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, আমরা নূতনকে পাইয়া পুরাতনকে ভুলিয়া যাইতেছি। অতীতের সব কথাই যে মনে রাখিতে হইবে তাহা নহে—সকল কবির সকল কথা আমাদের মনে নাই, অনেকেরই অনেক কথা আমরা ভুলিয়াছি এবং ভুলিয়া যাইব। কিন্তু কাহারও কাহারও কথা স্মৃতিফলকে অঙ্কিত করিয়া রাখা জাতীয় জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক। মধু-হেম-নবীনের কাব্য বিস্মৃত হইবার মত নহে—তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী রঙ্গলালের কাব্যও ভুলিয়া যাইবার মত নহে। কিন্তু রঙ্গলালের কাব্য আধুনিক সময়ের পাঠকমহলে পঠিত, আলোচিত বা তাদৃশ সমাদৃত হয় না। এ দুর্ভাগ্য কবির নহে, আমাদের। "পদ্মিনী"র লেখক, "কর্ম্মদেবী"র লেখক, "শূরসুন্দরী"র লেখক রঙ্গলাল—আধুনিক কাব্যসাহিত্যের আবর্জ্জনার স্তূপে চাপা পড়িয়া গিয়াছেন! আজ উনত্রিশ বৎসর অতীত হইল, রঙ্গলালের মৃত্যু হইয়াছে। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে তাঁহার রচনাসকল একত্র প্রকাশিত হইল না, বা তাঁহার জীবনীসংগ্রহের চেষ্টামাত্রও হইল না। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা কলঙ্কের কথা।

রঙ্গলালের সকল কবিতা প্রকাশিত হয় নাই—অপ্রকাশিত রচনা-সকল চেষ্টা করিলে এখনও সংগ্রহ করা যায়। তাঁহার "বিরহ-বিলাপ" নামক একখানি খণ্ডকাব্য আমরা সম্প্রতি সংগ্রহ

---

* ভবানীপুর সাহিত্যসমিতির সাধারণ অধিবেশনে পঠিত।

করিয়াছি। বহুবাজারের দত্তকুলোদ্ভব, স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নিকট কিছুদিন পূর্ব্বে উহা দেখিতে পাই। উক্ত অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব রচনা "নারায়ণে" প্রকাশ করিবার অনুমতি চাহিলে সহৃদয় দত্তমহাশয় সানন্দে অনুমতি দেন। বিরহ-বিলাপ ইংরাজী Willow Drops নামক একখানি কাব্যের অনুবাদ। সুবিখ্যাত কবি রামশর্ম্মা উক্ত ইংরাজী কাব্যের রচয়িতা। স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র-মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত Mookerjee's Magazine নামক পত্রে Willow Drops প্রকাশিত হয়। শম্ভুবাবুর সহিত রঙ্গলালের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহার অনুরোধেই রঙ্গলাল উক্ত কাব্যের অনুবাদে হস্তক্ষেপ করেন। ইহার ফলে বিরহ-বিলাপ রচিত হয়। Mookerjee's Magazine যোগেশবাবুর বাটী হইতেই বাহির হইত। শম্ভুবাবু তাঁহার বাটীতে থাকিতেন। শম্ভুবাবুর মৃত্যুর পর বিরহ-বিলাপ কাব্যখানি যোগেশবাবুর কাছেই বরাবর ছিল।

রামশর্ম্মা কিরূপ উচ্চ-অঙ্গের কবি তাহা অনেকেই অবগত আছেন। তাঁহার লেখনী হইতে এত সুন্দর ইংরাজী কবিতা বাহির হইয়াছে যে তাহার তুলনা এদেশে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইংরাজী যদি তাঁহার মাতৃভাষা হইত, তাহা হইলেও বোধ হয় তাঁহার কবিতার আদর হইত। শম্ভুবাবু একসময় রামশর্ম্মাকে এক পত্রে লিখেন, —"The hour is critical, when the country needs the zealous services of all her true sons. At such a time what a pity that such a genius as yours should be suppressed by Fate and forced to inactivity and silence! I see that you have risen in revolt against circumstances and resolutely struck your Vina—the Harp of Hind—with the very best result." * রামশর্ম্মা

* An Indian Journalist, By F. H. Skrine, I. C. S. pp. 406-7.

কত বড় কবি তাহা এই কয় ছত্র হইতেই অনুমান করা যাইতে পারে।

লেখক যেরূপ প্রতিভাশালী, তাঁহার অনুবাদকও জুটিলেন সেই-রূপ। রঙ্গলাল অনুবাদকার্য্যে কিরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন তাহা তাঁহার কুমারসম্ভবের অনুবাদ হইতে বেশ বুঝা যায়। তিনি "পদ্মিনী", "কর্ম্মদেবী" প্রভৃতি উৎকৃষ্ট মৌলিক কাব্য রচনা করিয়া যেমন এককালে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, কুমারসম্ভবের বঙ্গানুবাদেও তাঁহার নাম তেমনি প্রসার লাভ করিয়াছিল। তাঁহার অনুবাদের বিশেষত্ব এই যে, প্রথমতঃ উহার অধিকাংশ স্থলেই মূলের সৌন্দর্য্য অব্যাহত ও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার কৃত অনুবাদ সর্ব্বত্রই মূলানুগত, অথচ কষ্টকল্পিত নহে। কুমারসম্ভবের অনুবাদে এই দুইটি বিশেষত্ব বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিছুদিন পূর্ব্বে রঙ্গলালের সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া একজন লেখক মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, রঙ্গলালই সর্ব্বপ্রথম সংস্কৃত কাব্য যথাযথভাবে বাঙ্গলায় অনুবাদ করেন। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, ইংরাজী কবিতার যথাযথ বাঙ্গলা অনুবাদও সম্ভবতঃ তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহও করিতে পারেন নাই। ইহার কতকগুলি প্রমাণ আমরা সংগ্রহ করিয়াছি—তাহার একটি, বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য, "বিরহ-বিলাপ" নামক তাঁহার অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব কাব্য। রঙ্গলাল রামশর্ম্মার Hymn to Durga নামে একটি ইংরাজী কবিতারও অনুবাদ করেন। উহা 'দুর্গাস্তোত্র' নামে 'নারায়ণে' প্রকাশিত হইয়াছে।* এই অনুবাদটিও রঙ্গলালবাবু শম্ভুবাবুকে পাঠান। শম্ভুবাবুকে এই সূত্রে তিনি যে পত্র লিখেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

CUTTACK.
20-10 '73.

MY DEAR MIRZA,

After writing my letter to you this morning, I could not avoid the temptation—so took up my grey

* নারায়ণ—আশ্বিন ১৩২৩।

goose-quill and finished the translation in 5 or 6 minutes. I don't keep copy—and never mind afterwards whatever the said grey goose-quill brings forth. See if this will do.

Yours sincerely,
RANGALAL BANERJEE.

রঙ্গলাল অবসরমত মৌলিক কাব্য রচনা করিতেন। যখন অবসর থাকিত অল্প, সংস্কৃত বা ইংরাজী কাব্যের অনুবাদ করিতেন। কটকে বদলি হইয়া কবিবর কুমারসম্ভবের অনুবাদে হস্তক্ষেপ করেন। রামশর্ম্মার Willow Dropsএর অনুবাদও কটকে বসিয়াই লেখা হয়। কুমারসম্ভবের 'বিজ্ঞাপনে' রঙ্গলাল লিখিতেছেন, "পূর্ব্বের ন্যায় আমার অবকাশ নাই,—বিষয়কর্ম্মে সমস্তদিবস ব্যাপৃত থাকিয়া প্রাতে এবং প্রদোষে দুই এক দণ্ড নিশ্বাস পরিত্যাগের সময় আছে, তাহাতে নূতন কোন বিষয় চিন্তা করিয়া লেখা দুরূহ", সেইজন্যই তিনি কাব্যানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার স্বল্প অবসরকাল যাপন করিতেন। কিন্তু তাঁহার সাহিত্যজীবনে অনুবাদের চেষ্টা এই প্রথম নহে। ১২৬৫ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ তারিখের "সংবাদপ্রভাকরে" দেখা যায়, তিনি গোল্‌ডস্মিথের ও পার্ণেলের Hermit নামক কবিতাদ্বয়ের অনুবাদ লিখিয়া বাবু জয়নারায়ণ সর্ব্বাধিকারী ও বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়দ্বয়ের প্রদত্ত পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। উক্ত দুইটি কবিতার অনুবাদ প্রভাকরসম্পাদক, সাহিত্যরথী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়, স্বপত্রে মুদ্রিত করেন। তাঁহার মতে, "সেই দুইটি অনুবাদ সর্ব্বতোভাবেই উত্তম হইয়াছে।"

পরলোকগত বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কিজন্য রঙ্গলালকে Willow Drops কাব্যের অনুবাদ করিতে অনুরোধ করেন, তাহা আমরা অবগত নহি। সম্ভবতঃ কোনও বাঙ্গলা পত্রিকায় উহা প্রকাশ করা তাঁহার ইচ্ছা ছিল। শম্ভুবাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু রামশর্ম্মা কেবল ইংরাজীতেই লিখিতেন। যাহাতে তাঁহার প্রতিভা ও কবিত্ব-খ্যাতি

বাঙ্গালী পাঠক সমাজে পরিচিত ও প্রচারিত হয় এ অভিলাষ শম্ভু-চন্দ্রের অবশ্যই ছিল। রামশর্ম্মার কবিতার রঙ্গলাল নিজেও একজন ভক্ত ছিলেন। একখানি পত্র হইতে তাহা জানা যায়। যোগেশবাবুর ভ্রাতা স্বর্গীয় নরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র বাবু শ্রীশচন্দ্র দত্ত কটক হইতে লিখিয়াছিলেন, "Myself and Deb Baboo called over to Baboo Rungolall's place yesterday * * * * He says he likes Ramsarma's writings and therefore takes the trouble to translate them" [14-1-75]. ১৮৭১ ও ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের দুই ডিসেম্বর মাসে Willow Drops প্রকাশিত হয়। তাহার পূর্ব্বেই উহার নকল কটকে রঙ্গলালের নিকট প্রেরিত হয়। রঙ্গলালবাবু উহার অনুবাদ একটু একটু করিয়া তিনবারে পাঠাইয়াছিলেন। এই তিনবারে তিনি শম্ভুবাবুকে তিনখানি পত্র লিখেন। এই তিনখানি পত্রের নকলও যোগেশবাবুর নিকট ছিল। তিনি এগুলিও বর্ত্তমান লেখককে ছাপাইতে অনুমতি দিয়াছেন। Willow Dropsএর প্রথম কয়েক Stanza অনুবাদ করিয়া পাঠাইবার সময় রঙ্গলাল শম্ভুবাবুকে লিখিতেছেন :—

CUTTACK.
7-11-'73.

MY DEAR BHAT OF BHATS,

Here goes the feat achieved in 15 or 20 minutes, amid 16,000 Uriyas assembled to pay Road-Cess. I received your letter and at once commenced translating—the rest tomorrow with the original.—Send me the remaining stanzas. Crack—you will rue hereafter if my frenzy is lost.

Yours ever sincerely,
RANG ALAL BANERJEE.

ষোড়শ সহস্র উড়িয়ানন্দনের বিজাতীয় অস্ফুট কোলাহলের মধ্যে

প্রহসনের অঙ্কুরোদ্গম হইতে পারে, কিন্তু কবি যে সেখানে কিরূপে আপনার একাগ্রতা রক্ষা করিয়া কবিতারচনায় মনঃসংযোগ করিতে পারেন, ইহা বিস্ময়ের বিষয়। রঙ্গলালের এই পত্র পড়িলে এবং কবির আদর্শ কাব্য-সুহৃদ্গণের কথা স্মরণ করিলে, হাস্য সম্বরণ করা যায় না! Willow Dropsএর লেখক 'রামশর্ম্মা'টি কে রঙ্গলাল তাহা জানিতেন না। দ্বিতীয় পত্রে শম্ভুবাবুর নিকট তিনি ইঁহার প্রকৃত নাম জানিতে চাহিয়াছেন :—

CUTTACK.
20-10-'73.

MY DEAR SRIHARSHA,

You didn't say anything about the progress of my present translation. Well, here goes the conclusion of it. Do you mean to give the translation along with the original or what? Will you tell me who is the father of the child, a god-father ought to know this or he cannot stand sponsor.

Yours ever sincerely,
RANGALAL BANERJEE.

এক পত্রে রঙ্গলালবাবু শম্ভুবাবুকে অনুরোধ করিয়া পাঠান, যেন তাঁহার "বিরহ-বিলাপ" ক্রমশঃ বাহির না হইয়া একবারেই ছাপা হইয়া যায়। সে পত্রখানি এই :—

CUTTACK.
8-12-'73.

MY DEAR SIVA SAMBHU,

If you give the "lament" at all, don't give it piecemeal.

Yours sincerely,
RANGALAL BANERJEE.

ইহার উত্তরে শম্ভুবাবু কি লিখেন তাহা জানি না, তবে তাঁহার

একখানি পত্রের সারমর্ম্ম তাঁহার নিজের খাতায় এইভাবে টোকা আছে—

"To Baboo Rangalal Banerjee.
Cuttack

24th. August, 1874 * * * * *—Informed—acquaintance with the contributors to 'Magagine', Ramsarma in the bargain—by and bye.

"শ্রীশ বাবুর যে পত্র খানির উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার এক জায়গায় আছে—"Moreover, he (Rangalal) was anxious to know who the individual is. He pressed both of us, and at last I gave him an evasive answer, saying, that individual is but * * * a native of Bengal. He was not satisfied * * * * and pressed me * * * to give out the name."

কিন্তু অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে, এই "Lament" শম্ভুবাবু প্রকাশিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর জিনিসটি দত্তবাবুদিগের বাটীতেই পুরাতন কাগজপত্রের মধ্যে রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। শেষে যখন উহা নষ্ট হইবার উপক্রম হইল, তখন যোগেশবাবু একটা খাতায় উহার নকল করিয়া রাখিলেন। রঙ্গলালের স্বহস্তলিখিত কাগজখানি হারাইয়া গিয়াছে, সুতরাং সেই নকলটিই এখন আমাদের একমাত্র সম্বল। Willow Dropsএর লেখক 'রামশর্ম্মা'। কিন্তু রামশর্ম্মা কে সাধারণে অবগত নহেন। রামশর্ম্মার প্রকৃত নাম শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ। নবকৃষ্ণবাবু এখনও জীবিত আছেন। তিনি সপরিবারে বরাহনগরে বাস করিতেছেন। এরূপ অসাধারণ প্রতিভাশালী ইংরাজী লেখক—গদ্যে এবং পদ্যে, এরূপ সাহিত্যিক সব্যসাচী এখন এদেশে দুর্ল্লভ। জ্যোতিষ শাস্ত্রেও ইনি সুপণ্ডিত। শম্ভুচন্দ্র নববাবুকে বলিতেন, "আপনার হাত সোণা দিয়া বাঁধাইয়া দেওয়া উচিত।" এই প্রসঙ্গে, একটি গল্পের অবতারণা করা যাইতে পারে।

একসময় শম্ভুচন্দ্র Pioneerএ প্রকাশিত কোনও প্রবন্ধের জবাব দিতেছিলেন। তথায় উপস্থিত তাঁহার এক বন্ধু বলেন, "Pioneer কি আপনাকে ছাড়িয়া কথা কহিবে?" উত্তরে শম্ভুবাবু বলেন, "এলেখার জবাব দিবার উপযুক্ত লোক বাঙ্গালীর মধ্যে একজনমাত্র আছেন—তিনি নবকৃষ্ণ ঘোষ। এদেশে ইংরাজলেখকদিগের মধ্যে চেষ্টা করিলে দুইজনে ইহার জবাব দিতে পারেন, একজন Field Robinson, আর একজন Mc.Guire"। মাইকেল, রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা নবকৃষ্ণের সম্বন্ধেও খাটে।—'বাঙ্গলাভাষার দুর্ভাগ্য যে এমন সব লেখক বাঙ্গলায় লিখেন না।'

রঙ্গলালের অনুবাদ কিরূপ মূলের অনুগত তাহা "বিরহ-বিলাপ" ও Willow Drops কাব্যের কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। রামশর্ম্মার Willow Drops এর গোড়া:—

"Distracted—heart-sore,—all wild with unrest,
I take my harp,—my joy of early years,
Hoping perchance its notes may soothe the breast,
Which weeps and weeps, nor finds relief in tears"

রঙ্গলালের অনুবাদ—

বিরহবিষাদে মম, অন্তর কাতরতম,
নিদ্রা বিনা ক্ষিপ্তের লক্ষণ,
শৈশবের সহচরী, বীণায় আদর করি,
করিলাম করেতে গ্রহণ।
ভাবিলাম যদি তার, ঝঙ্কার সুধার ধার
জুড়ায় এ তাপিত হৃদয়,
বিলাপেতে অনিবার, শান্তি না হইল তার,
বৃথা বিগলিত অশ্রুচয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রঙ্গলালের অনুবাদে সাধারণতঃ মূলের

সৌন্দর্য্য ক্ষুণ্ণ হয় না ; যে অংশ উদ্ধৃত হইল তাহাতেও তাঁহার এই বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বিরহ-বিলাপের ভাষাসম্বন্ধে বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন, সে বিচার পাঠকগণই করিবেন। তবে বেশী literal করিতে গিয়া কোনও কোনও স্থলে কবি ভাষা যে একটু আধটু অস্বাভাবিক করিয়া ফেলিয়াছেন, একথা না বলিলে হয় ত কবির প্রতি অবিচার করা হয়। নিম্নে বিরহ-বিলাপ কাব্যখানি আমূল উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

এই প্রবন্ধ লিখিত হইবার পর ঘটনাক্রমে জানিতে পারি, পরম-শ্রদ্ধেয়া, স্বনাম-ধন্যা শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর নিকট রঙ্গলালের "বিরহ বিলাপের" একটি নকল আছে। এই সংবাদ ও নকলটি তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আমাকে দেন। গিরীন্দ্রমোহিনী অন্যূন পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত কবিতার নকল লিখিয়া রাখেন। বহুবাজারের দত্তদিগের বাটীতেই তাঁহার শ্বশুরালয়, সেই জন্য উহা দেখিবার এবং উহার নকল রাখিবার তাঁহার সুযোগ হয়। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তিনি উহা যেমন দেখিয়াছিলেন, অবিকল তেমনি নকল করিয়াছিলেন। কিন্তু যোগেশবাবুর নিকটে বিরহ-বিলাপের যে অনুলিপি আছে, তাহার সহিত এই অনুলিপির স্থানে স্থানে অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। সেইজন্য মনে হয়, রঙ্গলাল প্রথমে যাহা শম্ভুবাবুকে পাঠান, পরে স্থানে স্থানে তাহার পরিবর্ত্তন করেন এবং এই পরিবর্ত্তিত রচনা পুনরায় পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনীর রক্ষিত নকল সম্ভবতঃ দ্বিতীয়বার প্রেরিত আসলেরি কপি। বিরহ-বিলা-পের উল্লিখিত দুইটি নকলের মধ্যে যে যে স্থানে বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হইয়াছে, সেই সেই স্থলের পাদটীকায় তাহার উল্লেখ করা হইল।

বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিলা কবি যখন কীটের কবল হইতে "বিরহ-বিলাপ" উদ্ধার করিয়াছিলেন, তখন তিনি জানিতেন না যে, ইহা তাঁহার সমসাময়িক যুগের আর একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ কবির রচনা। ছাপাইবার মানসে এই অজ্ঞাতকুলশীলের লেখা তিনি

এযাবৎ অতি যত্নে "কুড়ান" নাম দিয়া তাঁহার নিজের এক কবিতার খাতায় তুলিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং এই রচনার দুটি ছত্র,

"যথা অগ্নিহোত্র দ্বিজ দীপ্ত রাখে অগ্নি নিজ,
চিরদীপ্ত রবে হুতাশন"—

সমধিক উপযোগী বোধে স্বীয় গ্রন্থের 'মটো' স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। জানিতেন না বলিয়া উদ্ধৃত ছত্রের শেষে লেখকের নাম দিতে পারেন নাই। ঘটনাচক্রে, আজ প্রায় চারিযুগ পরে, "নারায়ণের" কৃপায় রঙ্গলালের কবি-ভগ্নীর ইচ্ছা সফল হইল এবং বঙ্গসাহিত্য একটি নূতন অলঙ্কার লাভ করিল।

শ্রীননীগোপাল মজুমদার।

বিরহ-বিলাপ

১

বিরহ-বিষাদে মম, অন্তর কাতরতম,
নিদ্রা কিম্বা ক্ষিপ্তের লক্ষণ।
শৈশবের সহচরী বীণায় আদর করি,
করিলাম করেতে গ্রহণ:—
ভাবিলাম যদি তার, ঝঙ্কার সুধার ধার,
জুড়ায় এ তাপিত হৃদয়।
বিলাপেতে অনিবার, শান্তি না হইল তার,
বৃথা বিগলিত অশ্রুচয়।

২

যতক্ষণ বিভাকর, বরিষে প্রখর কর,
ততক্ষণ অশ্রু বরিষয়।
যতক্ষণ শশিকরে, নিশির (১) তিমির হরে,
ততক্ষণ অশ্রু বন্ধ (২) নয়।

(১) পাঠান্তর—"নিশার" (২) পাঠান্তর—"আঁখি শুষ্ক নয়।"

হায়! ভবচক্রে ঘোর, যে সময় যায় মোর,
তখনো ত অশ্রুপাত হয়,
অন্তভাবে যেই কালে বদ্ধ থাকি চিন্তাজালে,
সেকালেও অশ্রু বরিষয় (৩)।

৩

এই কথা লোকে ভাষে, যাতনার ধার নাশে,
কালের দূরতা সুনিশ্চয়।
আরো লোকে এই বলে, অতি তীব্র শোকানলে,
নিবাতেই কাল যোগ্য হয়।
একথাটা সত্য নাকি? হয় হোক তা'তে বা কি?
আমি কিন্তু জানি নাই তাহা;
আমি মাত্র জানি এই, যত গত হয় সেই,
তত বুক ফেটে যায় আহা!

৪

শোকের তুফানে মগ্ন—, দুঃখ-ভরা-হেতু ভগ্ন,—
আমার হৃদয়-জলযান,
অনুভূত পরিগত, আমোদ আহ্লাদ যত,
তাহাদের সমাধি সমান।
যেন পরিশুষ্ক দাম, নয়নের অভিরাম,
পল্লবে না পরিণত হবে,
না জানিবে সুপ্রকাশ, নিদাঘকালের হাস,
বসন্তের লাবণ্য-বিভবে।

৫

কেন আমি করি খেদ, কেন হৃদি করে ভেদ,
ক্ষয়করী চিন্তা নিশাচরী?
ওরে মন বাক্য ধর, তমাল * বসন পর,
হায়! কথা না শুনে কি করি?
হায়! মনে যে সময় একথা উদয় হয়—
সে আমায় না করে গণন,

(৩) পাঠান্তর—"অশ্রুধারা বয়।" * তাম্বস (?) মূলে আছে wrap thee in pride.

সে কথা কঠিন অতি, যেতে উঠে মন মতি,
জ্ঞাননেত্র রোধে, অসহন। (৪)

৬

দিবা-অবসান-পরে, নিশা আগমন করে,
তিমিরের পশ্চাতে মিহির,
ঘোরতর ঝঞ্ঝাবাত, পরিগতে অচিরাৎ,
স্থিরতার আবির্ভাব স্থির।
কিন্তু হায়! মম মনে, কেন তবে অনুক্ষণে,
অনন্ত তিমির বেড়ি রহে?
অবিরত তাহা থেকে বেগে (৫) উঠি ঝোঁকে ঝোঁকে,
দুঃখের নিশ্বাস-ঝড় বহে।

৭

ভালবাসিতাম আগে, আজো বাসি অনুরাগে,
বাসিব রে যাবৎ জীবন,
যথা অগ্নিহোত্র দ্বিজ দীপ্ত রাখে অগ্নি নিজ,
চিরদীপ্ত রবে হুতাশন।
সে অনলে নিরন্তর, মম শ্বাস উষ্ণতর,
তাপিবেক চরম নিশ্বাস,
পরেতে অনন্ত দীপ্তি, প্রবেশি পরম তৃপ্তি
প্রাপ্ত হয়ে রহিবে প্রকাশ।

৮

তব (৬) চন্দ্রনিভানন, তড়িৎ-কেলি সদন—
অসিত নয়ন মনোহর;
তব (৭) সুরভিত শ্বাস, মাধুর্য্যের অধিবাস,
বিনোদ বঙ্কিম বিম্বাধর।
পদ্মাকার তবাকার, যাহে কত শোভাধার,
বসন্তের প্রসূননিকর।

---

(৪) এই কয় পঙ্‌ক্তি গিরীন্দ্রমোহিনীর অনুলিপিতে নাই। (৫) "কেঁপে"—পাঠান্তর।
(৬) "পূর্ণ"—পাঠান্তর। (৭) "মন্দ"—পাঠান্তর।

সুনীল নিবিড় কেশ, ধরি এক এক বেশ, (৮)
ঝুলিতেছে কত ফুলশর।

৯

কপোলযুগল মাঝে, কিবা চারু রেখা সাজে,
রত্নশিলা ললাটফলক,
বীণার ঝঙ্কার প্রায়, তব স্বরে মোহ যায়,
শ্রুতিযুগ পাইয়ে পুলক।
প্রথমেতে যেই ক্ষণে, দেখিলাম চন্দ্রাননে,
শুনিলাম মধুর বচন,
সেই ক্ষণে জানিলাম, মনে মনে মানিলাম,
বচনীয় নহ তুমি ধন। (৯)

১০

বিমল মুকুর যথা, সেরূপ যদ্যপি কথা
প্রতিবিম্ব করিত রুচির,
কিম্বা জ্যোতিশ্চিত্র † প্রায়, তোমার সুচারু কায়,
বুক থেকে করিত বাহির,
তবে তোমা নিরীক্ষণে, ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগিজনে,
তব পদে লুটায়ে পড়িত,
দগ্ধ হ'য়ে প্রেমানলে, হৃদয়-সহস্রদলে,
প্রতিমার অর্চ্চনা করিত!

১১

তোমার রূপের জোর, প্রথমে হৃদয়ে মোর,
যখন হইল অনুভূত,
যেন লয়ে প্রহরণ, লক্ষ্য করি মম মন,
মারিলেক কোন দেবদূত।
সৌদামিনী পরিকর, তোমার কটাক্ষশর,
প্রভাসহ মৃত্যুর মিলন,

---

(৮) "শেষ"—পাঠান্তর। † ফটোগ্রাফের প্রথম বাঙ্গলা।

(৯) পাঠান্তর—"বচনের অতীত রতন"।

বিষম আঘাত তার সহ্য বল হয় কার?
মম সহ্য নহে কদাচন।

১২

তদবধি বর্ষ কত, হইল আগত গত,
তোর সহ না ছিল দর্শন,
কিন্তু হায় নিরন্তর, ক্ষুধা এক ঘোরতর,
চিত্ত মোর করিল চর্ব্বণ।
তারপর বর্ষ কত, সমাগত পরিগত,
জুড়াতে নারিল ক্ষুধানল,
নিরবধি (১০) সেই ভুক্, দাহন করিল বুক,
শান্তি বিনা সতত বিকল।

১৩

সে চারু মধুর্য্যাবলী, ভুলিতে নারিনু বলি,
অনুযোগ ক'রনা আমায়,
সেই সব রূপরাশি জানি, মন নিজ ফাঁসি,
ইচ্ছা করি পরিল গলায়।
হরিধ্যান পরায়ণ, ঊর্দ্ধরেতা যোগিগণ,
সে সব করিলে দরশন,
না পারিবে বহুকাল, তাহাদের শরজাল,
কখনই করিতে লঙ্ঘন।

১৪

শেষে মোর ভাগ্যে লেখা, পুনঃ তোর সহ দেখা,
দয়া প্রকাশিলে তবে তুমি;
আনন্দ না যায় ধরা, যেন এই বসুন্ধরা,
সেইক্ষণে হ'ল স্বর্গভূমি।
আহা! আহা! কি মধুর! মাদকে মানসপুর,
পূর্ণ মম হল সে সময়,
সুখের নাহিক ওর, ভাবেতে হইল ভোর,
কিবা সেই দিন রসময়!

(১০) "সে অবধি"—পাঠান্তর।

১৫

তোমার কি পড়ে মনে, মুগ্ধ কর সেই ক্ষণে
শান্তিসুখময় যেইক্ষণে—
মম যুগবাহু-পাশে, শিহরিত তনু ত্রাসে,
বাঁধা তুমি পড়িলে বন্ধনে?
অর্দ্ধ-বিকসিত ফুল, তুমি তার সমতুল,
লয়ে গেনু বিবাহ বাসরে;
প্রজাপতি-করতলে প্রণয়-প্রদীপ জলে,
ব্রতোচিত পণ পরস্পরে।

১৬

এখন কি পড়ে মনে, সেই সমুদয় পণে—
মুদ্রাঙ্কিত নিকর চুম্বনে?
তব দৃঢ় অঙ্গীকার, আমার লো প্রাণামার,
ভুলিবে না যাবৎ জীবনে?
প্রাণে প্রাণে পরিণয় হয়েছিল যে সময়,
প্রেমোন্মদে মত্ত দুই মন, (১১)
একতানে শুভদৃষ্টি, পরস্পরে সুখবৃষ্টি,
সেই ক্ষণ হয়কি স্মরণ (১২)?

১৭

এখন কি পড়ে মনে, মম করে যেই ক্ষণে,
তোর কর পড়িল বন্ধনে,
অপ্সরার মধুধ্বনি- সহকারে সুবদনি!
মোরে ধন্য কর এ বচনে—
"এই কর, এই মন, অধীনীর এ জীবন,
তোমারই হইল এখন"—
মুগ্ধ হয়ে সে কথায়, প'ড়ে আমি বসুধায়,
তব পদ করিনু বন্দন।

১৮

হা! সুখের দিনচয়! আর কি তুলনা হয়—
অনুপম সে সুখ নিকর,

(১১) পাঠান্তর—"প্রেমোল্লাসে পূর্ণ বসুন্ধরা"। (১২)পাঠান্তর—"সে আনন্দ নাহি যায় ধরা।"

যখন আনন্দস্রোত, করিলেক ওতঃপ্রোত,
দ্রবীভূত উভয় অন্তর?
সুরভিভারেতে নত, মলয় মারুত মত,
সে সময়ে আমরা দু'জন
মধুর ভাবেতে মাতি, পূর্ণ বসন্তের ভাতি,
যুক্ত হয়ে করিনু চুম্বন। (১৩)

১৯

হা! সুখের দিনচয়! দরশন সে সময়,
যদি না হইত পরস্পরে,
যদি আমাদের মন, না করিত আলিঙ্গন,
প্রেমপূর্ণ লিপিপরিকরে,
কিম্বা পরিহাসনলে, জ্বালিয়া হৃদয়স্থলে,
না গড়িতাম স্বর্ণ শিকল,
না গড়িতাম এই বেড়ী, এখন যা আছে বেড়ি,
হায়! মম চরণযুগল!

২০

দু'জনায় প্রেমাবেশ, কত স্নেহ নাহি শেষ,
এক এক কটাক্ষ তোমার,—
আর এক এক দৃষ্টি, করিত তড়িৎ সৃষ্টি,
অবসান না ছিল তাহার।
খঞ্জন-নর্ত্তন সম তব গতি অনুপম,
কি আর তুলনা দিব তার?—
তোমার মধুর কথা, বাণীর বীণায় যথা,
বিনির্গত বিনোদ ঝঙ্কার।

* * * * * *

* * *

২২

পান করি' প্রেমাসব, যেন এক অভিনব,
অবনীতে উভয়ের বাস,

(১৩) "হইনু শোভন"—পাঠান্তর।

কি বিচিত্র! সেইকালে, তোমার প্রতিভা-জালে,
আমার প্রতিভা পায় নাশ—
যেরূপ যামিনীকর— করে হরে অন্য কর,
উপগ্রহ গ্রহণ সময় ;—
অন্তর্হিত সেই তারা, একেবারে দীপ্তিহারা,
বিভাসিত শুধু সুধাময়।

২৩

হেন প্রেম মূর্ত্তিমান্, দুই প্রাণে এক প্রাণ,
সে যে ঘোর তন্ত্রের প্রয়োগ,
সেরূপ তন্ময় আর, এ জগতে হওয়া ভার,
আত্মার আত্মায় সুসংযোগ।
নন্দনকানন-জাত, অতি সুখময় বাত,
সম্ভোগ করিনু দু'জনায়,
যে প্রণয় স্বর্গপুরে, ভোগ করে যত সুরে,
আনিলাম সে প্রেম ধরায়।

২৪

যথা সুবিমল তর, (১৪) শরদ্ শশীর কর,
সমুজ্জ্বল করে সমুদয়,
সে রজত প্রতিভায়, (১৫) নিমজ্জিত করি কায়,
অসিত পদার্থ সিত হয়.
সেইরূপ মহাবল, মন্ত্রৌষধে সুকুশল,
ওরে প্রেম, অন্তরীক্ষচয়!
তোর মহামন্ত্রবলে, যে কিছু এ ধরাতলে,
সকলই সমুজ্জ্বল হয়। (১৬)

২৫

তোর ভানুকর-ছেদী, কাচের ফলকভেদী,
দৃষ্ট কি উজ্জ্বল বর্ণচয়,

---

(১৪) "মনোহরতর"—পাঠান্তর। (১৫) "শুক্লতর সে শোভায়"—পাঠান্তর।
(১৬) শেষের চারি ছত্র গিরীন্দ্রমোহিনীর অনুলিপিতে নাই।

অতিশয় তুচ্ছতর, পদার্থ নিকরোপর,
রঙ্গ দান করে দীপ্তিময়।
কিবা হেম, কি লোহিত, সুনীল-লোহিত (১৭) পীত,
হরিতাদি রঙ্গ শোভাময়,
যেন কোন দিব্যাঙ্গনা, স্বর্গ হতে সুশোভনা,
লোকালোকে রঙ্গ বরিষয়।

২৬

যে দিকের প্রতি চাই, সে দিকে দেখিতে পাই,
প্রভার না হয় রে অবধি,
প্রভান্বিত ভূমিতল, প্রভান্বিত বনস্থল,
প্রভান্বিতা হাস্যময়ী নদী,
প্রভায় পবন বহে, প্রভায় গগন দহে,
হীরকের প্রভাপরিকর—
নব কপোতিনী! (১৮) মোর, প্রোজ্জ্বল নয়নে তোর
প্রজ্বলিত ছিল নিরন্তর।

২৭

তোর মুখ সুমধুর, জিনিয়ে অমরপুর,
তথা ছিল উজ্জ্বল আকারা,
পাশাপাশি পরস্পর, সন্ধ্যাতারা মনোহর,
সহ প্রভাতের শুকতারা।
যে হেরেছে একবার ভুলিবার সাধ্য কার,
সেই চারু নক্ষত্রযুগল।
কিবা সে চমক তার, চিক্‌মিক্ অনিবার,
মদভরে করে টলটল!

২৮

উড্ডীন বিহঙ্গ কাল, আনন্দের মুক্তামাল,
ছড়াইত দুই পক্ষ থেকে,
বিভাবনা সেইকালে, মহামূল্য মণিমালে,
আমাদের পথ দিতে ঢেকে।

---

(১৭) পাঠান্তর—"কপিশ"। (১৮) পাঠান্তর—"প্রভান্বিত হিয়া মোর!"

স্বর্ণময়ী যত হোরা, আমাদের কাছে তোরা,
ছিলি সবে অনুরক্তা দাসী,—
যখন যা হ'ত সাধ, যোগাতিস বিনাবাধ,
নিত্য নব রস রাশি রাশি।

২৯

মর্ত্ত্য প্রেম যে সময়ে, অতীব উন্নত হয়ে,
স্বর্গপথে করয়ে গমন, (১৯)
সেই পথে স্থির বায়ু, হরয়ে তাহার আয়ু,
শ্বাসরোধ হয় ক্ষণে ক্ষণ। (২০)
যথা পেয়ে পক্ষ নব, প্রাবৃট্ পতঙ্গ সব,
মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়।
যাহাতে প্রভূত হয়, সেই আসি সঞ্চারয়,
অচিরাৎ তাহাদের লয়।

৩০

হায়, স্বপনের মায়া! আসন্ন বিপদ-ছায়া,
আগে আসি হয়রে উদয়;
স্বপ্ন দেখিলাম আমি— হইয়াছি তটগামী,
নিম্নে নদী অতিবেগে বয়,
রজতের রাশি প্রায়, কত উর্ম্মি বহে তায়,
চক্রাকার আবর্ত্ত নিকর,
আমার হৃদয়'পর, সেই ক্ষণে শোভাকর,
ছিল এক কুসুম সুন্দর।

৩১

অতিশয় খরতর, অনিবার্য্য বেগধর,
প্রবাহিত সলিল নিচয়,
যেন তারা বেগভরে, গমনে সন্ধান করে,
বাঞ্ছনীয় শান্তির উদয়।
সেই ক্ষণে, আহা মরি! মোরে পরিহার করি,
স্রোতে গিয়ে পড়িল সে ফুল,

---

(১৯) "কবিল আশ্রয়"—পাঠান্তর। (২০) "হয় হয় হয়"—পাঠান্তর।

মনোজ্ঞ প্রসূন সেই, আমার হৃদয়ে যেই,
শোভা দান করিল অতুল।

৩২

অচিরাৎ তার পরে, প্রিয়ে! তব কলেবরে,
হইল রে পীড়ার সঞ্চার,
দিবাবিভাবরী যায়, হইল নির্ব্বাণ প্রায়,
প্রাণরূপ প্রদীপ তোমার,
অবশেষে ওরে প্রাণ! সে বিপদে পেলে ত্রাণ,
রক্ষা পেলে ঈশ্বর-ইচ্ছায়,
কিন্তু হায়! সুকুমার, প্রেমপুষ্প-সুধাধার,
শুকাইয়া গেল কুয়াসায়।

৩৩

পুন যবে হ'ল দেখা, বিরাগের ভাব লেখা,
দেখিলাম তোমার নয়নে,
সুধাধার ওষ্ঠাধরে, এক চুম্বনের তরে,
কতই লালসা করি মনে,
কত আকিঞ্চন-সহ, সাধিলাম অহরহ,
ব্যর্থ হ'ল সাধনা সকল,
ঘৃণাতে ভরিয়ে আঁখি, বিরাগতুষারে মাখি,
ফিরাইলে মুখশতদল।

৩৪

জ্ঞানহীন একেবারে, নিরাশায় ক্ষিপ্তাকারে, (২১)
তোরে ত্যজি' আইলাম চলি',
দয়াবশে সে সময়, বরষিল দেবচয়,
মম'পর হিমাশ্রু-আবলি।
পূর্ব্বকার ব্যবহার, করিলে লো পরিহার,
না দিলে বসিতে একবার,
ক্ষেপে উঠি সেইক্ষণে, যখন পড়য়ে মনে,
'এসো' বাক্য না বলিলে আর।

---

(২১) "ক্রোধে ক্ষোভে নিরাশায়, একেবারে ক্ষিপ্ত প্রায়"—পাঠান্তর।

৩৫

ভাবিলাম ওরে প্রাণ ! করিয়াছ অভিমান,
পীরিতিতে হেন রীতি আছে,
এত যবে তব রোষ, অজানত কোন দোষ,
করিয়া থাকিব তোর কাছে !
কিন্তু পরে হ'ল বোধ, দোষজন্য নহে ক্রোধ,
কালক্রমে গত সেই ভ্রম,
শেষে জানিলাম স্থির, মম প্রতি বিরক্তির,
ছিল কোন হেতু গূঢ়তম।

৩৬

অতিশয় ব্যগ্র হয়ে, চাহিলাম সবিনয়ে,
দরশন ক্ষণেকের তরে,
না করিয়ে শ্রুতিপাত, করিলে লো পদাঘাত,
সে সকল বিনয়-উপরে।
বিরাগেতে গর গর, দিয়াছিলে যে উত্তর—
অল্লাক্ষর বটে সে উত্তর,
কিন্তু খর-তরবার- সম তার তীক্ষ্ণধার,
হৃদয়চ্ছেদনে পটুতর।

৩৭

হেন চারু দেহে তোর, হেন হৃদি সুকঠোর,
নিবসতি পাইল কেমনে ?
অসম্ভব অতিশয়, প্রকৃতির বিপর্য্যয়,
অবশ্যই মানিব লো মনে !
যেন ধ্রুব হেমময়, কোষের ভিতরে রয়,
লৌহখণ্ড সুকঠিনতর,
হীরা বটে দীপ্তিময়, কিন্তু আর কিছু নয়,
লোকে তারে কহে লো প্রস্তর।

৩৮

প্রেমপুষ্প যে সময়, নব বিকসিত হয়,
সেকালের তব লিপিচয়,

অতিশয় করি যত্ন, পূর্ব্ব অভিজ্ঞানরত্ন,
রাখিয়াছি সেই সমুদয়।
এবে আমি যেইক্ষণ, করি তাহা অধ্যয়ন,
প্রতিবাক্যে আজো এত জোর, (২২)
নিবারিতে নাহি পারি, অতিবেগে অশ্রুবারি-
প্রবাহ নয়নে বহে মোর। (২৩)

৩৯

তোর ক্রূর করাঙ্গুলি, লিখিল কি কথাগুলি,
আদরের ধন যারা (২৪) মোর!
কহ, এই কথা সব, হয়েছিল কি প্রসব,
নিদয় হৃদয় থেকে তোর?
মোহনীয় মন্ত্র প্রায়, প্রতিবাক্যে হায়, হায়,—
এখনো অনঙ্গ (২৫) দীপ্তি পায়,—
যেন কোন সুসেবিত, অতিথি হইয়ে প্রীত,
অনিচ্ছুক লইতে বিদায়।

৪০

তারপর পরিগত, দিবস সপ্তাহ কত,
আইল যাইল কত মাস,
কিন্তু আজো সমাকারে, রাখিয়াছ আপনারে—
ঢেকে রেখে দিয়ে মানবাস
বিলাপেতে অনিবার শুকাইল প্রাণ আমার,
মৃত্যুমাত্র রহিয়াছে বাকি,
জীবিতে থাকিতে দারা, আমি যেন পত্নীহারা-
সম হয়ে রয়েছি একাকী!

৪১

যথা উচ্চ তরুবর- অভ্যন্তরে নিরন্তর,
সুপ্তভাবে থাকি হুতাশন,

---

(২২) "মনে হয়"—পাঠান্তর। (২৩) "সদা রয়"—পাঠান্তর।
(২৪) "অতি"—পাঠান্তর। (২৫) "প্রণয়"—পাঠান্তর।

অকস্মাৎ বহ্নিপ্রোভ, হয়ে কালানল মত,
কাননেরে কয়ায় দাহন,
সেইরূপ অবিকল, অলক্ষ্যে বিরহানল,
ভস্মসাৎ করিয়ে আমায়,
এখন হইয়ে ঘোর, হৃদয়-কাননে মোর,
দাহন করিছে উত্তরায়।

৪২

এই কথা লোকে কয়, কারণ পাইলে লয়,
সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যলোপ পায়,
কিন্তু এটি চমৎকার, কেন এই কথা সার,
প্রেম পরিচ্ছেদে না জুয়ায়।
দেখলো প্রমাণ তার, তব বিরহে আমার,
ক্রমে আরো বাড়িছে বেদনা,
আমার আত্মায় পশি, জড়াইয়ে কসি' কসি'
চূর্ণ করে, ভুজঙ্গী শোচনা।

৪৩

মানুষের আন্তরিক, (২৬) ভাবচয় হয় ঠিক,
কাচে ভুগ্ন ভানুকর সম,
যথায় পতিত (২৭) যবে, তথায় বিতরে তবে,
নিজ নানারঙ্গ নিরুপম,
এই ক্ষণে (২৮) নিরাশ্বাস, হৃদে হায় পরকাশ,
যেন মায়াবীর মায়া ধরি,
দীপ্ত দিবা দ্বিপ্রহরে, সমুদয় দীপ্তি হরে,
করে দেয় ঘোর বিভাবরী।

৪৪

তমোপূর্ণ ধরাতল, তমোময় নভস্থল,
তিমিরেতে পূর্ণ সমীরণ,
তমোপূর্ণ মাঠঘাট, তিমিরেতে পূর্ণ বাট,

(২৬) পাঠান্তর—"বুঝি তব আন্তরিক"। (২৭) "কাছে উপস্থিত"—পাঠান্তর।
(২৮) "একি ঘোর"—পাঠান্তর।

তমোপূর্ণ মম নিকেতন,
তমোপূর্ণ দিনকর, তমোপূর্ণ সুধাকর,
তমোপূর্ণ চারু তারাদলে,
সমাধির অভ্যন্তরে, যেই তমঃ বাস করে,
তাহা মোর হৃদয়-কমলে।

৪৫

যদিও আপন পণ করিয়াছ উল্লঙ্ঘন
ভাঙ্গিয়াছ নিজ সত্যব্রত,
যদিও আমার প্রতি, এতেক বিরাগবতী,
নিদয়া কঠিনা অবিরত,
যদিও শশীর মত, নিত্য তব ভিন্ন মত,
এক ভাবান্বিতা তুমি নহ,
কিন্তু আমি লো তোমার, সন্ধ্যাপ্রতি দিবাকর (২৯)
এক ভাবে আছি অহরহ।

৪৬

হায়! কোথা এবে আর, সেই সব অঙ্গীকার,
সুসময়ে কৃত দুজনার?
হায়! কোথা সেই সব, অটল প্রতিজ্ঞা তব,
করেছিলে ব্যক্ত কতবার?
হায়! কোথা সে সকল, তব পণ অবিচল,
লঙ্ঘিলে যা এবে অনায়াসে?
হায়! কোথা সে প্রণয়, সর্ব্বজয়ী যেই হয়,
পরাজিত হ'ল তব পাশে?

৪৭

হায়! তোরা কোথা গেলি? হায় রে কে দিল ফেলি,
তোদিগে উপেক্ষি' সমীরণে,
তবু নাহি মানে মন, এখনোরে প্রাণধন,
কেন তোরে ধায় অনুক্ষণে?
যথা সেই শূন্য থেকে, কুলিশ পড়িয়া জেঁকে,
মহীরুহে করিলে দারণ,

(২৯) "হিমাকর"—পাঠান্তর।

তবু সেই শূন্যপানে, রহে স্থাণু একখানে,
নিজ শির করি উত্তোলন।

৪৮

আমারে লো প্রিয়ে হায়! নিজ প্রাণবায়ু প্রায়,
এককালে ভাল বেসেছিলে, (৩০)
আমার বামেতে বসি, সোহাগ রসেতে রসি,
'প্রাণ' 'প্রাণ' বলি ডেকেছিলে। (৩১)
এখন বুঝিনু ফন্দী, সে সকল অভিসন্ধি,
নিমন্ত্রিতে আমার মরণ,
হায়! মম মৃত্যু নয়, করিতেছ সুনিশ্চয়,
আপনারি আত্মার ঘাতন!

৪৯

হর হর অভিমান, ওলো ও পাষাণি প্রাণ!
হও হও দ্রব লো প্রেয়সি!
প্রণয়ের স্রোতজলে, আবার বাহ লো গ'লে,
মম শুষ্ক হৃদি দেহ রসি;
কর পুনঃ সুকোমল, আপন হৃদয়স্থল,
মম শির বিশ্রামের স্থান,
হও দেবি! অধিষ্ঠাত্রী, হও পুনঃ দয়াদাত্রী,
হও পুনঃ পূর্ব্বের সমান।

৫০

আর মোর নাহি সয় এ ঘোর যাতনাচয়,
এ অধৈর্য্য বাতুলের প্রায়,
হইল অনেক কাল, ঘেরিয়াছে মৃত্যুকাল,
তবু প্রাণ নাহি বাহিরায়!
এসলো, প্রেয়সি মোর! এখনো যদ্যপি তোর,
হৃদে থাকে দয়ার সঞ্চার,

(৩০) "ভাবিতে বলিতে শতবার"—পাঠান্তর।
(৩১) "প্রাণাধিক বলিতে তোমার."—পাঠান্তর।

জীবন নিধন কর, মারি' এক দৃষ্টিশর,
প্রাণবায়ু হরলো আমার।

৫১

যদিও তোমার মূর্ত্তি, নয়নে না পায় স্ফূর্ত্তি,
কিন্তু সদা মনে বিদ্যমান্,
চারিদিকে যেন হেরি, আকাশে রয়েছে ঘেরি,
মন্ত্রে বিমোহিত একপ্রাণ।
প্রকৃতি আপন মুখে, তোমার প্রতিমা সুখে,
ধারণ করিছে প্রাণপ্রিয়ে।
অতি প্রিয়তম, মম, এহেন বিষম ভ্রম,
অনিবার দেয় বাড়াইয়ে।

৫২

যামিনীর অধিপতি, কিম্বা তারা জ্যোতিষ্মতী,
আমি ত না করি দরশন,
কি ধরায়, কি আকাশে, যত শোভা পরকাশে,
কিছুই না হেরে লো নয়ন।
ফলতঃ নিরখি হেন, ক্ষুদ্র এক চক্রে যেন,
সমাবেশ হইয়া সকল,
তব অনির্ব্বচনীয়, রূপরাশি কমনীয়,
পাইতেছে শোভা সমুজ্জ্বল।

৫৩

সুরভির নিকেতন, মলয়জ সমীরণ,
তোরে লয়ে তাহার বড়াই,
প্রত্যেক হিল্লোলে তার, চারুগন্ধ সুধাধার,
তোর নিশ্বাসের ঘ্রাণ পাই।
মধুকর গুঞ্জরণ- পূর্ণ প্রতি কুঞ্জবন,
কিবা তরুপুঞ্জ গীতিময়,
প্রতি (৩২) বিহঙ্গের স্বর তরঙ্গ-মধুরতর,
তোমারি সুস্বর বিতরয়।

(৩২) "যেন"—পাঠান্তর।

৫৪

ওগো কপোতিনি মোর ! মোহন মূরতি তোর,
মনোনেত্রে হেরি নিরন্তর,
আজো করি অনুভব, তব মৃদুমন্দ রব,
ধ্বনিত আমার বক্ষোপর,
যেই রব সুধাময়, প্রকটিতে সে সময়,
কৃতার্থ যখন প্রেমসুখে,
সোহাগেতে দ্রব হ'য়ে, সময় যাইত ব'য়ে,
দোঁহে থাকিতাম সুখে সুখে ।

৫৫

অদ্যাপিরে প্রাণধন ! তোরে করি দরশন,
যেন সন্ধ্যা তারা মনোহর,
এক একবার প্রিয়ে ! বাতায়নে দেখা দিয়ে,
প্রকাশিছ শ্রীমুখ সুন্দর ।
যেইরূপ ভাব ধরি,' পূর্ব্বে তুমি প্রাণেশ্বরি !
থাকিতে গো নাথপ্রতীক্ষায়,
যে নাথের পদ আর, সঞ্চারিত পুনর্ব্বার,
না হইতে পারে বা তথায় ।

৫৬

দেখিতেছি এইক্ষণে, বসিয়াছ চন্দ্রাননে !
শ্রান্তিকর এই দ্বিপ্রহরে,
একাকিনী মৌনাকারে, অপঠিত চারি ধারে,
পড়ি' আছে পুস্তকনিকরে ;
যথা সীতা স্বরূপসী, শোকেতে ছিলেন বসি,
কারাগারে অশোকের বনে.
কিম্বা অবিকল স্থির, শ্বেতোপল মূরতির,
পলক স্থগিত দুনয়নে ।

৫৬

আরো যেন প্রাণ তুমি, লুটিয়ে পড়েছ ভূমি,
শীর্ণ হয়ে যেতেছ শুকিয়ে,

যথা প্রস্ফুটন কালে, কবলিত কীটজালে,
শোভাশূন্য পুষ্প, প্রাণপ্রিয়ে!
এত দুঃখ তবান্তরে, তথাপি লো নাহি সরে,
সেই কথা তোমার বদনে,
যে কথাটি তব দাসে, অবিলম্বে তব পাশে,
আনিবেক সংশয় বিহনে।

৫৮

আর করি দরশন, শিহরিছ প্রাণধন!
যেন দেখি আপনার ছায়া,
আবার ঈক্ষণ করি, অনিদ্রায় শয্যোপরি,
ছট্‌ফট্‌ করে তব কায়া।
অই কি নিশ্বাস ঘোর, হৃদয় হইতে তোর,
বিনির্গত হইলরে প্রাণ,
অই কি লো সুলোচনা! অশ্রু সলিলের কণা,
তোমার নয়নে বিদ্যমান।

৫৯

এই যাই, যাই আমি, হ'য়ে অতি দ্রুতগামী,
অনুরক্ত প্রেমিক বিহিত,
শীতল করিতে তব, দুঃখের তরঙ্গ সব,
যাহা তোর হৃদে সমুত্থিত।
যাই চুম্বনেতে কান্তে! তোমার নয়নোপান্তে,
অশ্রুবিন্দু করিবারে পান, (৩৩)
কিন্তু মরি হায় হায়! ভেবে বুক ফেটে যায়,
তুমি কোথা, আমি কোথা প্রাণ! (৩৪)

৬০

দূর দূর! রে সকল, বিফল স্বপ্নের দল,
সারহীন মিথ্যা দৃষ্টি ছায়া,

(৩৩) "দূর"—পাঠান্তর।
(৩৪) "কোথায় বিধুর"—পাঠান্তর।

হও হও দূরীভূত, কল্পনায় আবির্ভূত,
ওরে মরীচিকা মিথ্যা মায়া ;
একে ভ্রান্তিভরে ঘোর, মাতায়েছ মতি মোর,
তুমি ফের বঞ্চহ আমায়,
দেখাইয়ে প্রীতিকর, নানা দৃশ্য মনোহর,
হায় তারা কোথা শেষে যায় !

৬১

হায় স্মৃতি ভয়ঙ্করী, ডাকিনীর ভাব (৩৫) ধরি',
হৃদয়েতে হইয়ে উদয়,
ভোজবাজী ছায়ামত, মনের কল্পনা যত,
একেবারে (৩৬) করিল বিলয়।
অপসৃত করি ভ্রম, সরাইল সে বিষম,
ক্ষিপ্তবৎ বিহ্বল স্বপন,
পরে দিল পরিচয়, আমি আর কেহ নয়,
সেই পরিত্যক্ত অভাজন।

৬২

ছাড়িয়ে রঙ্গিল তন্ত্র, সেই স্থানে রাথ যন্ত্র,
মিলে যথা প্রতিভাসংকাশ,
পরিপূর্ণ নিষ্ফলতা, স্বীয় শিল্পকুশলতা,
সত্য আসি করুন প্রকাশ।
অহো অপরূপ একি ! তোরে সুখময়ী দেখি,
মাতিয়াছ আমোদে আহ্লাদে,
নাহি জ্ঞান দোষ লেশ, যেন নির্দ্দোষীর শেষ,
কারো মন ভাঙ্গনি বিষাদে !

৬৩

নিকুঞ্জের প্রীতিকর, প্রমোদিত পক্ষীবর-
সম তুমি মেতেছ প্রমোদে,
হাব ভাব লীলা হেলা- সহ মনোমত খেলা,
খেলিতেছ বিবিধ বিনোদে।

---

(৩৫) "বেশ"—পাঠান্তর।
(৩৬) "একে একে"—পাঠান্তর।

যথা ভস্মীভূত হ'য়ে, অভিনব তনু লয়ে
সমুত্থিত বিহঙ্গবিশেষ,
পূর্ব্ব-প্রেম-ভস্ম থেকে, নব অনুরাগ এঁকে,
উঠাইছ সুখী হতে শেষ।

৬৪

হওলো হওলো সুখী, তার সহ বিধুমুখি !
যাঁরে মন সঁপেছ এখন,
নবপ্রেম-শস্যরাশি, আনন্দরসেতে ভাসি,
সংগ্রহ করহ প্রাণধন।
কখনো কিরূপ রঙ্গে, ভালবাসা মম সঙ্গে,
ছিল ইহা হওলো বিস্মৃত,
পূর্ব্বকথা পূর্ব্বরতি, কর ওলো রসবতি !
ভোগবতী জলে নিমজ্জিত।

৬৫

তথাপি সমুদ্র সম, সীমাহীন প্রেম মম,
তব প্রতি জান ইহা স্থির ;
ছাড়ল (৩৭) ওলন সূত্র, তল নাহি পাবে কুত্র,
অতল, অস্পর্শ, সুগভীর।
হোক্ হোক্ (৩৮) সুবিচ্ছেদ, হাজার হউক ভেদ,
তবু আমি তোমারি নিশ্চয় ;
অলক্ষ্য (৩৯) গগনে বসি', সমুদিত বটে শশী,
কিন্তু সিন্ধু হেরি ক্ষুব্ধ হয়।

(৬৬)

উত্তর কেন্দ্রের প্রতি, (৪০) চুম্বকের যথাগতি,
একভাবে সেই দিকে ধায়,

---

(৩৭) "কেলহ" পাঠান্তর।

(৩৮) "তব সনে"—পাঠান্তর।

(৩৯) "সুদূর"—পাঠান্তর।

(৪০) "অয়স্কান্তের প্রতি"—পাঠান্তর।

অথবা যখন রবি, যেখানে প্রকাশে ছবি,
রাধাপদ্ম সেই দিকে চায়।
তারো চেয়ে রসবতি! একভাবে তব প্রতি,
অবিরত আছে মম মন,
হায়! সেই একভাব, না হইবে তিরোভাব,
যদবধি রহিবে জীবন।

৬৭

যদ্যপি একের প্রতি, সমর্পিলে রতিমতি,
তাঁরে কর অচলা ভকতি,
তবে প্রিয়ে সুনিশ্চয়, আমারি সে ভক্তি হয়
অবশ্যই আমারই সে রতি!
যেহেতু লো চন্দ্রাননে, নিরবধি মম মনে,
জাগরূক একমাত্র দেবী,
তাঁহাকেই যথাশক্তি, আরাধি সহিত ভক্তি,
তুমি সেই, তোমারেই সেবি।

৬৮

সে ভক্তির অর্দ্ধভাগে, যদি পূজিতাম আগে,
আপনার ইষ্ট দেবতায়,
যেই নিষ্ঠাসহকারে, সাধিয়াছি লো তোমারে,
সাধিতাম অর্দ্ধভাগে তাঁয়,
তবে এতদিনে মম, মুনিত্ব পবিত্রতম,
সংগ্রহ হইত অসংশয়,
কিরীট (৪১) কণ্টকময়, মোর ভাগ্যে কভু হয়?
পাইতাম তাহা প্রভাময় (৪২)।

৬৯

আছে বটে সমুজ্জল, কত কত নেত্রদল,
স্নেহ প্রেম হাস্যের সে ভোর,
আছে বটে মধুময়, অধর অমৃতাশয়,
সে অমৃত করায়ত্ত মোর;

(৪১) "যেপথ"—পাঠান্তর। (৪২) "অসংশয়"—পাঠান্তর।

কিন্তু সে সকলে প্রাণ! প্রেমতারা মম প্রাণ
কোনরূপে সুখ নাহি পায়,
পেয়ে এত তিরস্কার, ভাবান্তর নাহি তার,
আকর্ষিয়ে আছেলো তোমায়।

৭০

হায় হায় কি অদ্ভুত, নিকরনয়ন-যুত,
হন সেই প্রণয় দেবতা;
পদ সঞ্চরণে আমি, হই যেই পথগামী,
যেই দিকে ফিরাই ভ্রূ-লতা;
কিবা লোকারণ্যময়, নগরীর রথ্যাচয়
কিবা হর্ম্ম, কিবা কুঞ্জবনে,
নক্ষত্রের নিভ সাজে, সাজ্জত কুহেলীমাঝে,
দেখি যেন তব চন্দ্রাননে।

৭১

সেই মুখ পূর্ণশশী, থেকে থেকে হে রূপসি!
নিশিতে বিশোধ দেয় দেখা, (৪৩)
আর যেন (৪৪) সেইক্ষণ, করি আমি নিরীক্ষণ (৪৫)
সমুদিত দুই শশি-লেখা। (৪৬)
শূন্যে এক সুধাকর, অন্য মম বক্ষোপর,
এক ভ্রান্তিদৃষ্টি হে সুদতি! (৪৭)
যেন সেই ব্যঙ্গরত, মুখভঙ্গি কত মত,
করে মানসিক নেত্র প্রতি। (৪৮)

৭২

তব আত্মা রাজা প্রায়, অনুগত প্রজা তায়,
মম মনোগত ভাবগণ,
যেন তারা অহর্দিন, দুর্জ্ঞেয় কারণাধীন,
তোরে ঘেরি ঘোরে ঘন ঘন।

---

(৪৩) পাঠান্তর—"বিহরে নেত্রপর"। (৪৪) পাঠান্তর—"সখি"।
(৪৫) পাঠান্তর—"দরশন"। (৪৬) "শশধর"—পাঠান্তর।
(৪৭) পাঠান্তর—"কহরে আমারে"। (৪৮) "চিন্তাধারে"—পাঠান্তর।

ঘুরিতেছে অবিশ্রান্ত, শ্রান্তিভারে ভারাক্রান্ত,
ঘূর্ণমান প্রতিক্ষণ সহ,
যথা সব গ্রহগণ, বেড়ি বেড়ি বিবর্ত্তন,
ভ্রমণ করিছে অহরহ।

৭৩

প্রেয়সি! স্মরণ কর, যে মনমুকুরোপর,
তব মোহনীয় মূর্ত্তিছায়া,
পতিত হয়েছে প্রাণ! সেই স্থানে বিদ্যমান,
রহিবেক নিত্যচিত্র প্রায়া।
সেত আর কিছু নয়, কাচের স্বরূপ হয়,
ভঙ্গুর ভাঙ্গিতে পারে শেষে,
গুরুতর চিন্তাভার, রক্ষিত উপরে তার,
চুরমার হবে লো বিশেষে।

৭৪

হৃদয়েতে সমুদ্গত, হয়ে থাকে ভাব যত,
প্রেম তাহে কি বিচিত্রতম!
অনুরাগচন্দ্রমার, ইহা পূর্ণ কলাসার,
দেখ দেখি এর পরাক্রম।
যে নরক তলাতলে, যে স্বর্গ সর্ব্বোচ্চস্থলে,
সে দুয়ে মিলায় একস্থলে,
ছুঁয়াইয়ে নিজানল, করে দেয় সমুজ্জ্বল,
যে জনের হৃদয়-মণ্ডলে।

৭৫

সেই স্বর্গে অবস্থান, ছিল মম যবে প্রাণ,
সদয়া ছিলে লো মম প্রতি,
নরক যাতনা ঘোর, দেখ হায় হায় মোর,
ভোগসার হয়েছে সম্প্রতি।
আহা আমি এইক্ষণ, করিতেছি নিরীক্ষণ,
আপনার জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ,
আমার নহেক আর, দাসবৎ ব্যবহার,
করে মম শত্রুর সদন।

৭৬

কভু (৪৯) মানি সুসম্ভব, এই ভাবান্তর তব,
কেবল ছলনা অনুসরি,
বুঝিবারে মম মন, মম সত্য, মম পণ,
পরীক্ষা করিছ প্রাণেশ্বরী।
কিন্তু হায় একবার, ভেবে দেখ প্রাণামার,
বিরহ শুষিছে রক্ত মম,
আমার সংহার তরে, কবাল কবন্ধবরে,
পাঠায়ে দিয়েছে কিবা যম।

৭৭

সুখের সময়ে প্রাণ! সদা মম সন্নিধান,
এই কথা কহিতে সুন্দরি!
তব সহবাসে মম, বোধ হয় স্বর্গোপম,
ঘোর অরণ্যানী ভয়ঙ্করী।
কিন্তু যবে প্রত্যাহার, কর প্রেম আপনার,
তার সাক্ষী সেই মন্ত্রবল,
এখন লো এই ভুব, করি আমি অনুভব,
ভয়াল সাহারা মরুস্থল।

৭৮

লহ আকর্ষিয়ে সব, মোহনীয় মন্ত্র তব,
যাহে ছাইয়াছে মম প্রাণ,
যে মায়া-শৃঙ্খল দিয়ে, রেখেছ তারে বাঁধিয়ে
ভাঙ্গ তারে করি খান খান।
বিষম যাতনাময়, সেই ত বন্ধনচয়
আমি কেন পরিব একাকী?
যে সময়ে সুস্বাধীন, হইয়ে নিগড়হীন,
স্বচ্ছন্দে আছহ দিয়ে ফাঁকি।

৭৯

সলিলে অঙ্কিত রেখা, কিবা তাহা শূন্যে লেখা,
সেইরূপ পূর্ব্ব প্রেম-কথা,

(৪৯)· "মনে"—পাঠান্তর।

তব চিত্ত পরিহরি, হায় অতি ত্বরা-ত্বরি,
লোপ পেয়ে গিয়েছে সর্ব্বথা।
কিন্তু মম চিত্তপটে, সে সকল সুপ্রকটে,
অক্ষয় অক্ষররূপ ধরি,
তাম্রের ফলকোপর, যথা সুগভীরতর,
বিখোদিত শাসন, সুন্দরি!

৮০

হে অনৃতপরা, প্রিয়ে! নিজ পণ ফিরে নিয়ে,
ফিরে দেহ হৃদয় আমার;
ফিরে দেহ মম মন, দিয়াছিলে যে চুম্বন,
সব ফিরে লহ পুনর্ব্বার।
বিচ্ছেদে বিভিন্নাকার, বিজনে বসতি সার,
ইহাই যদ্যপি সমুচিত,
শুন রে হৃদয়, হায়! তবে ফিরে আয়, আয়,
তিতিক্ষায় মজ ওরে চিত।

৮১

হায়! হায়! যথাগত, প্রলাপ বা বকি কত,
বল তাহে কিবা উপকার?
যদি আমি এইক্ষণে, পুন পাই সেই মনে,
হারায়েছি যারে একবার—
যেই মন হতজ্ঞান, আছে অনুকম্পবান,
ধড়ফড় তব মন তরে,
রাখ রাখ তুমি তায়, কিন্তু ফিরে দেহ হায়!
সুপবিত্র চুম্বন নিকরে।

৮২

হয়ত যখন আমি, হব পরলোকগামী,
তাপিতা হইবে অনুতাপে, (৫০)
জীবিত নারিল যাহা, মৃত সাধিবেক তাহা,
পলাইবে বিবেক, বিলাপে। (৫১)

(৫০) "সে সময়ে"—পাঠান্তর। (৫১) "গলে ধরি কাঁদিবে নিদয়ে"—পাঠান্তর।

হয়তো ও সুকঠোর, অনন্য হৃদয় তোর,
নমিত হইবে সে সময়,
আগে অনুভূত নয়, যে মর্ম্মবেদনাচয়,
তখন জানিবে সমুদয়।

৮৩

আর কাজ নাই ওরে, রুদ্যমানা বীণা তোরে,
এইস্থানে কররে শয়ন,
সুষুপ্তি সম্ভোগ কর, কিছুকাল তব স্বর,
স্তব্ধভাবে করুক যাপন;
যেই কর, রে তোমার, চালনা করিত শার,
আর নাহি চলে সেই কর,
এই পদ্য আর্ত্তস্বর, জাগাইল যে অন্তর,
এখন স্তম্ভিত সে অন্তর!

৮৪

হোক্ হোক্, আহা! আহা! মম ভাগ্যে আছে যাহা
--তোরেও বিদায় দিই প্রাণ;
মঙ্গল হৌক তোর, যদি অতি সুকঠোর,
হয় তোব হৃদয় পাষাণ,
কভু যেন মন তব, নাহি করে অনুভব,
নিরাশ্বাসজনতি বেদনা,
যেন নাহি হয় জ্ঞাত, ক্ষোভে চূর্ণ মনোসাধ,
অন্যতম নরকযাতনা।

৮৫

বিদায় বিদায় প্রাণ! যদবধি দীপ্তিমান,
প্রাণদীপে রবে শিখাশেষ,
তদবধি প্রাণেশ্বরী! একান্ত প্রার্থনা করি,
নাহি পাও কোনরূপ ক্লেশ। (৫২)

---

(৫২) গিরীন্দ্রমোহিনীর অনুলিপিতে এ অংশ নাই।

শেষ শ্বাসবায়ু যবে আমার বাহির হবে,
বহিবে বিদায়ী অশ্রুকণা,
সেক্ষণেও তোর তরে, সুখহেতু সর্ব্বান্তরে,
বিভুস্থানে করিব প্রার্থনা। (৫৩)

---

(৫৩) গিরীন্দ্রমোহিনীর অনুলিপিতে এই অংশ এরূপ আছে :—"প্রিয়ে!
শেষ প্রাণবায়ু যবে, আমার বাহির হবে
বহিবে বিদায়ী অশ্রুকণা,
সে সময়ে একবার, দেখা দিও প্রাণামার,
নিভিবার আগেতে চেতনা।